শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল - জুন ২০১০

প্রকাশকাল
০১.০.২০১০

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯, মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫
০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
৩০০.০০ টাকা
৩০০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এক

পৃথিবীর মানুষ আবার অনুভব করছে সমাজবাদী রাষ্ট্রের সহযোগ ছাড়া সবকিছুই পণ্যে পরিণত হয়; শিল্প-সাহিত্যের দশাও হয়েছে তাই। পৃথিবী আজ এককেন্দ্রিকতার খাদে পড়ে পা-ভাঙা অশ্বের মতো তড়পাচ্ছে! মানুষের মনোজাগতিক নির্যাস যে-শিল্প-সাহিত্য, তার অবস্থাও হয়েছে তাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা মানুষকে আবার দাঁড়াতে সচেষ্ট করছে। পৃথিবী আবার সেদিকেই পুনঃ ধাবমান... গোলাঘর এই যাত্রাপথের ক্ষুদ্র সহায়ক। সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

নির্বাহী সম্পাদক
০১.০৫.২০১০

স ম্পা দ কী য় : দুই

অক্ষয়কুমার দত্তের হাত দিয়ে বাংলাভাষায় চিন্তাচর্চার যে যুক্তিবাদী ধারার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই ধারা রামমোহন-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরীয় ধারার সমার্থক না-হয়ে যেটুকু স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল, তার বর্ধিত ও পরিপক্ক অংশটুকু ভবানী সেন–এম.এন.রায়–রেবতী বর্মণীয় ধারায় এসে পূর্ণরূপ লাভ করে। বাঙালিদের মধ্যে চিন্তার এই ধরন ও ধারাটি মহান রবীন্দ্রনাথকেও ক্রমাগত প্রশ্নবিদ্ধ করে। চিন্তাচর্চার এই প্রক্রিয়ার অনুগামী হয়ে বাংলাদেশীদের মধ্যে বিশেষ করে আহমদ শরীফ, সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকার, আহমদ ছফা, বদরুদ্দীন উমর, আবুল কাশেম ফজলুল হক, ফরহাদ মজহার, আনু মুহম্মদ প্রমুখ চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। বাঙালিদের মধ্যে এই অর্জন নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। অক্ষয়কুমার দত্তই এই ধারার প্রবক্তা। লক্ষণীয় চিন্তাচর্চার এই ধারাটি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার মাত্রা এবং গতি হতাশাব্যঞ্জক। সে-কারণে এখন যাদের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, এদের মধ্য থেকে অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কিংবা যুক্তিবাদী মোটিভ থেকে প্রবন্ধ লিখতে পারেন এমন লেখকদের এবং নতুন লেখক সৃষ্টি করে তাদের রচনা গোলাঘরের মাধ্যমে প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য। দেশ আজ মধ্যবিত্ত থেকে সদ্য-উত্থিত নব্য উঁচুবিত্তের বেহায়া খপ্পরে পড়েছে। এটা শুধু পুঁজিতন্ত্রের বেহায়াপনা দিয়ে বুঝতে গেলে ভুল হবে। এটা ন্যূনতম মনুষ্যত্বেরই স্খলন। এটা পশুবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। এই দস্যুতা

প্রতিহত করার মতো লোকজন মাঠে তো নেই-ই; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও বিষয়টিকে অনুধাবন করার শক্তি যুবশ্রেণীর মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে দেশীয় শকুনও! এরা সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্টমানের দালাল, এরাই নয়া উপনিবেশবাদের অনুগত দাস! এদের সমর্থনদাতা বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পী, সাংবাদিকদের চিহ্নিত করা, মুখোশ উন্মোচন করা এবং এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সহযোগী সবাইকে ধন্যবাদ।

সম্পাদক
০১.০৫.২০১০

সূচি

স্মরণ
রেবতীমোহন বর্মণ (১৯০৩ – ১৯৫২) ০৬

ব্যক্তিত্ব / প্রবন্ধ
রেবতীমোহন বর্মণ: গ্রহান্তরের আগন্তুক
মফিদুল হক ০৭

বই আলোচনা
একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কেরা
বদরুদ্দীন উমর ২৪

কবিতা
একুশ জন কবির একুশটি কবিতা ৩৮

প্রকাশিত কবিতার দুটি আলোচনা
সলিমুল্লাহ খান / সৌমিত্র শেখর ৫৯

রাজনীতি / প্রবন্ধ
বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদ ও মুক্তির সংগ্রাম
শেখ বাতেন ৬৮

সংস্কৃতি / প্রবন্ধ
বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস ও সংস্কার
শামসুজ্জামান খান ৯০

নাটক/ প্রবন্ধ
আগামীর থিয়েটার গল্পহীনতার
নাসির উদ্দীন ইউসুফ ৯৬

গল্প
বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
রবিউল করিম ১০২

ইদ্দিস
শাহদত হোসেন ১০৬

প্রকাশিত গল্পের আলোচনা
হামীম কামরুল হক ১১৮

দর্শন / প্রবন্ধ
মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি
মঈন চৌধুরী ১২৭

বিজ্ঞান / প্রবন্ধ
বিশ্বাস নাকি অপবিশ্বাস
রুশো তাহের ১৫৭

স্থাপত্য / নিবন্ধ
‘সমুদ্রবিলাস’-এর ইতিকথা
নূরুল আমিন ১৬৩

সমাজ / প্রবন্ধ
বাঙালির সমাজচিন্তা: মুসলিম ও বাংলাদেশ পর্ব
আহমাদ মাযহার ১৬৬

আন্তর্জাতিক / প্রবন্ধ
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত এবং চীন ফ্যাক্টর
আশরাফুল আজাদ ১৭৫

চলচ্চিত্র / সাক্ষাৎকার
দীনেন গুপ্ত: 'অযান্ত্রিক' ও 'মেঘে ঢাকা তারা'র চিত্রধারক
সাজেদুল আউয়াল ১৮০

পুনর্মুদ্রণ / পূর্বে প্রকাশের পর
কথোপকথন: গোলাপ নিয়ে একদিন
বেলাল চৌধুরী – আবদুশ শাকুর ১৯৯

প্রতিক্রিয়া
সাহিত্যাঙ্গনে অসুস্থ রাজনীতির হাওয়া
ভুট্টো কামাল ২৪৮

গ্রামবাংলায় শোষণ ও বঞ্চনার ধারাপাত
আনোয়ার হাসান ২৫৪

স্মরণ

.....

রেবতীমোহন বর্মণ

(১৯০৩ – ১৯৫২)

[মার্কসীয় তাত্ত্বিক ও প্রচারক, বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী প্রতিভা রেবতীমোহন বর্মণ। ১৯০৩ সালে কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানাধীন শিমুলকান্দি গ্রামে জন্ম। জন্ম-তারিখ জানা সম্ভব হয়নি। মা রুক্মিণী দেবী। পিতা হরমোহন বর্মণ ছিলেন আইনজীবি। অসহযোগ আন্দোলন এবং বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার কারণে বারবার স্কুল বদল। পরে শ্রীঅরবিন্দের 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়'-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হন। কিশোরগঞ্জ আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে ভর্তি এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। আই,এ পড়েন কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেন্টপলস কলেজ থেকে বি,এ পরীক্ষায় প্রথম এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম । সাধারণ মেসে থেকে টিউশনি করে এই সাফল্য ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। অর্জিত স্বর্ণপদক বিক্রির অর্থে 'বেণু' নামের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। প্রথম গ্রন্থ 'তরুণ রুশ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময়ে কোলকাতায় পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর বিপ্লবীদের আক্রমণের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার। জেলে বসে অতীত রাজনীতির ভুল বুঝতে পেরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী দর্শন ও আর্দশের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলশ্রুতিতে দেউলী জেলে অবস্থানকালে অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন কমিউনিস্ট 'সংহতি' বা 'কনসলিডেশন'। জেলের অভ্যন্তরে 'সংহতি' ও 'The Communist' নামক হাতে লেখা বাংলা এবং ইংরেজী দুটি পত্রিকা প্রকাশে নেতৃত্ব দান। আট বছর কারাভোগের পর রাজপুতনার দেউলী জেল থেকে শরীরে কুষ্ঠের সংক্রমণ নিয়ে ১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই মুক্তি লাভ। এরপর কমরেড মুজাফফর আহমদের মাধ্যমে পার্টিতে সম্পৃক্তি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ১৯৩৮, কৃষক ও জমিদার ১৯৩৮, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট ১৯৩৮, হেগেল ও মার্কস ১৯৩৮, ক্যাপিটাল (মার্কস-এর

ক্যাপিটালের বাংলায় লেখা সংক্ষিপ্তসার) ১৯৩৮, ভারতের কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন ১৯৩৮, সমাজের বিকাশ ১৯৩৯, অর্থনীতির গোড়ার কথা ১৯৪৫, পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (বাংলা তরজমা) (১৯৪৪)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৪০ সালে পার্টির কর্মক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত হয়ে মারাত্মক অসুস্থতা নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। শরীরে কুষ্ঠের পচন উপেক্ষা করে লেখালেখি এবং রাজনৈতিক-সামাজিক কার্মকাণ্ডের পাশাপাশি এলাকার ছাত্র-তরুণদের দীক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন। এ সময়ে রচিত হয় মূল্যবান পাঁচটি গ্রন্থ। '৪৭ সালে দেশ ভাগের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় মর্মাহত হয়ে '৫১ সালে জন্মভূমি ছেড়ে আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ । সেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় '৫২ সালের ৬ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

ব্য ক্তি ত্ব / প্র ব ন্ধ

ম ফি দু ল হ ক

....

রেবতীমোহন বর্মণ: গ্রহান্তরের আগন্তুক

রেবতীমোহন বর্মণ (১৯০৩-১৯৫২) বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন নির্মাতাদের একজন, প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ, নীহার সরকারের '*ছোটদের রাজনীতি*' এবং '*ছোটদের অর্থনীতি*'র পাশাপাশি রেবতী বর্মণের বইয়ের পাঠগ্রহণ একদা ছিল প্রগতি রাজনীতি-বরণের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাহচর্য সত্ত্বেও রেবতী বর্মণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জেনেছি বলে মনে পড়ে না। কোনো এক সময়ে কীভাবে যেন শুনেছিলাম তিনি ছিলেন ভৈরবের সন্তান, এর বাইরে আর কিছু জানতে পারিনি। তবে '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' পাঠককে নিশ্চিতভাবে মুগ্ধ করে, সভ্যতার ইতিহাসের এমন প্রাঞ্জল উপস্থাপনা সমাজতন্ত্রকে ইতিহাসের

অমোঘ রায় হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাকে দৃঢ়বদ্ধ করে। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ মার্কসবাদ চর্চায় যেমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তেমনি সমাজ-ইতিহাস অধ্যয়নে নিবিষ্ট ছাত্রদের কাছেও এর চাহিদা কখনো কমেনি। এমন গ্রন্থ রচনা নিছক রাজনৈতিক কর্মীর তাগিদ থেকে সম্পন্ন হতে পারে না, সেই সঙ্গে চাই সমাজবিশ্লেষকের গভীর দৃষ্টি, ইতিহাসের সমগ্রচেতনা। রেবতী বর্মণ সেই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন বলে রাজনীতির অমন ক্লাসিক্যাল বই উপহার দিতে পেরেছিলেন এবং একটি বইয়ের সূত্রেই তিনি অমর হয়ে উঠতে পারলেন।

তবে যত যুগান্তকারী হোক তাঁর গ্রন্থ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন, নতুন ইতিহাস-তত্ত্বের উদ্‌গাতা তিনি নন, তবু কেন সেই গ্রন্থ কিছুতেই সাবেকি হয়ে উঠল না। তার একটি কারণ রেবতী বর্মণ কেবল ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা পালন করেননি, তিনি ইতিহাসের বিপুল তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে সারসত্য উপস্থাপনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সমাজ-ইতিহাসের গ্রন্থকার হিসেবে তাঁকে গর্ডন চাইল্ডের সমকক্ষ বলা যেতে পারে, গর্ডন চাইল্ড সমাজনির্মিতির ইতিহাস মেলে ধরার চেষ্টায় লিখেছিলেন '*ম্যান মেকস হিমসেল্ফ*' এবং নতুন আলোকে ইতিহাসের আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ঘটান বহু তথ্য ও বিবরণের সম্পর্কসূত্র উন্মোচন করে, সেই একই কাজ বাংলায় করেছেন রেবতী বর্মণ। রেবতী বর্মণের ক্ষেত্রে কাজটি করা আরো কঠিন ছিল কারণ তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে বিশেষ কাউকে এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গর্ডন চাইল্ড লিখেছিলেন মানুষ কর্তৃক নিজেকে মানুষ করে তোলার ইতিহাস, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়ে রেবতী বর্মণ তাঁর গ্রন্থের শেষে বলেছেন এই মানুষ হয়ে ওঠার কথা, এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'এই সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট অর্থে মানুষ অবশিষ্ট জীবজগৎ হইতে নিজেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়; পশুর জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যথার্থ মানুষে পরিণত হয়।'

এমনি অসাধারণ ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা যাঁর দ্বারা সম্ভব সেই মানুষটির কৃতি কেবল এক গ্রন্থের মধ্যে সীমিত হয়ে থাকবে তা ভাবা যায় না, অথচ রেবতী বর্মণ সম্পর্কে বেশি কিছু তো জানবারও উপায় নেই। উপমহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাকারী, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থের জন্য রচিত হয়েছিল এবং সেখানে রেবতী বর্মণের জীবনচিত্র কিছুটা হলেও মেলে। তবে পাকিস্তান আমলে আধা-প্রকাশ্য আধা-নিষিদ্ধভাবে গ্রন্থের যেসব সংস্করণ ছাপা হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রে মুজফ্‌ফর আহমদের ঐ ভূমিকা বর্জিত হয়েছিল, কেননা শঙ্কা ছিল লেখকের কমিউনিস্ট সত্তা প্রকাশ পেলে গ্রন্থের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের খড়্গ নেমে আসতে পারে। ফলে রেবতী বর্মণের বই, এমনকি ষাটের দশকের শেষাশেষি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থতালিকাভুক্ত হলেও লেখক-পরিচিতি ছিল আড়ালে। অপরদিকে ভারতের, বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসেও রেবতী বর্মণের বিশেষ ঠাঁই হয়নি, তিনি কোথাকার কমরেড সেটা নিয়ে

বোধহয় থেকে গেছে দ্বিধা ও সংশয়। পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণকারী রেবতী বর্মণ অবশ্যই অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তবে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে জনজীবন ও কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পার্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্তির কারণে তিনি কাজ থেকে বিচ্যুত হতে চাননি, পার্টিও এমন বিশিষ্ট এক সদস্যকে হারাতে চায়নি। অপরদিকে কলকাতা শহরে কুষ্ঠরোগীর অবস্থান ছিল দুরূহ, তাই রেবতী বর্মণ প্রথমে চলে যান নিজ গ্রাম শিমুলকান্দিতে, পরে পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে পার্টির সহায়তায় তিনি চলে আসেন চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে, সেখানে পার্টি দপ্তরের ওপরতলায় তাঁর জন্য বিশেষ আবাসের ব্যবস্থা করা হয়। জগৎবিচ্ছিন্ন এই কুষ্ঠরোগীর হাতেই তখন রচিত হয়েছিল সমাজবিকাশ বিষয়ক শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ। ১৯৪৬ সালে লেখা শেষ হলেও সামাজিক-রাজনৈতিক নানা দুর্যোগে পাণ্ডুলিপি বই হয়ে আর বের হতে পারেনি দীর্ঘকাল, ১৯৫২ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে যখন গ্রন্থ প্রকাশ পেল তখন লেখক আর বেঁচে নেই।

গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব পালনান্তে রেবতী বর্মণ আবার ফিরে এসেছিলেন নিজ গ্রাম শিমুলকান্দিতে, পার্টির অনিশ্চিত জীবনে এমন রোগীর ব্যবস্থাপনা নিশ্চয় খুব দুরূহ ছিল। এই সময়েই নেমে আসে দেশভাগের অভিঘাত, তার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি আরো তছনছ হয়ে গেল সশস্ত্র বিপ্লবের হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে। দেশভাগ, দাঙ্গা ও ছিন্নমূল মানুষের কাফেলা যে বিশালাকার সমস্যার ঢেউ তৈরি করল তাতে কত মানুষ যে কোথায় ভেসে গেল ইয়ত্তা করাও ছিল দুঃসাধ্য। শিমুলকান্দি গ্রামে বর্মণ পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য চলে গেলেন কলকাতায়। ১৯৫১ সালে রেবতী বর্মণ সীমানা পেরিয়ে কাছের শহর আগরতলায় আশ্রয় নেন এবং নীরবে নিভৃতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন পরের বছরের মে মাসে। তাঁর মৃত্যুর পরপর '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে, জেগে থাকে এই অনন্য গ্রন্থ, হারিয়ে যায় গ্রন্থের রচয়িতা অনন্যতর মানুষটি।

কীভাবে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন রেবতী বর্মণ সেই ফিরিস্তি দেয়া কঠিন। এর পেছনে ছিল নানা কার্যকারণ। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে যে কমিউনিস্ট পার্টি বিকশিত হয়, রেবতী বর্মণ সেই পার্টির এক দিকপাল পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হননি। বাংলায় প্রগতি চিন্তা চর্চায় তিনি দিকপালের ভূমিকা পালন করলেও পথিকৃৎ সেই ভূমিকা পালন ছিল অনেকটাই পার্টি-কাঠামোর বাইরে। বস্তুত তাঁর লেখালেখি ও প্রকাশনা প্রয়াস শুরু হয় পার্টি-সুসংগঠিত হওয়ার পূর্ব থেকে। তাই পরবর্তীকালে পার্টি যখন নিজ গণ্ডির মধ্যে থেকে দলের জয়গান গেয়ে মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশের ইতিহাস মেলে ধরতে থাকে তখন রেবতী বর্মণ সেখানে বড় একটা জায়গা পান না। তদুপরি চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই তাঁকে রোগের কারণে সক্রিয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দূরে চলে যেতে হয়। ফলে রাজনীতিতে, বিশেষভাবে বঙ্গীয় কৃষকসভার

আন্দোলন-সংগ্রামে, যেখানে তিনি ছিলেন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, পরে তাঁকে আর দেখা যায়নি, দেখা দেয়ার উপায়ও তাঁর ছিল না। যে তেভাগা আন্দোলন বাংলার বিশাল প্রান্তর জুড়ে অভ্যুত্থানের রূপ নিল সেখানে একজন দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া রেবতী বর্মণের আর কিছু করবার ছিল না। অপরদিকে দেশভাগের অভিঘাত নেমে এলে রেবতী বর্মণ হয়ে পড়েন একেবারেই ঠিকানাবিহীন। পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে চরম পীড়নের মুখে পড়ে, সুসংগঠিত হয়ে সাথীদের একত্র ও সমন্বিত করবে এমন কোনো অবকাশ পার্টির ছিল না। পার্টিকে চলে যেতে হয়েছে ভূতলের একেবারে গভীরে, অস্তিত্ব বজায় রাখাই হয়ে উঠেছিল বড় চ্যালেঞ্জ। রেবতী বর্মণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে পার্টিগত সম্পর্ক গড়বার উপায় কোনো দিক থেকে ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য তো রেবতী বর্মণ ছিলেন হিসেবের বাইরে, কেননা তিনি যে পূর্ববঙ্গবাসী। ফলে কেবল রোগের কারণেই এক পরিত্যক্ত জীবন রেবতী বর্মণের ভাগ্যলিপি হয়ে উঠল তা নয়, সমাজবিকাশের দিশাহীন প্রবাহেও তিনি পরিত্যক্ত বিবেচিত হলেন।

কিন্তু ইতিহাস থেকে মুছে যাননি রেবতী বর্মণ, তাঁর ভূমিকা ও অবদান কখনো মুছে যাওয়ার নয়। আর তাই দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে ২০০৫ সালে এসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল *'কমরেড রেবতী বর্মণ স্মরণে'* সংকলন-গ্রন্থ। সম্পাদক অরুণ চৌধুরী ভূমিকায় লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষায় মার্কসবাদ চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড রেবতী বর্মণ আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ প্রকাশের বাসনা অনেকদিন যাবত মনে পোষণ করেছি। মাঝখানে বছর তিনেক আগে তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশে প্রয়াত কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত আমাকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার এ-বাসনা যে খুবই দুরূহ, কাজে হাত দিয়ে তা বুঝেছি।" এই সংকলন-গ্রন্থেই রেবতী বর্মণ সম্পর্কে সুধাংশু দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, "তাঁর নাম আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। পার্টি জীবনের চলার পথে সম্বল কী? স্মৃতি না বিস্মৃতি? সেই বিস্মৃতির কমরেডের নাম হল রেবতী বর্মণ।"

কিন্তু স্মৃতি কি কখনো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়? নাকি এমন হয় যে সমাজই নাগাল করতে পারে না স্মৃতির, পৌঁছতে পারে না সেই অতলে যেখানে সোনার কৌটোয় বদ্ধ রয়েছে প্রাণভোমরা? কথাটা বলেছিলেন নোবেল-বিজয়ী সাহিত্যিক মিলান কুনদেরা, "সভ্যতার সংগ্রাম হচ্ছে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম।" আর তাই দেখি কত বিচিত্রভাবেই না চলে সমাজের এই স্মৃতি-আহরণের প্রয়াস, আপন শক্তিময়তা ও স্বাভাবিকত্ব ফিরে পেতে চলে বিবিধ আয়োজন। এমনি তাগিদ থেকে ভৈরবের আরেক সন্তান শফিকুল ইসলাম ব্রতী হয়েছেন রেবতী বর্মণের সত্তানুসন্ধানে, আরো অনেককে অনুপ্রাণিত করছেন এই ইতিহাস-সন্ধানে শরিক হতে । তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়েই রেবতী বর্মণকে চিনবার এক ধরনের দুর্বল প্রয়াস এখানে নেয়া হল; তাঁর বিস্ময়কর জীবনের কোনো সমগ্রচিত্র দাঁড় করানো নয়, তাঁর জীবনের দু-একটি দিক, যা আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, সেই পরিচয়-গ্রহণের প্রচেষ্টা একে বলা যেতে পারে।

দুই

১৯০৩ সালে কিশোরগঞ্জের শিমুলকান্দি গ্রামে জন্ম নেয়া রেবতী বর্মণ পড়াশোনা করেছিলেন ঢাকার পগোজ স্কুল এবং কুমিল্লার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। বঙ্গভঙ্গের পর স্বাধীনতার জন্য যে সশস্ত্র চরমপন্থী প্রচেষ্টা ক্রমে জোরদার হয়ে উঠতে থাকে, ঢাকা হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। হেমচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ঢাকার নবীনদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করছিল। বিপ্লবী সাহিত্যের পাঠদান ও শরীরচর্চা, এই দুই ধারায় চলত দলে সদস্যভুক্তির আয়োজন। স্কুলের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে দল বিশেষভাবে তৎপর থাকত। ভালো স্কুলের ভালো ছাত্রদের একজন হিসেবে রেবতী বর্মণ চরমপন্থী সংগঠকদের নজরে না পড়ে পারেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রেবতী বর্মণের বিদ্যালয়-শিক্ষা বিঘ্নিত হয় এবং সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনের ক্যাডার হিসেবে তিনি চিহ্নিত হন। এর ফলে ঢাকা বা কুমিল্লার সেরা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হয়ে আর ওঠে না তাঁর। এক বছর শিক্ষাবিরতি দিয়ে তিনি ক্লাস টেনে ভর্তি হলেন দূর কিশোরগঞ্জের আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। কিশোরগঞ্জের এই অখ্যাত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুন্সী আজিমউদ্দিন আহমদ, দরিদ্র ঘরে জন্ম নেয়া যে-মানুষটি নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে শিক্ষা অর্জন করেন এবং আইনের পেশায় যোগ দিয়ে সাফল্যের মুখ দেখেন। বিত্ত সঞ্চয় করলেও সমাজহিতৈষণার তাগিদ তিনি কখনো হারান নি এবং নিজ জমিতে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যালয়, ১৯১৮ সালে সেখানে প্রথমবারের মতো দশম শ্রেণীর ছাত্র ভর্তি করা হল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু বসন্তকুমার চক্রবর্তী। নব-প্রতিষ্ঠিত প্রান্তিক এই বিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে রেবতী বর্মণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নেন এবং সবাইকে অবাক করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এরপর রেবতী বর্মণ কলকাতায় পড়তে আসেন এবং মূলত ছাত্র পড়িয়ে লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। যে মেসবাড়ি ছিল তাঁর ও সতীর্থদের আশ্রয় তা বিপ্লবীদের একরকম ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ এবং সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। বি.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পেলেন জগত্তারিণী পদক এবং পদক বিক্রির অর্থ দিয়ে সহপাঠীদের নিয়ে প্রকাশ শুরু করলেন কিশোরদের মাসিক পত্রিকা *'বেণু'*। এই সহপাঠীদের মধ্যে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের দুই সদস্য শোভনলাল ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের সহযোগে *বেণুর* প্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদের পরিচয়বহ রচনা, "মধ্যদিনে যবে গান/ বন্ধ করে পাখি/ হে রাখাল বেণু তব/বাজাও একাকী/" আশ্চর্যজনকভাবে এই আশীর্বচন রেবতী বর্মণের পরবর্তী জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল যখন দুরারোগ্য ও দুঃসহনীয় রোগ

তাঁকে কর্মময়তা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল এবং জীবনের মধ্যগগনে আকস্মিকভাবে নেমে এসেছিল অন্ধকার, বন্ধ হয়েছিল গান।

লেখালেখি ও প্রকাশনার প্রতি যে পক্ষপাত বিপ্লবী চেতনাবহ এই তরুণের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল সেই সাধনায় তিনি জীবনভর নিবেদিত ছিলেন, যদিও তা বহুলাংশে থেকে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। *'বেণু'* পত্রিকার কথা আমরা জানতে পারি, কিন্তু এই পত্রিকায় রেবতী বর্মণের কোন কোন লেখা পত্রস্থ হয়েছিল সেই পরিচয় উদ্‌ঘাটন এখনো বাকি রয়েছে। তবে রেবতী বর্মণ যে পঠন-পাঠন ও লেখালেখিতে নিবেদিত ছিলেন, সেই সঙ্গে চরমপন্থার বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *'তরুণ রুশ'* গ্রন্থে। প্রকাশক ছিলেন বর্মণ পাবলিশিং হাউসের পক্ষে ব্রজবিহারী বর্মণ, তিনিও ময়মনসিংহের যুবক, রেবতী বর্মণের চাইতে বয়সে অগ্রজ। উভয়ে ময়মনসিংহের সন্তান হলেও তাঁদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা অথবা পূর্ব-পরিচয়ের বন্ধন ছিল কিনা জানা যায় না। ব্রজবিহারী বর্মণও কলকাতা এসেছিলেন উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে, বি.এ পড়বার সময়ে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন। মুজফ্‌ফর আহমদ-নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, তিনি কিছুকাল কাজ করেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী অরবিন্দ ঘোষ-ভ্রাতা বারীন ঘোষের আর্য পাবলিশিং হাউসে এবং পরে ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বর্মণ পাবলিশিং হাউস। বর্মণ পাবলিশিং হাউস সাম্যবাদী সাহিত্য প্রচারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৪ সালে তাদের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ *'ক্ষুদিরাম'* পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এর রচয়িতা ছিলেন ব্রজবিহারী স্বয়ং। পরের বছর প্রকাশিত হয় মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত জীবনী *'সান ইয়াৎ সেন'*। সেই সঙ্গে আরো প্রকাশ পায় সরোজ আচার্য প্রণীত *'নব্য রুশিয়া'*। ১৯২৮ সালে কাজী নজরুল ইসলামের *'ফণীমনসা'* ও *'সর্বহারা'* প্রকাশিত হয়েছিল একই প্রকাশনা ভবন থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পাই ২৪ বছরের রেবতী বর্মণ প্রণীত গ্রন্থ *'তরুণ রুশ'*। রাশিয়ার জাতি গঠন এবং শিল্প সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮+১১৭ এবং মূল্য ছিল এক টাকা। পরের বছর বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'বিপ্লবী রুশিয়া'* এবং মণিময় প্রামাণিকের *'ঋষি কার্ল মার্কস ও তাহার মতবাদ'*। রেবতী বর্মণের পথিকৃৎ ঐ *'তরুণ রুশ'* গ্রন্থ বহুলাংশে থেকে গেছে অনালোচিত ও উপেক্ষিত। তাঁর সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রামাণ্য আলোচনায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এই বইয়ের উল্লেখ করলেও একই নিবন্ধে তিনি যখন রেবতী বর্মণ প্রণীত গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন তখন সেই সতেরটি গ্রন্থের মধ্যে, অনবধানবশত *'তরুণ রুশ'* অন্তর্ভুক্ত করেননি। ফলে দেখা যায় পরবর্তী রচনাকাররাও তাঁদের লেখায় 'তরুণ রুশ' গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখ করেননি।

অবশ্য রেবতী বর্মণের লেখালেখির জীবনে এর পরে বিশাল ছেদ নেমে এসেছিল। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং প্রেসিডেন্সি জেল,

হিজলি, বক্সা, সিউড়ি আটকখানা হয়ে দেউলি বন্দিশিবিরে কাটান পাঁচ বছর। এরপর ১৯৩৭ সাল থেকে বছরখানেক অন্তরীণ থাকেন রংপুরের সুন্দরগঞ্জ গ্রামে এবং অবশেষে ৮ বছর কারাবাস অন্তে মুক্তি পান ১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই তারিখে।

দীর্ঘকাল কারাবন্দি রেবতী বর্মণের কোনো বই সঙ্গতকারণে এই সময়ে আর প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু কারাবাসকে যে জীবনের পাঠশালা করে তুলেছিলেন তিনি, তার প্রতিফলন নানাভাবে মেলে। গোগ্রাসে বইপত্র পড়েছিলেন তিনি, বিচিত্র ছিল তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র, বড়ভাবে বললে এই আগ্রহ ছিল সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে। যে তাগিদ তাঁকে ক্রমশ মার্কসবাদের দিকে টেনে আনে, তা কারাগারে আরো সংহত হয় এবং মার্কসবাদকে কোনো জড়জীবনদর্শন হিসেবে বরণ না করে এর সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ছিল তাঁর অভীষ্ট। ফলে তিনি পঠন-পাঠনকে ঝাড়াই-বাছাই ও আত্মস্থকরণের এক নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। জ্ঞানচর্চার কোন পথে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তার পরিচয় মেলে ১৯৩২ সালের ৫ জানুয়ারি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রেরিত পত্রে। তিনি লিখেছিলেন :

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরম পূজনীয়েসু,
রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বাংলায় একখানা গ্রন্থ তৈয়ারি করিতে শুরু করিয়া পরিভাষার খুবই অসুবিধা ভোগ করিতেছি.....
Nationalism-কে জাতীয়তা ও Nation-কে জাতি বলিয়া চালানো কি উচিৎ,
শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় Nationalism-কে রাষ্ট্রিক ও Nation-কে রাষ্ট্র, জন, রাষ্ট্রজন এই তিনটি প্রতিশব্দ দিয়ে চালাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়া গিয়াছে।
আশা করি আপনার উপদেশ পাইয়া সংশয়মুক্ত হইব।
আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অশেষ শ্রদ্ধা জানিবেন।
একান্ত অনুগত
শ্রী রেবতী বর্মণ

ত্বরিৎ জবাব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

কল্যাণীয়েষু,
আমার মনে হয়, নেশন, ন্যাশনল প্রভৃতি শব্দ ইংরাজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। 'রাষ্ট্রজন' কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুনিতে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ, নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল

পরিমাণে চলে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না। Caste – জাতি, Race – জাতি, Nation – রাষ্ট্রজাতি, People – জনসমূহ, Population – প্রজন।

২২ শে জানুয়ারি, ১৯৩২ **শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

কারাগারে রেবতী বর্মণের পঠনপাঠনের পাশাপাশি চলছিল লেখালেখির মুসাবিদা। তিনি '*ক্যাপিটাল*'-সহ মার্কসবাদী সাহিত্যের ধ্রুপদী বিভিন্ন রচনা গভীর আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেছেন। সহবন্দিদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে জানার তাগিদ থেকে তিনি সেটেলমেন্ট রিপোর্টসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। পাশাপাশি কারাগারের সীমিত সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় যথাসাধ্য ব্যাপৃত থেকেছেন।

কারাগারে তাঁর সহবন্দি ঢাকার আরেক বিপ্লবী নেপাল নাগ লিখেছিলেন, "মার্কসবাদী মতাদর্শকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য তিনি সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব (মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান) নিয়ে গভীর চর্চা করেন এবং এই দুটি বিষয় সম্পর্কিত বহু পুস্তক তিনি বিলেত থেকে ফরমায়েশ দিয়ে আনাবার ব্যবস্থা করতেন। বিলেতের বড় বড় প্রকাশনার বইয়ের তালিকা আনিয়ে সেখান থেকে উপরিউক্ত বিষয়ে পুস্তকাদি দেউলি ক্যাম্পে পার্শেলে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। ...মামুলি মার্কসবাদী অর্থনীতির বইগুলো বারে বারে অধ্যয়ন করা ছাড়াও তাঁর ঐ বিষয়ে অধ্যয়নের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল – কোম্পানির আমল থেকে ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গে যাবতীয় রিপোর্ট ও গেজেটিয়ার তিনি ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি থেকে ফরমায়েশ দিয়ে আনাতেন এবং সেগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে নোট রেখে পড়াশোনা করতেন।"

সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ২৭ বছরের যুবক রেবতী বর্মণ ১৯৩১ সালে কারাগারে ঢুকেছিলেন, ১৯৩৮ সালে বের হয়ে এলেন প্রাজ্ঞ ও গভীরতর দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজবিপ্লবী হিসেবে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যোগ দেবেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, গোপন পার্টির নেতা মুজফ্‌ফর আহমদকে তিনিই খুঁজে বের করলেন এবং পার্টির পরামর্শে কৃষক আন্দোলন সংগঠনের কাজে যুক্ত হলেন। তবে তাঁর আগে ঢাকায় তিনি সূচনা করেছিলেন 'গণসাহিত্য চক্র' শীর্ষক এক প্রকাশনা সংস্থা, মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশনার এই প্রয়াসে তাঁর সহকর্মী ছিলেন নেপাল নাগ, গোপাল বসাক ও জ্ঞান চক্রবর্তী। নবগঠিত সংস্থা থেকে প্রকাশিত হল সুধাংশু অধিকারীর '*সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র*', ভবানী সেনের '*কৃষকের দাবি*' এবং হীরেন মুখার্জি অনূদিত কার্ল মার্কসের '*ভারতে ইংরাজ শাসন*'। সেই সাথে রেবতী বর্মণের তিনটি বই, স্পষ্টতই কারাগারে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থরূপ, '*মার্কস প্রবেশিকা*', '*সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি*' এবং '*কৃষক ও জমিদার*', এমন

কতক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশক হলেও গণসাহিত্য চক্র দীর্ঘজীবী হয়নি। ঢাকা-কেন্দ্রিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো ছিল দুরূহ। হতে পারে রেবতী বর্মণের ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় কর্মস্থল গড়ে তোলাও এর একটি কারণ। কলকাতায় বর্মণ পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে পূর্ব-যোগাযোগ রেবতী বর্মণের জন্য ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাছাড়া ব্রজবিহারী বর্মণ তো উদগ্রীব হয়ে ছিলেন বামপন্থী সাহিত্যের প্রকাশ ঘটাতে। তিনিও কারাগারে ছিলেন ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত, এই সময়ে তাঁর প্রকাশনালয় থেকে কোনো বই প্রকাশিত হতে পারেনি। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ব্রজবিহারী বর্মণ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন মার্কসের *'মজুরি, দর, মুনাফা'*, *'মজুরি ও পুঁজি'*, স্তালিনের *'সমাজতন্ত্রবাদের জয়'* ইত্যাদি গ্রন্থ। রেবতী বর্মণের অনুবাদে প্রকাশিত হয় কার্ল মার্কসের *'ক্যাপিটাল'*। ঠিক অনুবাদ নয়, বিশাল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের এ-এক সংক্ষিপ্তসার এবং উপস্থাপনকালে ভাষার বৈশিষ্ট্য ও গাঁথুনি অক্ষুণ্ন রেখে চমকপ্রদভাবে ভাবপ্রকাশে যে অসাধারণ দক্ষতা রেবতী বর্মণ দেখিয়েছিলেন তা আজও অননুকরণীয় হয়ে আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় রেবতী বর্মণ লিখেছিলেন, "কিছুদিন পূর্বে *মার্কস-প্রবেশিকা* নামে মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একখানা ছোট বই বাহির হইয়াছে। এই বইখানা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই বড় একখানা বই তৈয়ারী করার কথা বন্ধু-বান্ধবেরা বলেন। বন্দীজীবনের শেষ দিকটায় এই কাজে হাত দেই। যে অবস্থায় এই কাজ আমাকে করিতে হইয়াছিল তখন আর বইপত্রের সাহায্য তেমন পাওয়া সম্ভব হয় নাই তাই অসম্পূর্ণতার অন্ত নাই। মনে করিয়াছিলাম, বাহিরে আসিয়া তাহা শোধরাইয়া লইতে পারি; কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহা আর সম্ভব হয় নাই। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি পূর্বলিখিত ছোট বইখানি বাংলার তরুণদের কাজে লাগিতেছে। ইহা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বড় বইখানাও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।"

মার্কসবাদী চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনুধাবনের প্রয়াস থেকেই *ক্যাপিটাল* অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন রেবতী বর্মণ এবং সেটা ছিল তাঁর সমাজ ও জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসাজাত, মার্কসীয় জ্ঞানসাধনা থেকে সমৃদ্ধি অর্জন ছিল লক্ষ্য, কোনো অভ্রান্ত অনড় জড়বৎ সত্যদর্শন হিসেবে তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করেননি, *'ক্যাপিটাল'* তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল অব্যাহত জ্ঞানসাধনার এক অনন্য উপাদান হিসেবে। ভূমিকায় তিনি আরো লেখেন, "*ক্যাপিটাল* হইতে শুধু মূল্য এবং মুনাফার সূত্র জানিয়া লওয়াই যথেষ্ট নয়, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে মার্কসের অভিমত আমরা এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি – একবার, দুইবার, তিনবার যতবারই আমরা *ক্যাপিটাল* পড়ি, ততই নূতন বিষয় এবং নূতন নূতন নির্দেশ আমরা ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করিব। জন স্ট্রচীর একখানা বইয়ের সমালোচনায় জি.ডি.এইচ. কোল লিখিয়াছিলেন – এই বইখানা পড়ার পর *ক্যাপিটালের*

তৃতীয় খণ্ড আমি পুনরায় নূতন দৃষ্টি লইয়া পড়ি এবং কতকগুলি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাই। সকলেরই এই অভিজ্ঞতা হইতে বাধ্য।"

ক্যাপিটালের যে ভাষ্য রেবতী বর্মণ প্রণয়ন করেছিলেন তা নিছক কোনো সংক্ষেপিতকরণ ছিল না, গোটা গ্রন্থ পাঠ এবং মার্কসীয় তাত্ত্বিক দর্শন সম্পর্কে সম্যক অবহিতি থেকে তিনি যে ভাষ্য তৈরি করেছেন তা গভীর অধ্যয়ন ও অনুধাবনের পরিচয় বহন করে। এই অনুবাদে জটিল তাত্ত্বিক বিষয়কে যে প্রাঞ্জলতার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে এবং রেবতী বর্মণের দক্ষতা ও কৃতিত্বের প্রতিফলন করছে।

কারামুক্তি-পরবর্তী সময়টুকু রেবতী বর্মণের জীবনের স্বর্ণকাল বলা যেতে পারে। নানা ধরনের লেখালেখি ও গ্রন্থপ্রকাশ তিনি করে চলেছেন। বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। এছাড়া একই সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর আরেক গ্রন্থ বা পুস্তিকা *'ভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন'*। ১৯৩৮ সালে হুগলিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে পঠিত প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন রেবতী বর্মণ– এটিই পরে পুস্তিকা হিসেবে ঐ নামে প্রকাশিত হয়। এই সম্মেলনে কৃষকসভার গবেষণা ও তথ্য বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় রেবতী বর্মণের ওপর। ১৯৩৯ সালে ফ্লাউড কমিশনের কাছে কৃষক সভা প্রদত্ত রিপোর্ট প্রণয়নেও রেবতী বর্মণের ছিল মুখ্য ভূমিকা এবং এটি পরে ভূমিরাজস্ব কমিশন সংক্রান্ত পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

বর্মণ পাবলিশিং হাউস এবং সহযোগী আরো কতক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় একান্ত নিজস্ব প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করছিল। এই তাগিদ থেকে জন্ম নেয় ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, যে সংস্থার প্রতিষ্ঠায় রেবতী বর্মণ পালন করেছিলেন বিশেষ ভূমিকা। এ-সম্পর্কে দেউলি বন্দিশালায় তাঁর সহবন্দি কুমিল্লা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী অখিল নন্দী পরে লিখেছিলেন, "কলকাতায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্যের জন্য একটি বিশেষ প্রকাশনা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁর বন্ধু গোপাল ঘোষের নিকট হতে দুশো টাকা পুঁজি নিয়ে এই উদ্যোগে অগ্রসর হন। সামান্য টাকায় একটি ঘরভাড়া নিলেন ৭২ হ্যারিসন রোডে।... এখনকার মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় রেবতী বর্মণের উদ্যোগেই।" অখিল নন্দী হয়তো সবটুকু জানতেন না, তাই ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রতিষ্ঠার পুরো কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন রেবতী বর্মণকে। অপর দিকে কলকাতা-কেন্দ্রিক লেখালেখিতে এই কৃতিত্ব দেয়া হয় মুজফ্‌ফর আহমদ ও সুরেন দত্তকে, সেখানে রেবতী বর্মণের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। রেবতী বর্মণের মৃত্যুর পর প্রকাশিত *'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ'* গ্রন্থের ভূমিকায় মুজফ্‌ফর আহমদ এই ভুল ভাঙার চেষ্টা নিয়েছিলেন, তবে খুব সফলকাম হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছিলেন, "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী স্থাপনের পেছনেও

কমরেড বর্মণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল। শুধু কমরেড সুরেন দত্ত ও আমার প্রেরণাতে যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী স্থাপিত হয় নি একথা আজ সকলের জেনে রাখা ভালো। 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী' এই নামটিও কমরেড রেবতী বর্মণ দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল।"

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে রেবতী বর্মণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই যখন দেখি সংস্থা প্রকাশিত প্রথম তিনটি বই-ই ছিল রেবতী বর্মণ প্রণীত। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি হল : '*সোসাইটি অ্যান্ড ইটস ডেভেলপমেন্ট*', '*মার্কসিস্ট ভিউ অব ক্যাপিটাল*', এবং '*সমাজের বিকাশ*'। গোড়ায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দপ্তর ছিল ৭২ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড)-এর বাড়ির এক ছোট কক্ষে। একই ভবনে ছিল বর্মণ পাবলিশিং হাউস। উভয় প্রতিষ্ঠান অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছিল, তাই একই ছাদের উভয়ের স্থান হওয়ার মধ্যে কোনো বিঘ্ন ছিল না। তবে পার্টি-প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর শক্তি ছিল অনেক বেশি এবং এই শক্তির প্রকাশও তারা ঘটালেন কিছুকাল পরে, যখন তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হল মার্কসবাদের অনুবাদকারী হিসেবে তাদের কর্তৃত্ব। বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয় মন্মথনাথ সরকার অনূদিত ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের '*পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*'। একই বছরের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত হয় রেবতী বর্মণের অনুবাদে '*পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*'। উল্লেখ্য, এর আগে গ্রন্থটি বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেছিলেন বিনয় সরকার, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। বিশ বছর পর গ্রন্থের নতুন দুটি অনুবাদ একই সঙ্গে প্রকাশিত হওয়াটা অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে, তবে দুই অনুবাদে দুই সংস্থা থেকে একই বই প্রকাশ পাওয়া অভাবনীয় কিছু নয়। হতে পারে একে অপরের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদের কাজে ব্রতী ছিলেন, যখন পরস্পরের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান অবহিত হলেন তখন কারো পক্ষে কাজ বন্ধ করে দীর্ঘদিনের শ্রমকে পণ্ড করে তোলার উপায় ছিল না। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর গ্রন্থে প্রকাশকের পক্ষ থেকে একটি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিয়ে গর্ব ও ধৃষ্টতার সঙ্গে লেখা হয়েছিল, "অন্য তরজমাটা অন্য প্রকাশকরা বার করেছেন। তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশক। প্রামাণিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য প্রকাশ করা আমাদের প্রধান কাজ। ইংরেজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই আমরা বই প্রকাশ করে থাকি। তবে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মার্কসীয় লেখকদের লেখার প্রামাণিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কাজকে কোনো অ-মার্কসীয় লেখকের দ্বারা মার্কসীয় সাহিত্যের প্রামাণিক অনুবাদ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি না, কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন লোকই তা বিশ্বাস করতে পারেন না। এই কারণে অন্যরা যদি কোনো মৌলিক মার্কসীয় পুস্তকের বাংলা তরজমা ছাপিয়ে বারও করেন তাহলেও সে-

পুস্তকের প্রামাণিক বঙ্গানুবাদ বার করার যে-দায়িত্ব আমাদের আছে সে-দায়িত্ব কিছুতেই ফুরিয়ে যায় না। এটাই হল আমাদের কৈফিয়ৎ।"

উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে রেবতী বর্মণকে সংযুক্ত করে দেখা যায় না। তিনি বর্মণ পাবলিশিং হাউসের মাধ্যমেই মূলত আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং উভয় সংস্থাকে সমান্তরাল হিসেবে নিশ্চয় বিবেচনা করেছিলেন, আর তাই একই ভবনে দুই সংস্থার ঠাঁই করে নেয়ার সময় মার্কসীয়-অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো ফারাক কেউ দেখেননি। পার্টি যত শক্তি সঞ্চয় করছিল ততই যে কট্টর চিন্তায় আচ্ছন্ন হচ্ছিল এই কৈফিয়ৎ তার একটি প্রতিফলন। এভাবেই পার্টি এগিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ-বর্জনের দিকে এবং পরে সিদ্ধান্ত নেয় আত্মঘাতী সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের।

তবে মার্কসীয় সাহিত্য প্রকাশ নিয়ে এমন গর্বের পরও, দুঃখজনকভাবে আমরা দেখি বাংলায় মৌলিক মার্কসবাদী রচনা হিসেবে অসামান্য মর্যাদায় ভূষিত রেবতী বর্মণের '*সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস*' গ্রন্থের প্রকাশ নিয়ে তারা চরম অবহেলা দেখিয়েছিলেন। বাস্তব নানা বাধা ছিল একথা অনস্বীকার্য, তারপরেও এটা মেনে নেয়া কঠিন হয় যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পাণ্ডুলিপি জমা দেয়া হলেও ১৯৫২ সালে এসে, রেবতী বর্মণের মৃত্যুর পরই কেবল, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রকাশ করতে পারল যুগান্ত কারী এই গ্রন্থ।

এখানে উল্লেখ করা যায়, '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থে সময়ের ছাপ রয়ে গেছে, তার ফলে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়; আবার এই গ্রন্থ ক্ষেত্রবিশেষে সময়কে ছাপিয়ে গেছে, সমকালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছে। গ্রন্থে মানবেতিহাসের যে ধারাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে তা বহুলাংশে পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক, এমনকি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। হতে পারে ভারত-ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা তখনও স্বচ্ছতা অর্জন করেনি, এস. এ. ডাঙ্গের বই তো ছিল অনেকাংশে অনুমান-নির্ভর, ডি.ডি. কোশাম্বী তখনও আত্মপ্রকাশ করেননি, ইরফান হাবিব বা রামশরণ শর্মা ছিলেন ভবিষ্যতের গর্ভে। আর তাই সময়ের সীমাবদ্ধতার একটি ছাপ রেবতী বর্মণের ইতিহাস-বিবেচনায় রয়ে গেছে। এই সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে 'সোভিয়েত ও সমাজতন্ত্র' অধ্যায়ে এসে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি সেখানে বাস্তব সমাজতন্ত্রকে তিনি দেখেছেন অনেক প্রসারিত দৃষ্টিতে, ফলে স্তালিন-বন্দনামুখর ঐ কালে তাঁর গ্রন্থে লেনিনের একাধিক উদ্ধৃতি রইলেও স্তালিনের কোনোরকম উল্লেখই নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সেই সময়ে স্তালিন যখন বিশ্ব কমিউনিস্ট সমাজে মহানায়ক হিসেবে কীর্তিত হচ্ছেন এবং বাস্তব সমাজতন্ত্রের স্থপতি হিসেবে নন্দিত হচ্ছেন তখন স্তালিন-বন্দনার সামান্যতম প্রতিফলনও আমরা রেবতী বর্মণের রচনায় দেখতে পাই না, এটা তাঁর কালজয়ী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ।

তিন

কারাগার থেকে বের হয়ে যে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন রেবতী বর্মণ সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কৃষক আন্দোলন সংগঠনের কাজ। ভারতীয় সমাজ বিষয়ে তাঁর বিপুল পঠন-পাঠন ও নিরীক্ষণ তাঁকে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ করে তুলেছিল। কৃষকদের ওপর চেপে বসা খাজনা ও ঋণের বিপুল বোঝা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে অবহিত ছিলেন এর ইতিহাস সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান থেকে। কারামুক্তির পরপর তিনি লাভ করেন নবগঠিত কৃষকসভার গবেষণা ও তথ্য বিভাগের দায়িত্ব। পরে ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলনে আবদুল্লাহ রসুল নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর অপরাপর সদস্যরা ছিলেন আইন-আদালত: ড. চারু ব্যানার্জি, সমবায় : শিবনাথ ব্যানার্জি, প্রচার : গোপাল হালদার এবং গবেষণা ও তথ্য : রেবতী বর্মণ। তবে রেবতী বর্মণ অসুস্থতার কারণে এই দায়িত্বপালন অব্যাহত রাখতে পারেননি, তাঁর অনুপস্থিতিকালে শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই রেবতী বর্মণ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন আর ঐ বছরের ৫ নভেম্বর বাংলার সরকার স্যার ফ্রানসিস ফ্লাউডকে সভাপতি করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করেন। ফ্লাউড কমিশন নামে সুপরিচিত এই কমিশন ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ বাংলার সরকারের কাছে ৬ খণ্ডে রিপোর্ট পেশ করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কৃষকদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার মধ্যে এই কমিশন গঠন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের রিপোর্ট বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে গণ্য হয়। অমলেন্দু দে-র লেখা থেকে এই প্রচেষ্টায় রেবতী বর্মণের নেতৃভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে ৬২ পৃষ্ঠার 'মেমোরেন্ডাম' এই কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। ১৯৩৯ সালের ২২ মার্চ কৃষক সভার পক্ষ থেকে যাঁরা মৌখিক সাক্ষী দেয়ার জন্য কমিশনের কাছে উপস্থিত থাকেন তাঁরা হলেন, বঙ্কিম মুখার্জি, এম.এল.এ, রেবতী বর্মণ, এম.এ. রসুল ও ভবানী সেন। তাঁদের ঐ মৌখিক সাক্ষী ছিল ১১ পৃষ্ঠার। কৃষক সভার Memorandum ও Oral Evidence মুদ্রিত করা হয়েছে Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol. VI, Calcutta (1941), pp 3-72 পৃষ্ঠায়। উল্লেখ্য এই ৬২ পৃষ্ঠার Memorandum রচনায় প্রধান দায়িত্ব পালন করেন রেবতী বর্মণ। তাঁর রচনাটি কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরে Land Revenue Commission-এর কাছে পেশ করা হয়। এই Memorandum-এ যেসব বিষয় উলি- খিত হয় তা হল: I. General, II. The History of Permanent Settlement, II. The Permanent Settlement in Bengal Today."

ফ্লাউড কমিশনের কাজের সূত্রে তরুণ ব্রিটিশ আই.সি.এস মাইকেল ক্যারিটের সঙ্গে রেবতী বর্মণের যোগাযোগ ও সখ্য গড়ে ওঠে। অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাইকেল ক্যারিটের পরিবারে ছিল উদারবাদী আবহাওয়া। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে তিনি যখন ভারতে কর্মরত, তখন স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা উদ্বুদ্ধ করছে নানা দেশের বুদ্ধিজীবীদের, তাঁর এক ভাই যোগ দিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে ফিরে মাইকেল ক্যারিটও নাম লেখান কমিউনিস্ট পার্টিতে। বিলেতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত, লীগ অ্যাগেইন্‌স্ট ইমপেরিয়ালিজমের নেতা বেন ব্রাডলির সঙ্গে। ব্রাডলিই তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। এই সুবাদে মাইকেল ক্যারিটের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকার ঘটে পি. সি. যোশী ও অজয় কুমার ঘোষের। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কাগজপত্র কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেয়ার বাইরে বিপজ্জনক বিশেষ কোনো কাজ মাইকেল ক্যারিট অবশ্য করেননি। তাঁকে কোনো ভয়াবহ গোপন ষড়যন্ত্রকারী বা গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, আদর্শের তাড়নাতেই তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সহায়ক হতে চেয়েছেন। ছুটিতে যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিম, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নিয়ে ভারতে ফিরে তাঁর চাকরিস্থল হল কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং বা সচিবালয় এবং তিনি হলেন বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারির আন্ডার-সেক্রেটারি। এই পদে থাকাকালে ফ্লাউড কমিশনের কাজের সূত্রে তাঁর সঙ্গে রেবতী বর্মণের যোগাযোগ হয়। জীবনের উপান্তে এসে মাইকেল ক্যারিট যে স্মৃতিকথা লিখেছেন '*দি মোল ইন দা ক্রাউন*' নামে ১৯৮৬ সালে রূপা অ্যান্ড কোম্পানি তা প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের একটি সমস্যার দিক হল, প্রকাশের জন্য নয়, পরিবারের উত্তরপ্রজন্মের সদস্যদের জন্য তিনি লিখেছিলেন তাঁর জীবনকথা। ফলে গ্রন্থের বিন্যাস সঠিক ক্রম অনুসরণ করেনি, অনেককিছুর বিশেষ ব্যাখ্যাও তিনি করেননি। রেবতী বর্মণের নামোল্লেখ তিনি করেননি, কীভাবে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে সেটাও খুলে বলেননি, তবে যাঁর কথা বলেছেন ক্যারিট তিনি যে রেবতী বর্মণ সেটা আমরা বুঝে নিতে পারি। মাইকেল ক্যারিট লিখেছেন :

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে, সঙ্কটগ্রস্ত কৃষকসমাজের কাছ থেকে বর্ধিত চাপের মুখে বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, গরহাজির জমিদারি, যথেচ্ছ খাজনা আদায় ও মধ্যস্বত্বভোগীর বিস্তার তদন্তের জন্য সরকার একটি কমিশন গঠন করে। অবসরপ্রাপ্ত আমলা স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিশনের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পর্যালোচনা করে দেখা এবং এর সংস্কারের সুপারিশ করা। এই সময়ে সর্বভারতীয় কৃষক সভার আওতায় কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে সংগঠিত হলেও চাষীরা আরো জঙ্গি ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছিল। বাংলায় এর নেতা ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। আমাকে বলা হয়েছিল কমিশনে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কৃষক সভার

পক্ষ থেকে যে দলিল প্রদান করা হবে তা প্রণয়নে সভাকে সাহায্য করার জন্য। এক বন্ধুর সহায়তায় আমি কাজটি করি এবং পরে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।"

বঙ্গীয় কৃষক সভার পক্ষ থেকে ফ্লাউড কমিশনের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট যে রেবতী বর্মণ প্রণয়ন করেছিলেন সেটা বিভিন্নভাবে জানা যায়। নন্দলাল চ্যাটার্জি লিখেছিলেন, "এই রিপোর্ট তৈরির জন্য গোটা বাংলার গেজেটিয়ার এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত পুস্তকাদি বিশেষভাবে অনুধাবন করে রেবতী বর্মণ এক রিপোর্ট তৈরি করে কমিশনের সামনে পেশ করেছিলেন।" মাইকেল ক্যারিটের স্মৃতিভাষ্য থেকে রিপোর্টের মুসাবিদায় তাঁর সম্পৃক্ততার কথাও আমরা জানতে পারি। তিনি রেবতী বর্মণের নামোল্লেখ না করলেও লিখেছিলেন, 'ইন কোলাবরেশন উইথ এ ফ্রেন্ড' এবং এই বন্ধুটি যে রেবতী বর্মণ তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। রেবতী বর্মণ এর অল্পকাল আগে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, ফলে মাইকেল ক্যারিটের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে উঠবার মতো বড় অবকাশ ছিল না, উভয়ে যে উভয়ের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন মানস খুঁজে পেয়েছিলেন সেটা এখানে কার্যকর হয়েছিল। উভয়ে ছিলেন একই আদর্শে সমর্পিত এবং চিন্তা-চেতনা পঠনপাঠনে রেবতী বর্মণের গভীরতা নিশ্চয়ই মাইকেল ক্যারিটকে আকর্ষণ করে থাকবে। আরো একটি যোগসাজশ হয়তো এখানে কাজ করে থাকতে পারে। এর আগে কলকাতায় মাইকেল ক্যারিট যখন স্পেশাল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তখন একবার হিজলি বন্দিশালা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। রেবতী বর্মণও কিছুকাল হিজলিতে আটক ছিলেন, তবে তখন কোনো নাটকীয় কিংবা স্মরণীয় সাক্ষাৎ ঘটবার প্রশ্ন না উঠলেও, এটা বুঝে নেয়া যায় যে, ব্যারিকেডের দু'পাশে ছিলেন দু'জন; কিন্তু চিন্তা-চেতনায় ছিলেন একই আদর্শবাহী।

১৯৪০ সালের গোড়ায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন মাইকেল ক্যারিট, বৃটিশ রাজের সেবক হয়ে দ্বৈত ভূমিকা পালন তিনি আর সঙ্গত বোধ করেননি। ফলে ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগও ছিন্ন হয়ে যায়।

চার

পরিচিতজনের কেউ কেউ বলে থাকেন দেউলি বন্দিশিবিরে আটক থাকাকালে রেবতী বর্মণের শরীরে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন কলকাতা এলেন তখন নানামুখী কর্মকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্তি দেখে মনে হয় রোগের প্রকোপ তখনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে যায়নি। ১৯৩৯ সালে তিনি বেলঘরিয়ায় অবস্থান করে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। এই সময়ে তাঁর রোগবৃদ্ধির কথা কেউ কেউ লিখেছেন। তবে রোগাক্রান্ত হয়েও জনসমক্ষে কর্মকাণ্ড তিনি তখন অব্যাহত রেখেছিলেন বলেই মনে হয়। বেলঘরিয়া থেকে কিশোরগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে তিনি আসেন ১৯৪০ সালে, তখন বৃটিশ সরকার কমিউনিস্টদের ওপর দমননীতি তীব্রতর করে এবং অনেকের সঙ্গে রেবতী বর্মণও কলকাতা ও চব্বিশ পরগণা থেকে বহিষ্কৃত হলেন। যুদ্ধের সঙ্কটময়

দিনগুলোতে তিনি শিমুলকান্দিতে ছিলেন এবং লঙ্গরখানা পরিচালনাসহ আরো নানা কাজে সক্রিয় ছিলেন। তবে রোগের প্রকোপে ততোটা কর্মক্ষম আর ছিলেন না। মুজফ্ফর আহমদ লিখেছিলেন আত্মগোপন অবস্থায় তিনি তাঁকে ময়মনসিংহ আসতে বলেছিলেন সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে, তবে "অসুখ বেড়েছিল বলে তিনি নিজে ময়মনসিংহ আসতে পারলেন না। কিন্তু টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক যুবককে ময়মনসিংহ পাঠালেন।" ১৯৪১ সালের জুলাইতে নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে রেবতী বর্মণ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র-বদল ঘটেছে। পরে যখন কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় তিনি পার্টির দায়িত্ব নির্বাহের জন্য কলকাতা আসেন। কৃষক সভা কিংবা পার্টির কাজ কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার উপায় আর তাঁর ছিল না। কুষ্ঠ রোগ তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল এক যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গতায়, তবু তো তিনি কর্ম থেকে বিরতি নেবেন না। আর তাই পার্টির পরামর্শে প্রতাপপুর, চিনসুরায় অবস্থান নেন। প্রতাপপুরের জনৈক কমিউনিস্ট নেতা লিখেছেন, "সম্ভবত ১৯৪৪ সালে শ্রদ্ধেয় কমরেড রেবতী বর্মণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্য পার্টি কমিটির নির্দেশে কলকাতা থেকে বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রতাপপুর জেলা পার্টি অফিসে আসেন, যেহেতু পার্টি-অফিসটি গঙ্গার ধারে অবস্থিত ছিল। কমরেড রেবতী বর্মণ দোতলার একটি ঘরে থাকতেন। তাঁর রোগটা ছিল কঠিন, তাই তিনি মানসিকভাবে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। আমি যেহেতু পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে থাকতাম আমাকেই দেখাশোনা করতে হত। আমার পরম বন্ধু ডাক্তার শান্তিকান্ত রায়, তাঁর পরামর্শ মতো কিছুটা সাবধানে, কিছুটা দূর থেকে দেখাশোনা করতে হত। কমরেড বর্মণের দিনরাত্রির আহার একটা বাড়ি থেকে আসত, তার নাম স্মরণে আসছে না, অত অসুস্থতা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন, আলোচনা করতেন আমাদের সাথে। মার্কসবাদী তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন লেখা লিখতেন, কখনও কখনও তিনি বলতেন, আমি দূরে বসে লিখতাম।"

এভাবেই রেবতী বর্মণ সম্পন্ন করেন '*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, রচনা সমাপ্ত করে ভূমিকায় তারিখ ও স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৩, প্রতাপপুর, চিনসুরা"। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ রচনায় মার্কসবাদের মূল গ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এ দেশের এবং বিদেশের বহু মনীষী ব্যক্তির লেখারও সাহায্য লইতে হইয়াছে।" অনুমান করা যায়, বইপত্রের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য তাঁকে কলকাতার কাছে কোথাও অবস্থান নিতে হয়েছিল এবং পার্টির সহযোগিতায় প্রতাপপুরে মিলেছিল এই আশ্রয়। মনে হয় পাণ্ডুলিপি রচনা সম্পন্ন করার পর রেবতী বর্মণ প্রতাপপুর থেকে চলে এসেছিলেন দেশের বাড়ি শিমুলকান্দিতে। ১৯৪৬ সালে তিনি যে শিমুলকান্দিতে ছিলেন তার বিভিন্ন পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে। দেখা যায় রোগ ইতোমধ্যে তাঁকে শারীরিকভাবে আরো গ্রাস করেছে।

রেবতী বর্মণের শেষ জীবন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না, কেবল এটুকু বুঝতে পারি বড় গভীর বেদনার মধ্যে কেটেছে তাঁর দিনগুলো। এক ভ্রাতুষ্পুত্রের জবানিতে জানা যায় বেলঘরিয়া থাকতে পরিচিত পরিবারের তরুণী সদস্য লিলি দে শিমুলকান্দিও এসেছিলেন, পরম যত্নে কাকার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। লিলি দে ছিলেন বি.এ পরীক্ষার্থী এবং রেবতী বর্মণ তাঁকে পড়িয়েছিলেনও। তবে সবার থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন জীবনই কাটাতে হয়েছে রেবতী বর্মণকে। এর মধ্যে ঘটল দেশভাগ, বর্মণ পরিবারের সদস্যরা একে একে দেশ ছাড়লেন। শেষ পর্যন্ত গুরুতরভাবে রোগাক্রান্ত রেবতী বর্মণ দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন আগরতলায়। সুখরঞ্জন বর্মণ লিখেছিলেন, "কাকা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ১৯৫১ সালে আগরতলায় চলে গেলেন। তাঁর দীর্ঘদিনের সাথী নদের চাঁদকে সাথে নিলেন। আমরা তাঁকে 'নইদা কা' বলে ডাকতাম। কাকা ১৯৫২ সালের ৬ মে আগরতলাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তখন কলকাতায় চলে এসেছি। কাকার সাথে আমার আর দেখা হয়নি।"

আগরতলা এসে রেবতী বর্মণ চালা তুলেছিলেন শহর থেকে দূরে অরুন্ধতী পাহাড়ে। এই তথ্য জেনে চমৎকৃত হই, আমাদের চারপাশের মানুষজন থেকে আলাদা এই ব্যক্তিসত্তা শেষ জীবনে কেমন ঠাঁই করে নিয়েছিলেন নক্ষত্রের নামখচিত এক টিলায়। আরো চমৎকৃত হই যখন দেখি দীর্ঘকালের, প্রায় পাঁচ-ছয় বছরের অদর্শনের পর, এই সময় রেবতী বর্মণের খোঁজ করে মহৎপ্রাণ মুজফ্‌ফর আহমদ আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অসাধারণ সেই সাক্ষাৎ সম্পর্কে বেশি কিছু জানার উপায় নেই, সামান্য কয়েক ছত্র লিখেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ, পড়তে গেলে শিহরণ জাগে। তিনি লিখেছেন :

"মাঝে অনেক বছর কমরেড রেবতী বর্মণের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। গত নভেম্বর মাসে আমি আগরতলা গিয়েছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে আমি শেষ দেখা করে আসি। শহরের বাইরের দিকে একটা টিলার ওপরে খড়ের চালা তুলে তিনি বাস করছিলেন। শহরের একজন যুবক আমাকে তাঁর নিকটে নিয়ে যান। তিনি আমার থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'রেবতীদা, আপনার সঙ্গে মুজফ্‌ফর সাহেব দেখা করতে এসেছেন।' শুনেই তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, তাঁর সেই পুরনো হাসি, সেই পুরনো স্বর, কিছুই বদলায় নি। কিন্তু দেখলাম ঝড় বয়ে গেছে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে। চোখে খুব ঝাপসা দেখতে পান। এই অবস্থাতেও আমাদের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো কিছু অজানা নেই, খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনেন আমরা কোথায় কি করছি, আর না করছি। কোনো বিশ্বস্ত পার্টি সভ্যকে পেলে পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হতে চান। আমি মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে পারলাম না বটে; কিন্তু মন আমার ব্যথায় ভরে উঠলো।"

দীর্ঘ দিনের দুই সংগ্রামী সাথীর এই সাক্ষাৎ, অনুমান করা যায় ভাষাহীনতার গভীরে খুঁজে ফিরছিল পরস্পরকে বোঝার উপায়। কেবল ব্যক্তিসত্তার ওপর দিয়েই ঝড়

বয়ে যায়নি, দেশভাগ ও হিংসা-বিদ্বেষের রাজনীতি তছনছ করে দিয়েছিল কত না সংসার, বিপর্যস্ত হয়েছিল কত অযুত জীবন। এই পটভূমিকাতে ১৯৫২'র ৬ মে রেবতী বর্মণ বিদায় জানালেন জগৎসংসারকে, অরুন্ধতী পাহাড়ের কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন যেন আমাদের চারপাশের ক্ষুদ্রতাকীর্ণ খর্বকায় মানুষদের কেউ নন, গ্রহান্তরের আগন্তুক! এসেছিলেন আলোর দীপ্তি নিয়ে, ফিরে গেলেন আবার নক্ষত্রলোকে, মহাশূন্যতার মাঝে মিটমিটে এক তারার আলো হয়ে জ্বলছেন, ধুলোয় ঢাকা বর্তমান থেকে আমরা হয়তো তা দেখতেই পাই না।

ব ই আ লো চ না

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

.....

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কেরা

বই	:	মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর **[কথোপকথন]**
অংশগ্রহণে	:	এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা
প্রকাশকাল	:	প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৯
প্রকাশনী	:	প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা
ভূমিকা	:	সালাহউদ্দীন আহমদ **[সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র]**
পৃষ্ঠাসংখ্যা	:	১৪৮
মূল্য	:	দুই শ টাকা

.....

১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে আজ পর্যন্ত বিস্তর কথাবার্তা সভাসমিতি, বৈদ্যুতিক মাধ্যমে হয়েছে। রাশি রাশি লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত

হয়েছে। অনেকে গ্রন্থাকারেও এ বিষয়ে লিখেছেন। এ সব কিছুকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বলে দাবি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যা লক্ষ করার বিষয় তা হল, এর বিপুল অধিকাংশই দলীয় প্রচারধর্মী। এর সাথে বাস্তব ঘটনা, তথ্য উপাত্তের কোন সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে ১৯৭১ সালের এই যুদ্ধকে দলীয়করণের প্রচেষ্টাই এই সব অবাস্তব এবং তথ্য উপাত্তহীন আলোচনা, কথাবার্তা ও লেখালেখির মূল উদ্দেশ্য। কোন যোগ্য ঐতিহাসিক বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে এই ধরনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। যে দুই-একজন এ বিষয়ে এভাবে কিছু কথা বলেছেন তাঁরা কেউই ইতিহাস চর্চা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে নয়, কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবেই ইতিহাসের নামে এমনভাবে ঘটনা সাজিয়েছেন যা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এগুলো ইচ্ছাকৃত মিথ্যা এ কারণে যে, বাস্তব ঘটনা ও তথ্য উপাত্তের সাথে, এ সবের বিশ্লেষণের সাথে, এঁদের এই তথাকথিত ইতিহাস চর্চার কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু এসব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেই তাঁরা এ কাজ করেছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সব গুরুত্বপূর্ণ দিকের আলোচনা তার মধ্যে না থাকলেও, ১৯৭১ সালে ভারতের জমিনে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধ, যা সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত, কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার একটি বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় মঈদুল হাসানের 'মূলধারা '৭১'-এ।

এই গ্রন্থটিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে আখ্যায়িত করা না গেলেও সে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার সাথে দলীয় প্রচারধর্মী অসংখ্য বইয়ের ভিড়ে 'একটি নির্দলীয় ইতিহাস' বলে উল্লিখিত গোলাম মুরশিদ-এর 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর' নামে একটি বই 'প্রথমা' প্রকাশনী থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বিজ্ঞাপন দেখে আকৃষ্ট হয়ে আমি সেটি কিনে এনে পড়ার পর রীতিমতো হতাশ হলাম। কারণ এটি চাঁচাছোলা দলীয় ইতিহাস না হলেও একে আওয়ামী ঘরানার ইতিহাস বলে সহজেই আখ্যায়িত করা চলে। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা বইটি সংগ্রহ করে পড়তে পারেন, কিন্তু আমি বইটি পড়ে একেবারে হতাশ হয়েছি এ জন্য যে, এতে লেখকের রাজনৈতিক জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য (Circumstantial evidence) ব্যবহার ইত্যাদির কোন পরিচয় নেই। "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে" মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদী নায়ক বানিয়ে এতে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হয়েছে তার সঙ্গে আওয়ামী ঘরানার দলীয় ইতিহাসগুলোর কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।

একই প্রকাশক কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন' নামে একটি বই ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। এই কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী হলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চিফ ও বর্তমানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে.

খোন্দকার, 'মূলধারা '৭১' গ্রন্থের রচয়িতা মঈদুল হাসান এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক সিনিয়র অফিসার এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস.আর. মীর্জা। বইটির ভূমিকা লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ।

মৌখিক ইতিহাস (Oral history) বলতে যা বোঝায় এটি হল, সেই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধের এক ইতিহাস। একই সঙ্গে এটি হল ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ। আমি মনে করি, এই কথোপকথনে তিনজনের একজনও কোন মিথ্যা বা বানোয়াট কথা বলেননি এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এদিক দিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ওপর যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ হিসেবে এটি একেবারেই তুলনাবিহীন। এই কথোপকথন পড়ে আমি নিজে আরও প্রীত হয়েছি এ কারণে যে, ১৯৭২ সাল থেকে প্রায় এককভাবে, ধারাবাহিকভাবে ও বিরামহীনভাবে আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কথা বলে এসেছি, তারই প্রবল সমর্থন এই কথোপকথনের মধ্যে আছে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে যেসব কথা বলে এসেছি তাতে আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা কেউই আমার লেখার উপজীব্য ও বক্তব্যের ওপর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা না করে সকলেই আমার ওপর ব্যক্তিগত গালাগালি বর্ষণ করে সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ করার বিষয় যে, সেই একই কথা উল্লিখিত বইটির তিন কথক বলা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোন আওয়ামী লীগ নেতা, আওয়ামী ঘরানার কোন বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিক নামধারী ব্যক্তিই এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। না করারই কথা, কারণ কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীরা বদরুদ্দীন উমর নন যে, দেশের স্বাধীনতাবিরোধী বলে তাঁদেরকে ইচ্ছেমতো গালাগালি দেওয়া যায়। তাঁরা হলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ভারতে অবস্থানকারী মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। এঁদের মুখে হাত দেওয়া সহজ তো নয়ই, সম্ভবও নয়। সেটা সম্ভব হলে বইটি প্রকাশের পর শেখ হাসিনা এ.কে. খোন্দকারকে নিশ্চিতভাবে তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থানের কারণে বইটির বক্তব্য নিয়ে খোন্দকারের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা হাসিনারও নেই। এই একই কারণে দালালি ও চামচাগিরিতে অভ্যস্ত আওয়ামী ঘরানার কোন বুদ্ধিজীবীও আজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে সাহস করে এগিয়ে আসেননি।

আলোচ্য বইটিতে যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে তা কতকগুলো বিষয়ে বিভক্ত আছে, যেমন অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ যুদ্ধ, স্বাধীনতার ঘোষণা, সশস্ত্র লড়াই, সেনাবাহিনীর মনস্তত্ত্ব, যুব শিবির প্রসঙ্গ, গেরিলা তৎপরতা, মুজিব বাহিনী, স্বাধীনতার পরবর্তী প্রসঙ্গ ইত্যাদি। আমি এখানে সব প্রসঙ্গ আলোচনা না করে একে সীমাবদ্ধ রাখব অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে। কারণ এ বিষয়গুলোর ওপরই

আমি নিজে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আমার দুই খণ্ডে প্রকাশিত বই Emergence of Bangladesh এবং অন্যান্য রচনায়। প্রথমে এসব বিষয়ে আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমি আলোচ্য বইটির কথকদের বক্তব্য কিছুটা বিশদভাবে উল্লেখ করব। এ জন্য তাঁদের কথার অনেক উদ্ধৃতি আমাকে এখানে প্রয়োজনবশত দিতে হবে।

আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে যে ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল তার ভিত্তিতেই তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচন করেছিল। জয়লাভ করলে ৬ দফা তারা বাস্তবায়ন করবে এই ছিল ভোটারদের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি। শুধু ভোটারদের কাছেই নয়, ছাত্রলীগের কর্মীসহ আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছেও তারা এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল। এ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নির্বাচনের পর পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় এ নিয়ে দুই পক্ষে কিছু দরকষাকষির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুটি আসন ছাড়া বাকি সব আসনেই জয়লাভ করে একক দল হিসেবে পাকিস্তান সংবিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়, কোনো আপোষ আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হয়। এ নিয়ে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব এবং আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা দলীয় নেতৃত্ব, বিশেষত শেখ মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

৬ দফা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলে এই অঞ্চলে যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হতো তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজির স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত হত এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্থানীয় পুঁজির বিকাশ দ্রুততর হত। এ জন্য উভয় পক্ষে যে সমঝোতার প্রয়োজন ছিল তাতে আওয়ামী লীগকে ৬ দফার থেকে কিছু ছাড় দিতেই হত। এ নিয়েই শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার ও সেই সাথে ভুট্টোর আলোচনা চলে। এ ক্ষেত্রে আপোষের প্রশ্ন অবশ্যই ছিল। কারণ সেটা না হলে আলোচনার প্রাথমিক শর্তই পূরণ হত না। কিন্তু শেখ মুজিবের ওপর ছাত্রলীগ এবং অন্যদের চাপ ছিল ৬ দফার ক্ষেত্রে কোন রকম আপোষ না করার। শেখ মুজিব চাইছিলেন পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা তাঁর এজেন্ডায় ছিল না। কিন্তু এজেন্ডায় এটা না থাকলেও শুধু ছাত্রলীগই নয়, দেশের বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল, তাদের ছাত্র সংগঠন ও দেশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে তখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল যাতে স্বাধীনতা তাদের এজেন্ডায় এসে গিয়েছিল। রাস্তায় তখন আওয়াজ উঠেছিল, 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাঙলাদেশ স্বাধীন করো। ঢাকার দেওয়ালে দেওয়ালে তখন এই আহ্বান জানিয়ে অনেক চিকাও মারা হয়েছিল। ১ মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা দেওয়ার পর এই পরিস্থিতি দ্রুত পরিপক্ব হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব নিজে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আপোষ করারই পক্ষপাতী ছিলেন। ৭ মার্চ ছাত্রলীগ নেতাদের চাপে রেসকোর্স ময়দানে তিনি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ইত্যাদি বলে দেশের

জনগণকে লাঠিসোঁটা নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেও, নিজের বক্তৃতা শেষ করেছিলেন 'জয় পাকিস্তান' বলে। আমি এটা নিজের কানে শুনেছিলাম। এ তথ্য কবি শামসুর রাহমান 'কালের ধূলোয় লেখা' নামে লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কাজী নূরুল ইসলাম লিখেছেন তার একাত্তরের যুদ্ধের স্মৃতিকথায়, বিচারপতি হাবিবুর রহমান লিখেছেন 'বাংলাদেশের তারিখ' নামে তাঁর বইটিতে, ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমদ একাত্তরের ওপর লিখিত তাঁর ' জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প' নামক উপন্যাসে লিখেছেন যে, অনেকের কাছে তিনি এ ধরনের কথা শুনেছেন যারা আওয়ামী ভাবধারার মানুষ। সে সময় টেপ রেকর্ডারের প্রচলন হয়নি। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে কেউ টেপে ধারণ করেননি। রেডিওর কর্তৃত্ব তাই মার্চের পর আওয়ামী লীগের লোকদের হাতে পড়ায় তারা এই অংশে তাদের স্বভাবসিদ্ধ মিথাচারী অভ্যাসের কারণে মুছে ফেলেছিল। কাজেই তার কোনো শাব্দিক রেকর্ডের কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই। ৮ই মার্চের কোনো পত্রিকাতেই ঐ বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ তখন ছাপা হয়নি। কিন্তু সেটাই ছিল বাস্তব সত্য এবং তৎকালে শেখ মুজিবের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭ মার্চ-এর পর থেকে যুদ্ধে যাওয়া অথবা কোন প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতির ধারেকাছে না গিয়ে তিনি গান্ধীবাদী পদ্ধতিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকেন। এই আলোচনা নিশ্চয়ই স্বাধীন বাঙলাদেশের জন্য হচ্ছিল না, হচ্ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির উদ্দেশ্যে। শেখ মুজিব যেহেতু আওয়ামী লীগের একক নেতা ছিলেন কাজেই তাঁর এই অবস্থানের জন্য স্বাধীনতার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের কোনও রাজনৈতিক নির্দেশনা ও যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল না। বস্তুতপক্ষে শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে বড় আকারে ভূমিকা রাখলেও একজন সংসদীয় রাজনীতিবিদ হিসেবে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ কারণে জাতির অতি সংকটজনক মুহূর্তে তাঁর নেতৃত্ব ধসে পড়ে। তিনি দেশবাসীকে যুদ্ধে যাওয়ার ডাক দিয়ে নিজে সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে ঘরে বসে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী যে, এক মহা মিথ্যার দৃষ্টান্ত এতে সন্দেহ নেই। শুধু একটি দলের নয়, নিজেকে সমগ্র জাতির নেতা হিসেবে দাবী করে, জনগণকে যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে শেখ মুজিব যেভাবে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তার তুল্য ঘটনা কোনো দেশে ঘটেনি। এমন কোন দেশ নেই যার নেতা বা সিপাহসালার অন্যদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিজে শত্রুর কাছে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করেছেন।

এর ফলে যা ঘটেছিল তা হল, আওয়ামী লীগ মহলে পুরোদস্তর হতবুদ্ধিতা। এই হতবুদ্ধিতা থেকে যুদ্ধে যাওয়ার চিন্তার পরিবর্তে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই তাঁদেরকে তাড়িত করে এবং তাঁরা দেশের জনগণকে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে সমর্পণ করে, তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন ও খুনখারাবীর মধ্যে রেখে দেশত্যাগ করে ভারতে পলায়ন করেন। সেখানে গিয়ে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরা ভারত সরকারের ওপর অর্পণ করে সহযোগীর ভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এর ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল, যার বিস্তারিত কিছু বিবরণ উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্যে আছে। একটি দেশ নিজেদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্য দেশের সাহায্য অবশ্যই চাইতে ও নিতে পারে। কিন্তু নিজের দেশের মাটি থেকে দলে দলে পালিয়ে যেয়ে অন্য দেশে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালালে সে যুদ্ধের যা পরিণতি হওয়ার তাই হয়েছিল। ভারত সরকার তাদেরকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছিল। শুধু তাই নয়, যে ছাত্রলীগ নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা ভারতে গিয়ে কোনো যুদ্ধ করেননি। ভারতীয় সরকার ও সামরিক বাহিনীর মার্কিনপন্থী অংশের নিয়ন্ত্রণে 'মুজিব বাহিনী'তে থেকে তারা সবক নিয়েছিল কিভাবে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাঙলাদেশে, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা ধ্বংস করতে হবে। বস্তুতপক্ষে তাদেরকে একটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থাই জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে করা হয়েছিল। বাঙলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডাররা স্বাধীন ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়ে অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে কতখানি দুর্বল, এমনকি পঙ্গু অবস্থায় ছিলেন তার বর্ণনাও এই কথোপকথনে আছে।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর এ দেশে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন কিভাবে দেশে লুটপাট, চুরি-দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করে একটি নতুন লুণ্ঠনজীবী শ্রেণী গঠন করেছিল তার কথা আমি আমার অসংখ্য প্রবন্ধে লিখেছি। আলোচ্য কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীরাও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এই ভূমিকার পর এবার আমি 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' শীর্ষক বইটি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে কথকদের বক্তব্য উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপিত করব।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে এ. কে. খোন্দকার বলেন, "আমি ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দেখছি তারা সৈন্য-সামন্ত ও রসদ বাড়িয়েই যাচ্ছে এবং এই কথা আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজাকে জানাই এবং তাঁদের বলি, এই সংবাদ যেন আওয়ামী নেতৃত্বকে জানানো হয়। আমি তাঁদের বলেছি, কীভাবে প্রতিদিন পাকিস্তান থেকে সৈন্য-সামন্ত ও কমান্ডো আসছে, কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আসছে। এই সব কথাই বলার জন্য তাঁদের বলেছিলাম। তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন বলে আমি জানি।" (পৃ ১৯-২০)

এ বিষয়ে এস আর মীর্জা বলেন, "১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আমি লক্ষ করলাম, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম। ২ মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বিমান বাহিনীর অফিসে গিয়ে আমি জানতে চেষ্টা করি কী হচ্ছে, কী হতে চলেছে। আমি কথা বলি এ.কে খোন্দকারের সঙ্গে। তিনি আমার জায়গাতেই বদলি হয়ে এসেছিলেন। পরে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম...। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী লীগের কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি আছে কি না এবং তা জানার জন্য আমাকে বললেন। যুদ্ধ বলতে ওই বাঁশের লাঠি দিয়ে নয়! অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ। তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের এক নেতা ছিল আমার আত্মীয়। ওই অবস্থায় আমি তাকে গিয়ে বললাম, আওয়ামী লীগের যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য। দু'দিন পর সে আমাকে জানাল, আওয়ামী লীগের কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই, এমনিতেই আন্দোলন চলছে।" (পৃ ১১)

এ প্রসঙ্গে এ.কে. খোন্দকার আরও বলেন, "আমি খুব গভীরভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করতাম এবং এই খবরগুলো অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এস.আর. মীর্জা এবং অন্যদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মহলে পৌঁছে দিতাম । কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও হতাশার বিষয় হল, এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আমাদের কেউ কিছু জানায়নি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পথে। কিন্তু আমাদের করণীয় কী– এ প্রসঙ্গে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। কোনো নির্দেশ আমরা পাইনি। এ থেকে আমাদের অর্থাৎ কর্মরত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের মনে হয়েছিল, আসলে আওয়ামী লীগের দিক থেকে কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই। এমনকি এ সংক্রান্ত কোনো চিন্তাভাবনাও তাদের ছিল বলে মনে হয়নি। ফলে ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করল, তখন এটা প্রতিরোধের জন্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এটা ছিল বাস্তব সত্য।" (পৃ: ৮)

আওয়ামী লীগের যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কে মঈদুল হাসান বলেন, "১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তান তার সৈন্যবল পূর্ব পাকিস্তানে বাড়াতে শুরু করে। সেই সময় অনেকে মনে করত, একটা বিশাল রক্তপাত হতে চলেছে এখানে। এই সময়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব আসাফ-উদ-দৌলার বড় ভাই মসিহ-উদ-দৌলা তখন ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার অফিসে জেনারেল স্টাফ ছিলেন, কোর কমান্ডারের জি-২, ইনটেলিজেন্সের দায়িত্বে। তিনি তখন মেজর ছিলেন। ওদের আরেক ভাই আনিস-উদ-দৌলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আনোয়ারুল আলম। তিনি আমারও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মার্চের ৩ তারিখে ওদের কাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে গোপন নানা তথ্য জানতে পারার পর আনোয়ারুল আলম আমার সঙ্গে

দেখা করেন। তথ্যগুলো উচ্চতর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পৌঁছানো দরকার, তাই তথ্য সরবরাহকারী তাঁকে অনুরোধ করেছেন বলে তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তানী আক্রমণের প্রস্তুতি এতটাই এগিয়েছে যে এর মধ্যেই রংপুর থেকে ট্যাংকবহর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাতে রাবার বেল্ট লাগানো হচ্ছে ঢাকা শহরের পথে আক্রমণ বা তৎপরতা চালানোর উপযোগী করে।" (পৃ: ১৩)। এর পর ৫ মার্চ সন্ধ্যায় আনোয়ারুল আলম আবার মঈদুল হাসানের সঙ্গে দেখা করেন ও অন্য কিছু তথ্য প্রদান করেন। মঈদুল হাসান বলেন, "আমি ওই দিনই অর্থাৎ ৫ মার্চ রাত সাড়ে ৯টায় গেলাম শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে।... আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে মেজর দৌলার দেওয়া তথ্য, পাকিস্তানের হামলা বা আক্রমণ-প্রস্তুতি, ট্যাংকবহরকে ঢাকা শহরে চলাচলের জন্য প্রস্তুত করার সংবাদ, এমনকি তথ্যদাতার পারিবারিক পরিচয়ও প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলাম। আমি যা অনুমান করেছিলাম, তিনি শুনেই বললেন, 'আমি সব জানি'। আমি তাঁকে বললাম, আরও সংবাদ আছে দেওয়ার।... আমার সব কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে শেখ মুজিবুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'তাজউদ্দীন জানে ব্যাপারটা?' আমি বললাম, 'না, কেবল আপনিই জানতে পারলেন, সেটাই ছিল তাদের অনুরোধ।' 'তাহলে আপনি তাজউদ্দীনের সঙ্গে আলাপ করে নেন', শেখ মুজিব এ কথা বলে আমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বেরিয়ে রাত ১০টার দিকে তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে যাই। তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। তার পরেও অনেক প্রশ্ন করে আরও বিষয় তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। সব শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুজিব ভাইয়ের কথা শুনে আপনার কী মনে হল? তিনি কেন আপনাকে আমার কাছে পাঠালেন?' আমি বললাম, 'তিনি হয়তো এ ব্যাপারে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না। আবার খবরটা অগ্রাহ্য করতেও পারলেন না। তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দায়-দায়িত্ব এখন আপনার।' তাজউদ্দীন হেসে বললেন, 'এই তো আপনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি বুঝে গেছেন।' এমনিভাবে ওই রকম একটি উদ্যোগের সম্ভাবনা তখন বাদ পড়ে"। (পৃ: ১৩-১৬)

তাজউদ্দীনের এই হাসি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবই ছিলেন সর্বময় কর্তা ও কর্তৃত্ব। সব কিছুই তিনি করতেন এবং সব রকম সিদ্ধান্ত, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও তিনি নিতেন এককভাবে। তাতে গণতন্ত্রের কোন স্থান, কারও সঙ্গে পরামর্শের কোন ব্যাপার ছিল না। কাজেই এ ক্ষেত্রে মঈদুল হাসানের সব কথা শোনার পর এ বিষয়ে কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েই তাঁকে সরাসরি তাজউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে বলে শেখ মুজিব বেশ কৌশলের সঙ্গে ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাজউদ্দীনের হাসির এটাই ছিল মর্মার্থ।

এ সময় ছাত্রলীগের ছেলেরা ৬ দফা নিয়ে কোন আপোষ না করা এবং স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের ওপর চাপ দিচ্ছিল। অন্য দিকে, আওয়ামী লীগের লোকেরা, বিশেষত জাতীয় পরিষদের সদস্যরা, চাইছিলেন ৬ দফাকে সামনে রেখে

একটা সম্মানজনক আপোষরফা। শেখ মুজিব নিজেও ছিলেন এই মতাবলম্বী। কিন্তু জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর ৬ দফা নিয়ে কোন আপোষ-মীমাংসায় যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারণ সেই অবস্থায় ছাত্রলীগের ছেলেদের চাপ এমন ছিল যা মোকাবেলার ক্ষমতা শেখ মুজিবের ছিল না।

তিনি এই অবস্থায় ছিলেন এক উভয়সঙ্কটের মধ্যে। এই উভয়সঙ্কট তাঁর থাকত না যদি তিনি নিজে ৬ দফা নিয়ে আপোষের পক্ষে না থাকতেন এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পরিবর্তে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন না দেখতেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কর্তৃক জনগণের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের ব্যাপারটি জানা সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য বাঙালী সামরিক বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ এবং যুদ্ধ সংগঠিত করার ব্যাপারে কিছুই করেননি। তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কাজেই সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এ কথা বলে তাঁর পক্ষের ওকালতকারীরা যে যুক্তি দিয়ে থাকেন তার কোনো অর্থ নেই। আসলে তিনি নিজে পাকিস্তান থেকে একেবারে বের হয়ে স্বাধীন বাঙলাদেশ গঠনের পক্ষপাতী না থাকার জন্যই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ২৫ মার্চ বস্তুতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধ্বসে পড়েছিল। এটাই ছিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে ঘরে বসে তাঁর আত্মসমর্পণের প্রতীকী তাৎপর্য।

ইয়াহিয়া খান যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করেছিল সে বিষয়ে শেখ মুজিব যথেষ্ট ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে মঈদুল হাসান যে ঘটনার কথা বলেন তার মাধ্যমেই এর প্রমাণ ভালোভাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে নেতৃত্ব কেন একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত আসতে পারেননি, সেটা ভাবাবেগমুক্তভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট ঘটনার কথা বলি। ২২ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রধান আবদুল ওয়ালি খান, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, ওদিকের এবং এদিকের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার বাসায় নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। স্থানীয় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি হিসেবে একমাত্র বদরুদ্দীন উমরের কথাই মনে করতে পারি। ওয়ালি খান এসেই বললেন, আমি আজ সকালে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করি, 'কী তোমার সর্বশেষ অবস্থা?' ইয়াহিয়া বলেন, 'আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছি, সেখান থেকে বেরোতে হলে, 'আই হ্যাভ টু শুট মাই ওয়ে থ্রু।' আমি খবরটা শেখ মুজিবকে দেওয়া দরকার মনে করে গেলাম তাঁর আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানেন, ইয়াহিয়া কী করতে পারে? এ কথা বলতেই শেখ সাহেব বললেন, 'হি উড হ্যাভ টু শুট হিজ ওয়ে থ্রু'। ওয়ালি বললেন, 'ইয়াহিয়া খানের কথা হুবহু শেখ মুজিবের মুখে শুনে আমি থ বনে

গেলাম'। তিনি আরও বললেন, 'তাহলে ওঁদের দুজনার মধ্যে আগেই কথা হয়েছে। (পৃ: ১৭-১৮)

কিন্তু শুধু ইয়াহিয়া খানের সাথেই নয়। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে মঈদুল হাসান বলেন, "অন্যদিকে আমেরিকানরাও জানত। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১০ মার্চ ঢাকায় আমেরিকান কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড শেখ মুজিবের এক গোপন প্রতিনিধি আলমগীর রহমানকে প্রথম খবরটা জানান যে, ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসছেন তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য। ইয়াহিয়া ও মুজিবের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে। আর্চার ব্লাড সে কথা স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো একটি প্রতিবেদনেও উল্লেখ করেন। কিন্তু সেই গোপন পরিকল্পনা আজও অবমুক্ত হয়নি। বস্তুত ১০ মার্চের পর থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত কী দীর্ঘ ১৮ দিনের অধিকাংশ দলিলই এ পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় ওই দুঃসময়ে আমেরিকার ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ও কাদের তারা প্রভাবিত করেছিল, সে ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত।" (পৃ: ১৮)

আসলে ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ ঢাকা আসার পর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডও ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানেরও যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এ সবের কোন রিপোর্ট দেখা যায় না। কারণ এই যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ খোলাখুলিভাবে না হয়ে গোপনে হয়েছিল। এ কারণেই এই সাক্ষাৎ এবং এ সময়ে শেখ মুজিব, ইয়াহিয়া ও ফারল্যান্ডের মধ্যে যে সব কথাবার্তা, পরিকল্পনা হয়েছিল সে ব্যাপারে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে সব ডেসপ্যাচ ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছিল এখনো পর্যন্ত তা অবমুক্ত হয়নি।

Emergence of Bangladesh নামে আমার বইটি লেখার সময়েও আমি দেখেছিলাম 'The American Papers. Department of State United States of America. Secret and confidential. India, Pakistan, Bangladesh. Documents 1965-73 compiled and selected by Roedad Khan. University press limited.' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে বাঙলাদেশ সংক্রান্ত যে সব আদান-প্রদান ঐ সময় ইসলামাবাদ ও ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে হয়েছিল তাতে। মার্চ ১৬ থেকে ২৮ পর্যন্ত তার কোনো উল্লেখ American Papers-এ নেই। অর্থাৎ... ঐ সময় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ও কনসাল ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের সঙ্গে যে সব আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন এবং ২৫ তারিখের অব্যবহিত পরেও ঘটনার সঙ্গে আমেরিকানদের কী সম্পর্ক ছিল তার কোনো হদিস American Papers-এর মধ্যে নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখন যে সব কথাবার্তা এবং পরিকল্পনা তাঁদের মধ্যে হয়েছিল সেটা এখনো পর্যন্ত প্রকাশযোগ্য নয়। সেগুলো তাদের পক্ষ থেকে এখনো গোপন রাখা দরকার। এ কারণে ঐ দলিলপত্র এখনো আমেরিকানরা অবমুক্ত করেনি।

সকলকে পালিয়ে যেতে এবং লাঠিসোঁটা নিয়ে যুদ্ধে যেতে পরামর্শ দিলেও শেখ মুজিব নিজে ঘরে বসে যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সেটা থেকে মনে হয়, ইয়াহিয়া খান ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁকে নিশ্চিত করেছিল। এই নিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করেই শেখ মুজিব বাড়ীতে বসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, ব্যাপকভাবে কিছু দমন-পীড়ন করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবার তাঁরা টেবিলে বসে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করবেন। এক দিকে ছাত্র-লীগের চাপ এবং অন্য দিকে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ সদস্যদের চাপের মধ্যে পড়ে এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং অসহায় অবস্থায় এভাবে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর আর করার কিছুই ছিল না। যেহেতু স্বাধীনতা ঘোষণার চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল না, এ জন্য যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নও তাঁর ছিল না। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে অনেক মিথ্যা আওয়ামী লীগ মহলে তৈরী করা হলেও তিনি তার ধারেকাছে যেতেও সম্মত ছিলেন না। এ বিষয়ে মঈদুল হাসানের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "২৫ মার্চ সন্ধেবেলা, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন চলে যান এ দেশ থেকে, তখন একটা চরম সংকটপূর্ণ অবস্থার মতো হয়। সবাই ভাবতে থাকেন, তাহলে এখন কী করণীয়। এই সময় তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কিছু নেতা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে, অর্থাৎ শেখ মুজিবের বাড়িতে সমবেত ছিলেন। সেখানে এক ফাঁকে তাজউদ্দিন আহমদ একটি টেপ রেকর্ডার এবং ছোট্ট একটা খসড়া ঘোষণা শেখ সাহেবকে দিয়ে সেটা তাঁকে পড়তে বলেন। এ ঘটনা তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে আমার শোনা। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছি, তখন তাজউদ্দীন আহমদকে এ ব্যাপারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ঘোষণা তাজউদ্দীন আহমদের নিজের লেখা। লেখাটা ছিল এমন– *পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করেছে অতর্কিতভাবে। তারা সর্বত্র দমননীতি শুরু করেছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে।* এই খসড়া ঘোষণাটি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়ার পর সেটা তিনি পড়লেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই বললেন না, নিশ্চুপ রইলেন। তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি যখন তাঁকে বললেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কেননা কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কী তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোনো না কোনো জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায় তাহলে সেটাই করা হবে'। শেখ সাহেব তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে একটা দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানীরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।' এ কথার পিঠে তাজউদ্দীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাত সম্ভবত নয়টার পর পরই ৩২ নম্বর ছেড়ে চলে যান"। (পৃ: ২৭-২৮)

পাকিস্তানীরা দেশদ্রোহের জন্য বিচার করবে এই চিন্তা যাঁর মাথায় ছিল এবং এর ভয়ে যিনি ভীত ছিলেন, তিনি প্রকৃত কোন মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদির নায়ক যে হতে পারেন না, এটা নিয়ে তো বিতর্কের কিছু নেই। আসলে তিনি ইয়াহিয়া ও ফারল্যান্ডের সঙ্গে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে বাঙলাদেশের স্বাধীনতার কোনও ব্যাপার ছিল না। যা ছিল তা হচ্ছে নতুন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যাপার।

এটা ঠিক যে, ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছিল যে, জনগণের ওপর একটি আক্রমণ আসছে এবং লড়াই ছাড়া কোন বিকল্প আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ভেঙে পড়া শেখ মুজিবের তখন করণীয় কিছু ছিল না, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া। স্বাধীনতা ঘোষণা যদি শেখ মুজিবের চিন্তায় থাকত তাহলে তাজউদ্দীনের খসড়া অনুযায়ী হোক, অথবা তাঁর নিজের তৈরী হোক, স্বাধীনতার ঘোষণা রেডিও মারফত অবশ্যই দেওয়া যেত, কারণ তখনো পর্যন্ত রেডিও তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। তাছাড়া অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে একটা ফোন করে এই ঘোষণাপত্র দিয়ে দেওয়া, যেখানে তখন শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক ঢাকার খবর সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে এ খবর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু শেখ মুজিব এ কাজ না করে আওয়ামী লীগের প্রচারমতো তাঁর তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসের এক অদক্ষ কর্মীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ঢাকার কেউ জানল না। সেটা চলে গেল চট্টগ্রামে!! এর থেকে বড় গাঁজাখুরি গল্প আর কী হতে পারে? কিন্তু এই গাঁজাখুরি গল্প বা প্রকাণ্ড মিথ্যাই এখন সরকারী পর্যায়ে বাঙলাদেশের ইতিহাসের এক সত্য হিসেবে প্রচারিত হচ্ছে!

এ প্রসঙ্গে মঈদুল হাসান আরও বলেন, "স্বাধীনতার ঘোষণার ওই যে ছোট্ট খসড়াটি তাজউদ্দীন আহমদ তৈরি করেছিলেন, ২৬ মার্চ সেটার প্রায় একই রকমের ঘোষণা দেখি, একই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য কাগজে প্রচারিত হতে, ভারতের কাগজেও হয়েছে। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি, সেই সময় তাজউদ্দীন আহমদ যে খসড়া করেছিলেন, সেটা অন্য কাউকে তিনি হয়তো দিয়েছিলেন। .... পরবর্তীকালে ঘটনার প্রায় এক বছর পর বলা হয়, ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার ঠিক আগে শেখ সাহেব নিজে ইপিআরের সিগন্যালের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠান। (পৃ: ২৯)

তাজউদ্দীনের যে খসড়াটি শেখ মুজিব ভয়ের বশবর্তী হয়ে টেপ রেকর্ডারের সামনে পড়তে সম্মত হননি, সেটাই এভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং এটাকেই শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা বলে আওয়ামী লীগ নেতা ও তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা জোর গলায় প্রচার করছেন। এভাবেই বাঙলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। চট্টগ্রামস্থ রেডিও পাকিস্তানের কয়েকজন কর্মী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা নামে একটি খসড়া তৈরী করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এমএ হান্নানকে দিয়ে তাঁরা সেটি

পাঠ করান। একজন নিম্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতার ঘোষণার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। তাছাড়া সেটি শুনতে পেয়েছিল খুব অল্প কিছু লোক, যারা ছিল চট্টগ্রামে বা তার আশপাশে। পরে ঐ বেতারকর্মীরা মেজর জিয়াউর রহমানকে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' ঘোষণার একটা খসড়া দিয়ে তাঁকে রেডিওতে সেটি পাঠের জন্য অনুরোধ করেন। জিয়া তাতে সহজেই সম্মত হন এবং তিনি ঘোষণাতে কিছু পরিবর্তন করে ২৭ মার্চ সেটি পাঠ করেন, যাতে তিনি নিজেকে বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে এই ভাষ্য পরিবর্তন করে তিনি তাঁর ঘোষণাটি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ থেকে প্রচার করছেন বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আলোচ্য বইটির তিন কথকই কথা বলেন।

এ.কে. খোন্দকার: "এখানে একটি কথা বলব, এই যে ২৭ তারিখে মেজর জিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী, এঁরাই কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ সত্যগুলো আমাদের মনে রাখতেই হবে– অর্থাৎ যা ঘটেছে। এঁরাই নিজ উদ্যোগে মেজর জিয়ার কাছে গিয়েছিলেন, মেজর জিয়া তাঁদের কাছে যাননি। তবে এটা ঠিক, জিয়া তাঁদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি। ... আমি নিজে জানি, যুদ্ধের সময় জানি, যুদ্ধের পরবর্তী সময়েও জানি যে মেজর জিয়ার এই ঘোষণাটি পড়ার ফলে সারাদেশের ভেতরে এবং সীমান্তে যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মনে সাংঘাতিক একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, হ্যাঁ, এইবার বাংলাদেশ একটা যুদ্ধে নামল।" (পৃ: ৩০-৩১)

মঈদুল হাসান: 'আমি অন্যের কথা কী বলব, মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা শুনে নিজে আমি মনে করেছিলাম যে, না, সত্যি তাহলে সামরিক বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এটা আমার মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আমি উৎসাহিত বোধ করি। আমি আশেপাশে যাঁদের চিনতাম তাঁরাও এই ঘোষণায় উৎসাহিত হন। কাজেই জিয়ার সেই সময়টুকুর সেই অবদান খাটো করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তিনিই সবকিছু করেছেন, তিনিই ঘোষণা দেওয়ার ফলে স্বাধীনতা এসেছে– সেটা তো গ্রহণযোগ্য নয়।" (পৃ: ৩১)

এস আর মীর্জা : "২৭ মার্চ বিকেলে পরিষ্কার শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা শুনে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এই ভেবে যে, হ্যাঁ, এখন মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ তাদের সঙ্গে বাঙালি সৈন্যরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। ... মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কোনো আলোচনা বা বিতর্ক আমি শুনিনি। এ বিতর্ক শুরু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে। শেখ মুজিব যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এ নিয়ে কোনো কথা কেউ উত্থাপন করেননি বা বিতর্ক হয়নি। এমনকি জিয়াউর রহমানের শাসনকালেও এ ব্যাপারে কথা ওঠেনি। এটা শুরু হল সম্ভবত ১৯৮১ সালে জিয়াউর

রহমানের মৃত্যুর কয়েক বছর পর। ১৯৯১ সালে বিএনপি নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ জিয়াকে খাটো করার চেষ্টা করে। এর পর থেকেই এ বিবাদটা প্রকট আকার ধারণ করে।" (পৃ: ৩৫-৩৬)

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে এ. কে. খোন্দকার বলেন, "শুধু আমার ঢাকার অবস্থানকালেই নয়, গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ধরেই কিন্তু এই ঘোষণা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি বা কোনো মতবিভেদ আমরা শুনিনি। ... এ ঘোষণা নিয়ে যে বিভ্রান্তি, সেই বিভ্রান্তির খুব একটা মূল্য নেই এ জন্য যে, এই ঘোষণা কখন হয়েছিল, কে দিয়েছিল, কোথায় দিয়েছিল– সেটার অপেক্ষা না করে স্বাধীনতাযুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল ২৫ মার্চ রাতেই। তবে জিয়ার ২৭ মার্চ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা ছিল, তাদের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্ক কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।" (পৃ: ৩৪)

সঠিকভাবেই এ সব বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, মেজর জিয়ার ঘোষণা সেই সংকটজনক মুহূর্তে জনগণের মধ্যে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এদিক দিয়ে সেই ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু এ নিয়ে বিএনপি যেভাবে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক, জনগণের মুক্তিদাতা ইত্যাদি বলে প্রচার করে এটা এক বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার। জিয়াকে পুঁজি করে যারা রাজনীতি করে তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ কাজ করে থাকে। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে যে সব কথাবার্তা ও প্রচারকাজ করা হয় তার থেকে মনে হয় যে, এ দেশে জনগণ বলে কিছু ছিল না, জনগণের সংগ্রাম বলে কিছু ছিল না, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আক্রমণের মুখে তাদের প্রতিরোধের কোন শক্তি ছিল না। কাজেই কোন না কোন ব্যক্তির যুদ্ধ ঘোষণার দিকে তাকিয়ে তাঁরা বসে ছিলেন। কিন্তু ঘটনা সেভাবে ঘটেনি। প্রথম থেকেই জনগণ নিজেই এই স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরাই ছিলেন এই যুদ্ধের মূল শক্তি। তাঁদের এই শক্তি ও তার ব্যবহার ছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, সেক্টর কমান্ডারবৃন্দ, এমনকি ভারতীয় সরকার ও সামরিক বাহিনী পর্যন্ত কারও ক্ষমতা ছিল না বাঙলাদেশ স্বাধীন করার। যে জনগণকে নিষ্ঠুর পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আক্রমণের মুখে রেখে শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জনগণের শত্রু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে বাড়ীতে বসে আত্মসমর্পণ করে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন, যে জনগণকে নিরস্ত্র এবং অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতৃত্ব প্রাথমিকভাবে নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য দৌড় দিয়ে ভারতে একত্রিত হয়েছিলেন, যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাঙলাদেশ স্বাধীন করার দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর ন্যস্ত করে যুদ্ধে তাদের সহযোগী হিসেবে, তাদের তাঁবেদারের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের কোন ঘোষণা বা নির্দেশের জন্য জনগণ অপেক্ষা করেননি। জনগণ নিজেই স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক

হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই প্রকৃত নায়ককে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে বাংলাদেশের নতুন শাসকশ্রেণী ও তাদের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলনেতাকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক বানানোর চেষ্টায় যেসব রাশি রাশি মিথ্যার জন্ম দিয়েছে সেগুলো ইতিহাসের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবর্জনার স্তূপেই তা নিক্ষিপ্ত হবে।

২৭.০৫.২০১০

ক বি তা

.....

একুশ জন কবির একুশটি কবিতা

১.

মু হ ম্ম দ নূ রু ল হু দা

.....

আকাশডাঙার গল্প

ধানের জন্য ধ্যান করছে কৃষক
ছিপ ফেলেছে জমির অথই জলে,
তার পাশেই একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে শিকারিবক,
তার সামনেও জল টলটলে।

ডোবা হোক নদী হোক জল জল ছাড়া আর কিছু নয়,
জমির সুকঠিন বুক চিরে
তার সাদা স্রোত ঘোলা স্রোত পলিস্রোত বয়।

লাঙল তো বড়শি নয়, তবু যা-ই ইচ্ছে হয়
মন তা-ই সয়;
শিকারিবকের ডানাজোড়া পিঠে লাগিয়ে
লাউ-বাঁশের একতারা হাতে কৃষকও লালন হয়,

চরাচরময়;

ডানাহীন বকের পিঠ থেকে রক্ত ঝরে, রক্ত;
তার পায়ের নখরগুলো শক্ত হয়ে যায়, শক্ত;
লাঙলের শাদা ফাল হয়ে ওগুলো ঢুকে পড়ে পাতালে,
পৃথিবীকে বহন করছে যে মৎস্যরাজ
তাকে ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যেতে চায়
ডাল থেকে ডালে;

কৃষক থমকে যায় কৃষক ঘুরে দাঁড়ায়,
সে ডানাহীন বকের পিঠে সোয়ার হয়ে
চাষশিকারি হয়ে যায়;
ত্রিভুবনে ফসল ফলে, তারার বাতি জ্বলে,
চাঁদ-সুরুজ ঘুরপাক খায়

সেই আকাশধোয়া ঘূর্ণি-জোছনায়
বকচাষি ও চাষিবক পরস্পরের মন বদলায় ।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শেষে হেমন্ত শীত বসন্ত আসে,
মনপাখি উড়ে যায় জোনাকি ডানায়
ঘাস ছেড়ে মাটি ছেড়ে আকাশডাঙায় ।

২.

সুব্রত বড়ুয়া

.....

স্বপ্ন

আজীবন স্বপ্নে ডুবে আছি
পায়ে বাঁধা স্বপ্নের ঘুঙুর
নড়তে গেলেই শব্দ, মতিভ্রম

স্বপ্ন ছাড়া অন্য কোনো প্রিয়তমা নেই ।

স্বপ্ন কি কেবল স্বপ্ন,
অলৌকিক ইচ্ছের তুফান?
স্বপ্ন কি কেবল নদী তীব্র বৃষ্টি
জবা ফুল, নৈবেদ্য ও কলার খোলার নৌকো
রাতজাগা মনসা-ভাসান!

নাকি স্বপ্ন চিত্রালয়
দেয়াল-জড়ানো পর্দা
সিনেমাস্কোপ-রঙিন কাহিনী
আলো, টেকনিক-ভৌতিক বিলাস!

কে দেবে জবাব– নাকি
লাস্ট শো শেষ হয়ে গেলে
ফিরে যাব নিজস্ব গলিতে–
বুকে নিয়ে স্বপ্নের কাঠামো!!

৩.

মু হা ম্ম দ সা মা দ

.....

আজ পয়লা আষাঢ়

আজ পয়লা আষাঢ় আজ বৃষ্টি আজ বরষার ঢল
আজ কদম ফুলের গন্ধে মাতাল হৃদয় নিয়ে
কামিনী কেয়ার মালায় তোমাকে সাজাবো রূপসী

আকাশ পরেছে নীলাম্বরী আজ রাধার আদলে
আজ বরষায় ভিজে মেঘবতী আকাশে বেড়াব
আজ বরষায় ভিজে রূপবতী আকাশে বেড়াব

তুমি মেঘবতী– তুমি রূপবতী মেয়ে
আজ তোমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাব
পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বৃষ্টির নাচন ঝরনার উল্লাস

আজ ভেজা পাখিরা থামিয়ে দিয়েছে কাকলি
ভেজা কাঠবিড়ালিরা জোড়ায় জোড়ায় প্রেমে মগ্ন
আজ ভেজা মৌমাছি রানীকে ঘিরে পোহাচ্ছে উষ্ণতা

এই নির্জনতা এই জলের কল্লোল– এই ঘন অন্ধকারে
তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে হাঁটতে
দূর পাহাড়ের গায়ে তুমি আমি গড়াগড়ি যাব

মাধবীলতায় বেঁধে এই বরষার ব্রহ্মপুত্রে নিয়ে যাব
আজ তোমাকে ভাসাব পদ্মায়– রুপালি ইলিশের ঝাঁকে
যমুনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তুমি আমি মিশে যাব

মেঘনার কালো জলে অথই সাঁতারে দেখা হবে
এই বরষায় তুমি অপরূপ সাজে সেজেছ রূপসী
তোমার দেহের মতো নীল অপরাজিতা এখানে মেলেছে পাপড়ি

এই নদীতীরে ভেজা কাশবনে আনন্দসঙ্গম আমাদের
তোমার নিটোল চোখে বৃষ্টি... ভালোবাসা... বরষার ঢল
আজ পয়লা আষাঢ় আজ মেঘলা আকাশ

৪.
মো হ ন রা য় হা ন
....
ডিজিটাল হে বৈশাখ

তুমি কি এসেছ হে বৈশাখ
হঠাৎ ঝোড়ো মেঘে-

বিদ্যুৎবিহীন ঘরে মোমবাতির আলোকে
প্রচণ্ড গরমে দরদর ঘামঝরা শিক্ষার্থীর
পড়ার টেবিলে, মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপাশে
মশার কামড়ে আর্তচিৎকাররত শিশুর শরীরে
দমকা হাওয়া হয়ে জুড়াতে প্রাণ?
তুমি কি এসেছ হে বৈশাখ
কমিশন কিংবা পার্সেন্টেজ ছাড়া

সারাদিন সারারাত সারাক্ষণ বিদ্যুচ্চমকে
আলোকিত করে রাখতে অন্ধকার বাংলাদেশ
ঈশান কোণের থমথমে মেঘ অবিরল
বৃষ্টির ধারায় পোড়া ফসলের মাঠ নাগরিক দাবদাহ
পানির আকাল ঘুচাতে ভরিয়ে দেবে গভীর জলের স্তর
গলির মোড়ের বিশাল লাইনে থাকা জলাধারগুলো
দাউ দাউ গ্যাসফিল্ডের আগুন জ্বেলে!

তুমি কি এসেছ হে বৈশাখ
কালবৈশাখীর উন্মুলন ঝাপ্টায়
ভেঙে-চুরে উড়িয়ে-গুড়িয়ে দিতে
লুইকানের অনন্য অসাধারণ শিল্প-শোভা
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন আর আশ্বাসের ভাঁওতা-ভাগাড়?

আমরা চাই না আর মধুমাখা বুলি
শাসনভাষণ, কুতর্কের লীলাভূমি
দুইবেলা পেটভাত, পরনের কাপড়, ঘুমাবার ঠাঁই
এই আমাদের গণতন্ত্র! না হলে ভোটের বাক্সে
এবার ভরিয়ে দেব চাষাভূষার শরীরের ঘাস
আর চকচকে ব্লেডের দু'ধার!

তুমি কি এসেছ হে বৈশাখ
ক্ষুধা জ্বরা মৃত্যু হাহাকারহীন
শরতের মেঘের মতন শান্তির পায়রা উড়াল
দুধফল জোছনাময় স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশে?

৫.

দু লা ল স র কা র

.....

চাষের জমি

গরু দুইডা চরছে মাঠে
ভাত আহেনা বউডা কিযে!
হাল ছাইরগা বেলা দ্যাহে
আইলে খাইয়া তৃপ্তি ঠ্যাহে–
বউরে কইছে, তুইও এ্যাহোন
দুইডা খাইয়া ল আইলে বইয়া,
শ্যাষে এক লগে বাড়ি যামু
বউডা হাসে পেখম খুইলা,
থাহুম আনে দেহুম আনে
তুমি কেমন চাষা
কোথায় কোথায় চাষ পারো দ্যাহার আছে
উথাল পাতাল
দুইডা কৈতর বুহে
বউডা হাসে খিল খিলাইয়া ।

৬.

র ও শ ন ঝু নু

.....

প্রতিদিন দুঃখকাল

অন্তসার শূন্যতার ভেতর স্বপ্ন ও শপথ বুনে দিয়ে বলেছি, বাতাসে
ছড়ালাম অক্সিজেন, মানবিক মন্ত্রপাঠ;
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ দূরাকাশ, তালগাছ মিশে যাক
এক সুরে পরম প্রশ্রয় নিবেদনে; এই কথা গেয়ে যাই মনে মনে
স্বাপ্নিক সময় ছেড়ে স্বপ্ন তবু চলে যায়
অসহায় শিশুটির মতো ক্লান্ত আহত আড়ালে!
সারাদিন কোলাহল, সারাদিন কালো ধোঁয়া, চোখ ভরে ওঠে জলে...

প্রতিদিন নতুন স্বপ্ন, প্রতিদিন নতুন সকাল
প্রতিদিন স্বপ্নভঙ্গ, প্রতিদিন দুঃখকাল!
রাতের আশ্রয়ে ঋদ্ধ অন্ধকারে প্রতিদিন ডুবে যায় সূর্য;
রেখে যায় গোধূলির লালরঙ,
অহঙ মুহূর্তে জ্বলে ওঠে অন্য আগুনের আভা;
আধফোটা ডিম থেকে পাখির ছানার মতো উঁকি মারে মন,
কখন বদল হবে আন্তঃস্বদেশ লোকাল রেল,
অনিয়ন্ত্রিত গতি বিরতিভ্রমণ...

ভরা ফসলের মাঠে, কাঁধে বয়ে কে ছড়িয়ে গেলো কীটনাশক,
এতটা বিষ! এখন যে অহর্নিশ উড়ালের সাথে ভারি হচ্ছে
প্রতিটি পাখির পালক, প্রকৃতি, আবাদি জমির বুক;
পচে যাচ্ছে পাকা ধান, মূলবীজ, ছায়াচ্ছন্ন আগামীর স্বচ্ছ এই সর্বনাশ
মানবো কীভাবে চাপিয়ে দেওয়া জোর হতাশা...

আমি তো বিরুদ্ধ বাতাসের সাথে একাই লড়েছি এতকাল;
এক থাল সাদা ভাতের পাতের পাশে এক চিমটি নুনও

তুলে দেয়নি কেউ! তবু কোনো লোভ, ক্ষোভ প্রতিশোধ-স্পৃহা
বন্দি নেই পাঁজরের খোপ কিংবা কোমরের বাটে!
কিছু আড়াল বেদনা শুধু পায়ে পায়ে আড়ালেই হাঁটে!
মন খারাপ করা পান্তা ভাতের তৃপ্তির মতো গিলে ফেলি
আর সব দুঃখ, প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা!
বৃদ্ধমূল্যের বাজারে তবু মুখ ভরা হাসি নিয়ে হাঁটি
রাজার মতো! পরিচিত অনেকেই ঈর্ষান্বিত বলে, এত
সুখ পাও কই, এত খুশির জোয়ার আসে কোত্থেইকা?
হাসির আওয়াজটা আরেকটু বাড়িয়ে বলি,
গরিব মানুষ, ওষুধ কেনার পয়সা তো নাই,
হাসি দিয়াই চালাই হার্টের চিকিৎসা:
দীর্ঘশ্বাস সযত্ন আড়াল করে মনে মনে বলি,
এত যে সুস্থতা বিলাচ্ছি বাতাসে
তবুও তা অক্সিজেন হয় না অঢেল কেন!
তবু কেন বুক এত ভারি হয়ে থাকে,
চারপাশের বাতাস কেন এতটা নির্মম, এত ক্ষিপ্ত,
কেন বিষমাখা তীর ছুটে আসে আমারই দিকে! কেন এসে
বিঁধে থাকে আমারই বুকের বাঁ-পাশে অমঙ্গল নিপীড়ন,
অদেখা মাছের কাঁটার মতন!

এইসব বিবিধ যন্ত্রণা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি তবু যাব বহু-দূর...
আমাকে আঘাত করে করে একদিন শেষ হবে অকারণ নিষ্ঠুরতা,
শেষ হবে আমার শূন্যতা; সুনিশ্চিত এই কথা জেনে
আমি আছি ফুল ফোটানোর পথে, হুল বিপরীতে...

৭.

আ য় শা ঝ র্না

.....

হে সমুদ্র

বহুদূর হতে এসেছি সমুদ্র
ভার নিয়ে ক্লান্তির ভেবেছি তুমিই পার
আমাকে এমন শূন্যভাব থেকে
উদ্ধার করতে, তীর থেকে দূরে
যে জাহাজ তার মতো তুমি
দৃষ্টির সম্মুখে, তুমি কি আশ্রয় দেবে?

হে ক্লান্তিহর লবণাক্ত জলরাশি
সভ্যতার সবকিছু ফেলে দিয়ে
এই আমি নতজানু তোমার নিকটে ।
আমাকে আশ্রয় দাও
ঐ বিশাল জলগর্ভে মায়ের ওমে,
পৃথিবীর এ দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে
টেনে নাও গভীর জলরাশিতে ।

৮.

ফ রি দু জ্জা মা ন

.....

কবিতা

জল রঙ ক্যানভাস বিমূর্ত অনুভূতি
হর্ষ বিষাদ নিয়ে ফুটছে ।
রঙের বিচ্ছুরণ লালরঙা কারুকাজ
বিভাজনে বোদ্ধারা জুটছে ।

কেউ বলে লালফুল টুকটুকে লালগাল
বধুয়ার কামরঙা অনুরাগ ।
কেউ বলে হোলিখেলা শোণিত সাগর পাড়ে
শহীদের খুন রঙা দেশ-ভাগ ।
কেউ বলে গিরি লাভা সিঁথির সিঁদুর কিবা
রক্ত স্রাবে লাল উৎপল ।
কারো মনে ফুঁসে ওঠে লালরঙা মেহেদিরা
আলতা চরণ অধরার দল ।
কারো মন ভর করে সূর্যে বিদায় বেলা
হোসেনের খুন জাগে রোজ ।
কারো জিহ্বায় জল ঝরে অবিরল

যা পায়ে তাতেই সারে রসনার অতি ভোজ ।
এত বিভাজন শুনে জল রঙ ফেলে জলে
শিল্পী ভাবেন ছাই-ভস্ম ছবিতা ।
রসিকের অনুভবে চিত্র নামে গলে
কালের দেয়াল হয়ে ওঠে তাই কবিতা ।

৯.

আলফ্রেড খোকন

.....

নির্দেশকের প্রতি

'এখানে তো আলো জ্বালানো যাবে না,
উপরের নির্দেশ'

'উপর, কতটা উপরে?'
'কিন্তু অন্ধকারে লিখবেন কিভাবে'
আমার গোপন ঠোঁট বলল : 'বেশ'

অন্ধকারে কিভাবে ঝাঁপ দেয় গোপন শরীর

দেহ ব্যবহারের আগে দেহ দেখা যায় না
শব্দ ব্যবহারের আগে
        কোনো শব্দই চোখে পড়ে না

ব্যবহারের পরে কাপড়চোপড় পড়তে হয়
সামলে নিতে হয় চোখ ও বুকের জ্যামিতি

মাননীয় নির্দেশক,
এখানে আলো জ্বালবেন না
আমাদের দরকার আঁধারভেদী চোখ ।

১০.

রা য় হা ন রা ই ন

....

রামায়ণ কথা

ঐ দিকে তপোবন, যেখানে তমসা নদী ঘিরে আছে অরণ্যকে মেখলার মতো। অশথের নীচে বসে ধ্যানযোগে দেখেন বাল্মীকি মুনি, তমসার নীল জলে সাঁতার কাটছেন জনক-নন্দিনী আর কবি চন্দ্রাবতী। বর্ষার আকাশ থেকে নেমে, তাদের উপরে, ঘুরে ঘুরে উড়ছে একদল মরাল। হংসীর ডানায় লাগছে চঞ্চল জলের ঝাপটা, আর জলক্রীড়ার আনন্দ যেন ছুঁয়েছে উড়ন্ত ঐ পাখিদলকে।

হঠাৎ বর্ষার মেঘ, কাছের আকাশে যেন উড়ে এল একপাল ডানাঅলা হাতি। বাল্মীকি দেখছেন দূরে তমসার জলে তখনো চলছে সেই ডুব-সাঁতার । বৃষ্টি এলে ভিজে ওঠে ভূর্জপত্র। আদি কবি তখনো দেখছেন। আমরাও গভীর বিস্ময়ে দেখি, সহস্র-বর্ষা আগের ঐ মেঘ, এ বর্ষায়ও একই রকম। অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে পুত্র নিয়ে এ পাড়ায় সীতার পোশাকে আসে কেউ।

ভোরবেলা ঐ পথ দিয়ে যাই, দেখি, ধনুর্বিদ্যা নয়– মাংসের দোকানে দুই ভাই– রাম-দা দিয়ে লাল মাংস কাটার কৌশল শিখছে লব আর কুশ।

১১.

আ দি ত্য ন জ রু ল

.....

ভালোবাসার উপগল্প

যে বাড়িতে হাস্নাহেনা থাকে–
যে বাড়িতে চামেলিরা থাকে,
ছাদে একপাশে ঝুলে থাকে বিনম্র মাধবীলতা
তাকে শুধু শুধু বাড়ি বলো কেন
বাগানই তো বলা যায়!

যে বাড়িতে থাকে লাজুক একজোড়া অপ্রস্ফুটিত মেয়ে
চোখে ফোটে সারল্যের নীল পদ্ম, কামরাঙা ঠোঁটে
পাপড়ির ঢেউ– তাকে শুধু শুধু বাড়ি বলো কেন?
বাগানই তো বলা যায় ।

স্ফুটোন্মুখ দুটি মন দেখি নতমুখী
এক বিকেলে ঝলম দিয়ে আছে বাড়িটির ব্যালকনির ফাকে
সেই দিন থেকে বাড়িটিকে
আমি বাড়ি বলি না বাগানই বলি ।

১২.

আমীর খসরু স্বপন

.....

স্বজনের মুখ

সেলিম মোরশেদকে

হে শিশু অব্যর্থ বলে কিছু নেই, যদিও কিছু কিছু লক্ষ্য কখনো
কখনো অলক্ষ্যেই থেকে যায়

আর তুমি কী ভাববে না সেসব আমার বয়সি হলে?

সব জেনে গেছি, সব বুঝে গেছি, এই আমি আমার সময়ের
বিমারাক্রান্ত পুরুষ
আর চিকিৎসকমাত্রই কি জানে কার কী অসুখ– তদুপরি
ওষুধে ওষুধে ফাঁকি, শব্দে শব্দে ফাঁকি

ফলে উচ্চমূল্যে বিতরণ হল 'আমার' নীরবতা, যদিও পিতারা
ভুলতে পারে না তার অনাদরে থাকা প্রিয় শিশুকে

এখন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমার অপুষ্টি আর জরাগ্রস্ততার
চাপ ঠেকাবো কী করে–

তোমাকে জন্ম দেয়ার দায় তাই বুমেরাং হয়ে গেল এই চন্দ্রপৃষ্ঠে

আর তোমার ভবিষ্যতকে দেখছি তৈরি হতে, হিম জগতের
দিকে ছুটে যেতে

বলো, এসব দেখে কী করে আমি দুহাত বাড়িয়ে দেব তোমার দিকে আর কী
করেই-বা বলব– ‘ক্ষমা করো বাপ, ক্ষমা করো আমাকে’ . . .

এইক্ষণেও তোমার কাঁধে ঝুঁকে আছে যমকালো নিমরাত

তবে আর অনুরোধের কিছু নেই, কিচ্ছু নেই, এখন শুধু বাকি
অন্ধকারের ঢেঁকুরে তলিয়ে যাওয়া . . .

১৩.

তা রি ক টু কু

.....

মারীবীজ

জাগো দূর হিমবাহ, সুষুপ্তির নালে নালে প্রবাহিত মারীবীজ,
অনাবিষ্কৃত গানেরা,
লৌহনিনাদ আমি কুচি কুচি করে তোমাদের তন্ত্রীতে ছিটাই ।
ছড়াই বিভ্রম তাতে পাহাড়ি সাপেরা এসে ময়ূরের ভোজে
পাটপাট ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের ।

ধাতু পরাভূত এই দেশে স্বর্ণগমের উপর দিয়ে হাওয়া বয় ।
সূর্যের ডুবন্ত মুখ ডেকে চলে
এই ঘাড়, কশেরুকা তবু অযৌক্তিক উড়ে যেতে চায় ।

১৪.

মা জু ল হা সা ন

.....

ফুলবাড়ি কয়লাখনি দেখে

সবারই শিরস্ত্রাণ থাকে । থাকে লোহা, গন্ধক আর নীল-কয়লার মায়া
লোহা দিয়ে তৈরি হয় হ্যান্ডকাপ; হাঁড়িকুড়ি...
গন্ধক দেখে মনে হয় স্কুলপড়ুয়া রোদ; সাইরেনের মতো মেলে দেয়া
এক ঝাঁক হলুদ পাঞ্জাবি ।
সেই থেকে চৌচালা স্কুলঘর অথবা পানিজামের মতো ধূর্ত বায়োস্কোপ
অথবা একনিষ্ঠ কয়লাখনি কংক্রিটের মতো সেইসব সত্য ঘূর্ণি...
আহা, পৃথিবীর সব পাগড়িপরা চরকি তৈরি হয় দাদা-পরদাদার কংকাল দিয়ে!
আর তাই, ৮৩ কোটি জোনাকবন্যা আর শুধু ১ বার সাবান-বৃষ্টির পর
যখন মৃত শালিকের গানগুলোকে জীবিত করা হয়
সেও এক বিচিত্র ম্যাজিক!
পাঁচ টাকার কয়েনের মতো ঢেপা-ঢেপা চোখ-করে জীবিতরা দ্যাখে
আমাদের দাদা-পরদাদারা কীভাবে শিশু ফিঙেদের ভালোবাসতেন!
আর আমরা তাদের অথর্ব ছায়া হয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি বাদামি রঙের চিৎকার...

১৫.

সা কি রা পা র ভী ন

.....

টিপ

বৃষ্টি বিকেলি আকাশ
রাঙা সূর্যের টিপ পরে
রাঙা বউ সাজে আজ
আলো ঝলমল লাল হাসি

ঠিকরে ঠুকরে সশব্দে সহাস্যে

বসনভূষণ লেপে দেয়
পাল ছেঁড়ে উড়াল-পরান

তার সাজ-সজ্জায়
লাল নীল খসে পড়া তারা
প্রেমোন্মাদ আত্মহারা ।

বৃষ্টিস্নান শেষে কচুপাতা
জলটিপ খেলে
নিমেষে মিলায় টিপ
পুকুরের জলে ।

চন্দন ঘষে ঘষে রাঙাব কপাল
কাঁটা মেহেদির ফুল-
বেগুনি সূর্য হবে
দূরন্ত কুন্তল ঘেঁষে
জুঁই বেলী শুষে শুষে গন্ধ ছড়াবে টিপ
বকুল শরীর পুঁতে অঙ্কুরিত চারা ।
পানির টলটলে চোখ
দিঘির কপালে ফোটে
রক্তপদ্মের টিপ
আকাশের কপালে ওঠে
ভরা যৌবন চাঁদ টিপ

তোমার চুম্বন টিপ
মাখব কপালে, শরীরে, পৃষ্ঠে, নাভিতে
মৃত্যুর পর পদঙ্গুলি দিয়ে
তুলে দেবে সিঁদুরের টিপ ।
এঁকে দেবে চুম্বন টিপ
শেষ সাথি হয়ে

কবরের বুকে পিঠে
অন্ধকার কালো টিপ
আভরণহীন নিজস্ব পোশাকে
সাদা কাফনের পরে টিপ হবে
কর্পূর দানা
তবু টিপ চাই
টিপ ।

১৬.

শ র মি ন নি শা ত

.....

পূর্ণতার গল্প

সে একটা কিছু চেয়েছিল
অথচ সে যা চাইত তাই দূরে সরে যেত
দুর্মূল্য হয়ে যেত

সে ভাবল হয়তো বেশি কিছু চেয়ে ফেলেছে
তখন ছোট্ট করে একটা এমনকি অর্ধেক করে চাইল
একসময় সেই ছোট্ট চাওয়াটাও পাওয়া হল না

একদিন সে ভাবল হয়তো তার যা আছে তা এত বেশি যে
তার আর পেতে নেই

এবার তার যা ছিল তা থেকে একটা একটা করে দিতে থাকলো
দিতে গিয়ে এতদিন সে যা না পেয়েছে
তা-ই পেতে থাকল
ফলে একদিকে শূন্য হতে হতে অন্যদিকে সে পূর্ণ হতে থাকল ।
এরপর তার চোখে লোকে কখনো জল দেখেনি...

১৭.

অ দ্বি ত্ব শা প লা

.....

বুবুর কাছে পত্র
কবি অলকা নন্দিতাকে

যে সন্ধ্যায় তোর মুখ চাঁদ হয়ে ছিল, তার থেকে কিছু দূরে রাত
মোহাচ্ছন্ন স্বপ্ন পিছু নিল, – হঠাৎ কখন বাড়িয়ে দিলি হাত!
হাতের কী দোষ মন যদি তোর মেলে, আঁধার মাখা নীলাভ আহবান
সুচিত্রিত দ্যুতিময় বেলা গেলে, আমার কেবল ব্রাত্য অভিমান ।

অসময়ে কিছু বেমানান চোখ জলে, শানবাঁধা ঘাট সাঁতারগুলো হারাই
কবেকার সেই সহোদরা বেলা খুলে, দেখছি তাতে স্মৃতি ছাড়া কিছু না
কাছের মানুষ লক্ষযোজন দূরে, ভিন্ন হল এক ঘরে দুই পরী
বাক্সবন্দি পুতুল বেলার সুরে, ঝরে পড়েছে সেই সময় ঘড়ি ।

বহুদিন পর বলছি বুবু শোন, আজও গোপনে সে মেঠো পথ ডাকে
এক্কা দোক্কা দাগ মুছে গেছে বোন, তোকে ছাড়া বলব আর কাকে!
ফুলের ছড়া পাখির পদ্যগান, শুনতে পারি আরও একবার ।
না হয় ক'দিন হাঁটু জলের স্নান, আমরা গেলে ভালো লাগবে মা'র ।

১৮.

মাসুদ সুমন

.....

ফেরা

আপাতত এটুকু জেনেছি
আমাকে ফিরে যেতে হবে
কিন্তু কোথায় ফিরে যাব
যদিও ফেরা শব্দটার সাথে পূর্বকালিক ডেরার
একটা নিশ্চিন্ত গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে

নাগরিক রাস্তায় আচমকাই নীলিমার সাথে দেখা
লাল শাড়ি, লাল টিপ আর একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া ঠোঁটে পুরনো ব্যাথা
স্বামীর সাথে ওর বহুদিন বনিবাট্টা নেই
সর্পিল যৌবন নিয়ে একাকী ফণা তোলা বাস
ভাবলাম এইবার তাহলে কিছুদিন
অন্ধকার গুহায় ফেলা যাবে প্রাচীন নিঃশ্বাস
ফিরে যাবার একটা নিশ্চিন্ত আস্তানা পেয়ে
সরব হয়ে উঠতে চাইলাম;
ও রাস্তায় পা বাড়াতেই ব্যস্ত সমস্ত
বলে উঠল ও 'আজ তাহলে যাই। সন্ধ্যাকালীন নিমন্ত্রণ রয়েছে সী-শেলে।'
আমার পকেটে এখনও জমে ওঠেনি নির্ভরতার উত্তাপ
অতএব ও গুহায় আপাতত আমার স্থান নেই

যদি ফেলে আসা বিষণ্ন কৈশোর অথবা ধূসর যৌবনের
দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া যেত আপাতত সেখানেই যেতাম
অথবা গাছ-গাছালির ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকা আমার সরল গ্রামখানিতে
কিন্তু বদলে যাওয়ার দমকা হাওয়া লেগেছে সেখানেও
স্যাটেলাইট উন্নয়নের রঙিন ঝামটায় খুলে গেছে গ্রাম্য বধূর সলজ্জ ঘোমটা
চকচকে বৈদেশিক নোটের কড়া চোখ রাঙানিতে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস
রাস্তায় রাস্তায় উড়ছে গতিশীল হর্ন।
আমরা যারা দু'পাতা বিদ্যাকে আশ্রয় করে এদেশে
খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলাম

তারা দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ছি মূর্খ রেমিট্যান্সের তোড়ে
অথচ আমি জেনে গেছি আমাকে ফিরে যেতে হবে
কিন্তু কোথায় ফিরে যাব
আমাকে কোথাও মানাচ্ছে না ।

১৯.

আ য় শা আ কা শী

.....

চোখে আত্মহত্যার জল

এইমাত্র জরুরি আবহাওয়া বার্তা ঘোষণা হল
মহাবিপদ সংকেত, দশ নম্বর
মাত্র আধা ঘণ্টার ব্যবধানে ছয় থেকে দশ ।
তখনও আমি দাঁড়িয়ে, স্থির দাঁড়িয়ে
অপলক তাকিয়ে আছি এক রাজকন্যার হাত ধরা মহারাজের দিকে ।
চারদিকে বাতাসে দুঃখ স্লোগান
কেঁপে কেঁপে উঠছে বাণিজ্যমেলার প্রতিটি লোকের শিরা-উপশিরা ।
যেদিকে তাকাই দেখি ভয়ানকভাবে কাঁপছে সারি সারি স্টল
যেখানে কান পাতি শুনি মায়াবী হরিণীর আর্তচিৎকার
দেয়ালে দেয়ালে মাঠের মাঝখানে অপমৃত্যুর চিহ্ন ।
চোখের সামনে সারি সারি স্টলগুলো দশ নম্বর ঝড়ের অন্ধকারে
ধ্বংস হয়ে তৈরি হল মরুদ্যান ।
প্রিয় দেবতা দ্বীপের সামনে তখনও আমি দাঁড়িয়ে
বুক পর্যন্ত জল, হাঁটু পর্যন্ত বালি, পিঠের ওপর বজ্রপাত, বায়ুমণ্ডলে অবিশ্বাস,
চোখের ভেতর আত্মহত্যার জল, মহারাজের হাতের মধ্যে রাজকন্যার হাত ।
এইমাত্র ঝড় থেমে গেছে, সব শান্ত, চারদিকে ধ্বংসের স্তূপ
আমি হাঁটছি পায়ের কাছে লাশ আমি হাঁটছি বাতাসে বেদনার সুর
আমি হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি... যেন কোনোদিন থামার জন্য নয় ।

২০.

হি জ ল জো বা য়ে র

.....

রেশন কার্ড ...

তুমি ডাক স্বপ্নে– আমি জেগে উঠে সাড়া দেই– এই উপকূলের
শহরে জাহাজে জাহাজে আসে গম– শস্যদানা খায় এক উভমুখী
পাখি– আমাদের সমবায় হল– কেষ্ট নগর থেকে সোনাগাছি–
শহরে এবার ঘাস বোনা হবে– ঘাসের ছায়া– ছায়া হবে ঘাস–
ঘাস হবে ছায়ার শরীর– এই উপকূলের শহরে ক্রমে ক্রমে
রাত নেমে আসে– নৈশভোজ শেষে তুমি জেগে থাক–
তোমার ছায়ারা ঘুমায়...

২১.

বা প্পী জো য়া র্দ্দা র

.....

কান্নাশিল্প

রাত পোহালে সকাল হয়; জোছনা পোহালে কী হয়
এই অসমাপ্ত প্রশ্নের মানচিত্রে টিকচিহ্ন এঁকে রাখি,
আমাকে আজো যারা মানুষের স্বীকৃতি দিল না
তাদের প্রতি নোনাজল স্বাপ্নিক জোছনা ছড়িয়ে দিলাম ।

নদীজলে এইসব জোছনা সমাচার পাঠিয়ে দিলাম গোপনে গোপনে
আমার গোপন অভিসারে সিলমোহর দিও না আর...
হৃদয় লেনদেন-এর দলিল তোলা থাক পুরনো সিন্দুকে–
তুমি আমার হাত ধরে পার করো জোছনা মাঠ

প্রতি পূর্ণিমায় আমি তোমার কান্না ধুয়ে দেব ।
অবসর পেলে তোমার চোখের শাদা পৃষ্ঠায় লিখে দেবো দেবীনাম ।
মন্ত্রের প্রণামী অক্ষরে সাজিয়ে দেব তোমার মায়া মুখ
ঘরের জানালা বন্ধের শব্দে আমি বুঝে নিই আজো কাঁদবে তুমি
অথচ তোমার কান্না ধুয়ে যাবে না আমার চোখের জলে ।

প্রকাশিত কবিতার দুটি আলোচনা

.....

সলিমুল্লাহ খান/ সৌমিত্র শেখর

[এ সংখ্যায়ও প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম প্রখ্যাত সমালোচক, প্রাবন্ধিক সুলিমুল্লাহ খান ও প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখরকে । সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন । এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচক দ্বয় কবির নাম উল্লেখ না-করে আলোচনা দু'টি সম্পন্ন করেছেন । এতে আলোচনা দু'টি কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায় । কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা দু'টি কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায় ।]

একরারনামা: কবিতা ও বক্তৃতা

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি । জীবনানন্দ দাশ মহাশয়ের এই কথা সকলেই মানিবেন কিনা, কে জানে? আমি ঘুরাইয়া বলিব, কবি নানা প্রকারের । দাশ মহাশয় কেবল ইঁহাদের কোনো কোনো প্রকারকেই কবি বলিয়া গ্রহণ করেন– আর কি!

ত্রৈমাসিক 'গোলাঘর' সম্পাদক আমাকে একুশটি কবিতা পাঠাইয়াছেন। আমাকে একুশটি কবিতা নিয়াই লিখিতে বলিয়া ছিলেন। আমি সেই পথ পরিহার করিলাম। কারণ এইগুলি কাঁহার রচনা আমি জানি না। কারণ তিনি জানাইতে রাজি হয়েন নাই। না জানাইয়া অন্যায়ই করিয়াছেন। কে জানে? নাম জানা থাকিলে বলা যাইত এইগুলি মধ্যযুগের কবিতা নহে। এখন হইতে পারে যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না। কবির নামই তো অর্ধেক। তাহাই জানিলাম না। এখন প্রভু, তুমিই সব। তবে রক্ষা। মানুষের প্রতি রোমকূপ হইতেই গোপন তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। কবির স্বাক্ষর তাঁহার বাছা অক্ষরেও জড়াইয়া থাকে। এক কবির কবিতায় আষাঢ়, বৈশাখ প্রভৃতি মাস-বন্দনায় তাঁহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। মনসা-ভাসান হইতে 'ডিজিটাল' নৌকা পর্যন্ত তাঁহার হাতে! এই বার বোঝেন কুদরত খানা!!

'কবিতা ও বক্তৃতার মধ্যে ভেদ নাই'– এই কথা বলা যায় না। বক্তৃতাও কবিতা হইতে পারে কিন্তু বক্তৃতাই কবিতা নয়। এই কথা বলা যায়॥ বর্তমান কবির ধৈর্য অল্প, বিশ্বাস ততোধিক অল্প। তিনি কি মনে করেন, তাঁহার পাঠিকারা নির্বোধ? বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ! আহা!!এই বিশ বক্তৃতা একুশ হইত যদি "রেশন কার্ড..." ইহাঁদের মধ্যে না থাকিতেন। অর্থাৎ বলিতে চাহি "রেশন কার্ড" কিছুটা হইলে কবিতা হইয়াছে। কবিতায় কী বলিতে হইবে তাহা জরুরি। কিন্তু কী বলিতে নাই তাহা আরো বেশি জরুরি। বাকি সংযমই কবিতার শিল্প।

"নির্দেশকের প্রতি" নামধারী লেখাটিও কবিতা হইতেছিল। কিন্তু কথা বেশি বলার রুগ্‌ণ কারণে শেষে বক্তৃতা হইয়াছে। শেষের ২ প্যারা বা ৫ পঙ্‌ক্তি না লিখিলেই হইত। "পূর্ণতার গল্প"ও কবিতা হইত, শেষ লাইনটি না থাকিলে। এইখানে উপস্থিত অধিকের কথা আর অধিক কী বলিব! এইখানেও প্রভুর ইচ্ছা। 'রামায়ণ কথা'টাও বেশ। শেষ রক্ষা হইল না এইখানেও। কবিতায় উপদেশ বা নীতিকথা সবসময় কাজ করে– এই কথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু উপদেশই কবিতা নয়। ভিতরের কংকাল কুৎসিত, কে যেন বলিয়াছিলেন– কিন্তু কবিতার শরীর মানে কংকালসার হইলে চলিবে কেন? সন্দেহ কী, কবি নানা প্রকারের। এই কবি শেষ প্রকারের।

পরিশেষে বলিব আমাদের দেশে তো আরো কবি জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উদাহরণ হইবার যোগ্য আছেন– যথা: মাইকেল মধুসূদন দত্ত– তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লইতে হইবে। আমি লইয়াছি এই রকম। মানুষ পশু বটে, তবে সব পশুই মনুষ্য নয়। কবিতাও বক্তৃতা সন্দেহ নাই, কিন্তু সব বক্তৃতাই কবিতা হইবে না। ইহার রহস্য পরম করুণাময় জানেন॥

২৩ মে ২০১০, ঢাকা।

প্র কা শি ত ক বি তা র আ লো চ না [দুই]

অকথা:

প্রকৃত ভোগে চক্ষু-রসনার যুগলবন্দি হওয়া চাই-ই চাই। এর কোনোটির অভাব থাকলে 'খাওয়া' হয়, কিন্তু সম্যক-ভোগ হয় না। বিপুল-বিচিত্র আয়োজন থেকে খাদ্য গ্রহণ করে অন্ধজনের উদরপূর্তি হয় শুধু– মনের পাত্রটুকু ফাঁকাই থেকে যায় তার। রসনাহীন কাউকে কল্পনা করা যাক। দেখে যত ক্ষুধা জাগে তার, লবনহীন খাদ্যগ্রহণে স্বাদে থাকে অতৃপ্তি অপার। উদাহরণটি স্থূল হল? হোক। তবু ভোগ আর উপভোগে এক্ষেত্রে খুব একটা প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না। খাদ্য ভোগের সামগ্রী, কবিতা উপভোগের! কবিকে আড়ালে রেখে কবিতা-পাঠ তাই ছিন্ন যুগলের মতই অসম্পূর্ণ– ক্রন্দনের মতোই এক সুরি। উপরন্তু কবিতা বহুমাত্রিক; বহুবিচিত্র এর প্রকাশ। তাই স্থান ভেদে কবিতার আবেদন হয় ভিন্ন, সময় ভেদে অন্য। ব্যক্তি ভেদেও রস-বৈচিত্র্য ঘটে কবিতার। এ-ত আপেক্ষিকতা নিয়েই আমরা পাঠ করি কবিতা। তবে পাঠমাত্রই সবাই লিখে ফেলি না কবিতা নিয়ে– লিখার আগে ভাবি অগ্র-পশ্চাৎ-ঊর্ধ্ব-অধঃ অনেক কিছু। আমার এ লেখাটুকু 'পাঠমাত্র লেখা'– অনেকটা তাৎক্ষণিক– ক্ষণিক বিবেচনাই এর নেপথ্যে।

কথা:

১.

আকাশডাঙার গল্প

'আকাশডাঙার গল্প' আসলে সরল শব্দরেখার অনুপম স্কেচ। একটি ছবি ভেসে ওঠে– দেখা যায় অনন্ত আকাশ, একটি শাদা বক– আরো কিছু। প্রথম পঙ্‌ক্তির 'ধান' আর 'ধ্যান' এই ধ্বনিসাম্যের চমৎকার আবেশও মিলিয়ে যায় 'বকচাষী' আর 'চাষীবক'-এর মন বদলের পালায়। শব্দ নিয়ে কবির কতই-না কারুকাজ! কবিতার মধ্যমা জুড়ে একটি স্যুরিয়ালিস্টিক আবহ তৈরি করে পাঠককে বেহুলার মতো কল্পনার ভেলায় ভাসিয়ে দেন কবি; বেহুলার চোখে ইন্দ্রলোকের স্বপ্ন– পাঠকের চোখে আকাশডাঙার।

২.

স্বপ্ন

কবি এখানে সেই বহুকথিত মৃত্যুকাতরতা প্রকাশ করেছেন– জীবনটাই তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো ক্ষণিকের। একে যদি 'দর্শন' বলি– তবে এ-ও বলতে হয়, এ দর্শন নতুন নয়। কবিতার পরিবেশনাটা কি নতুন? 'স্বপ্ন' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক পড়তে পড়তে, কে জানে, কেন মনে এল আল মাহমুদের এই কবিতার সুর: 'কবিতা কি? / কবিতা তো

শৈশবের স্মৃতি / কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস / ম্লানমুখ বউটির দড়িছেঁড়া হারানো বাছুর / কবিতাতো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।' হবে হয়তো, কবিরা দিব্যজ্ঞানী– তাঁদের সবারই চিন্তা কোনো এক জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। এখন বলবার ভঙ্গিটাও মিলে যাচ্ছে!!

৩.

আজ পহেলা আষাঢ়

এক নিঃশ্বাসে পড়তে হয়– পড়তেই হয়, থামার উপায় নেই। প্রণয়িণীকে নিয়ে ইচ্ছে নদীতে সাম্পান ভাসানোর কবিতা 'আজ পহেলা আষাঢ়'। অনুভূতির গাঢ়ত্ব নেই, প্রগাঢ়ত্ব তো নয়ই। না থাক। এই কবিতায় প্রেমিকাকে নিয়ে কবির অনুভাবনা জলের মতো–; জলের মতো সরল, তরল এবং প্রয়োজনীয়। চমৎকার গতি আছে কবিতায়, ছিপছিপে স্রোতস্বতীর মতো। এখানে যতিচিহ্নের ব্যবহার নেই, শুধু এ কারণে নয়– গতি আছে কবিতার ভাষায়, শব্দে, শব্দ-ভাবনার পরম্পরায়। ত্রিপদী; নতুন ধাঁচের। তিন পঙ্‌ক্তির প্রতিটি স্তবক যেন সিঁড়ি। পাঠক সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসেন নিচে; গভীরে– সুগভীরে, সেখানেই কবির অনুভূতির সঙ্গে তার অনুভব পদ্মা-মেঘনার মতো একাকার হয়ে যায়।

৪.

ডিজিটাল হে বৈশাখ

সংক্ষুব্ধ কবির প্রচণ্ড উচ্চারণ 'ডিজিটাল হে বৈশাখ'। গতানুগতিকভাবে নয়, কবি বৈশাখকে বরণ করতে চান– ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়ে ফেলার জন্য, আগুন জ্বালার জন্য। সমকালীন জীবন-সমস্যা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়: ঘুষ-দুর্নীতি-বিদ্যুৎহীনতা এমনকি সংসদে মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান ও স্বপ্ন দেখান কিছুই বাদ যায়নি। আমার মনে হয়, এধরনের কবিতা এ পর্যন্ত রেখেই শেষ করা ভালো। কিন্তু কবি শেষ করেছেন: 'না হলে ভোটের বাক্সে / এবার ভরিয়ে দেব চাষাভূষার শরীরের ঘাস / আর চকচকের ব্লেডের দুধার!' অর্থাৎ কবিও যুযুধান। সত্যি কি কবিপক্ষ বিরাট ঐ অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত? বাস্তবতা তা যেহেতু বলে না, সেহেতু এ ধরনের কবিতা এখন কবির কল্পনা-বিলাসে পরিণত হয়েছে; অনেকটা বিকট কালো গণ্ডার দেখে শিশুর হাত-পা ছোঁড়ার মতো।

৫.

চাষের জমি

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় এক চাষি আর চাষি-বৌয়ের কথকতা এবং 'মুগুর উঠিছে মুগুর নামিছে ভাঙিছে মাটির ঢেলা'– পাঠকের মন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়। সেই কবিতায় একটি চমৎকার গল্প আর কবি-কল্পনা আছে। 'চাষের জমি' কবিতা পড়তে গিয়েও মনে পড়ে নির্মলেন্দু গুণকে। মনে হয়, আঞ্চলিক ঢঙটি ছাড়া সবটুকুই গুণের ছায়ায় বেড়ে ওঠা। আঞ্চলিক ঢঙেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে 'কোথায় কোথায়'-এর মতো প্রমিত শব্দ দ্বয়, কৌতুক জাগায়: 'দুইডা কৈতর লইয়া / বউডা হাসে খিল খিলাইয়া'।

৬.

প্রতিদিন দুঃখকাল

কবিতার শিরোনাম এবং শেষ স্তবকের 'এই সব বিবিধ যন্ত্রণা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি তবু যাবো বহু দূর..' পঙ্‌ক্তিটি পড়লেই বোঝা যায় কবি কী বলতে চেয়েছেন– পুরো কবিতা পড়বার প্রয়োজন হয় না। বোঝাই যাচ্ছে, অমানিশা ঘিরে রেখেছে চারি দিক আর কবি একা হলেও লড়ে যাবেন। তো বেশ– লড়ে যান তিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরাও কবির সাথে আছি।– কবিতাটি পড়ে এর চেয়ে আর কী বলতে পারি? (অবশ্য, মুখে সবাই এ ধরনের কথা বলবে, বাস্তবে থাকবে না। কয়েক দশক আগে থেকে এ ধরনের কবিতা লেখা হচ্ছে। কথা দিয়ে কেউ কথা ঠিক রাখে না, এমনকি ডাক দিয়ে অনেক কবিই ঠিকমতো মাঠে আসেন না। সমস্যাটা এখানেই।)

৭.

হে সমুদ্র

কবিতাটি আপাতত সমুদ্র-স্তব, গুহ্যত সৃষ্টির নিগূঢ় ভাবনা। এ কবিতা পাঠমাত্রই বোধগম্য নয়, পাঠ ও বোধের মধ্যে চিন্তার একটা সাঁকো চাই অনবরত। চিন্তার সুনিবিড়তা এ কবিতা থেকে দর্শনানন্দ জাগায়।

৮.

কবিতা

এ কবিতায় শিল্পের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা জন-স্থান-সময়ভেদে কেমন হতে পারে তারই ইঙ্গিত আছে। আমি 'অকথা' শিরোনামে সে অনুভবটুকু একটু আগেই ব্যক্ত করেছি। সত্যি, একই চিত্র দেখে এক পক্ষ বলছে বধূর কামরাঙা অনুরাগ, অন্য পক্ষ বলছে খুন রঙা দেশ-ভাগ– কী বৈপরীত্য! এই বৈপরীত্য বা বৈচিত্র্য ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার নয়– সব মিলেই সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে সৃষ্টি। সম্ভাবনীয় বার্তা নিয়ে 'কবিতা' উপভোগ্য নিশ্চয়।

৯.

নির্দেশকের প্রতি

ইঙ্গিতধর্মী কবিতা 'নির্দেশকের প্রতি'। এখানে দেহ-নির্ভর শব্দ আছে, দেহময়তাও আছে। দিব্যদৃষ্টিসন্ধানী কবি। দেহকে অবলম্বন করেই কি তিনি দেহাতীত হবার বার্তা রটিয়ে যান?

১০.

রামায়ণ কথা

রামায়ণ-কাহিনীর আবহ আর কবিকথা দিয়ে সুন্দর শব্দবয়ন আছে 'রামায়ণ কথা' কবিতার প্রথম স্তবকে। তারপর পুরাণ থেকে বর্তমান– অবরোহ পদ্ধতির কী চমৎকার ব্যবহার! কবি সমকালীন বাস্তবতায় ফিরে আসেন– পুরাণের সবুজ বৃন্তে ফোটে বর্তমানের রক্তফুল।

১১.

ভালবাসার উপগল্প

ভালবাসা শব্দটি আমি 'ভালোবাসা' বানানে লিখতেই পছন্দ করি। ভালোকে ও-কার (ো) দিয়ে জড়ালে আলিঙ্গনের এক আবেশ মেলে। আলিঙ্গন ছাড়া কি 'ভালবাসা' মধুর হয়? সে যাক। 'ভালবাসার উপগল্প' কবিতা-প্রসঙ্গেই তো 'ভালোবাসা'র কথা বলা? ও-কার (ো) নেই সত্যি, কিন্তু মুক্তোর মতো সুন্দর আর আদরণীয় কবিতা এটি। একটি ছোট্ট বিষয়কে যে অনুভবের বিশাল আঙিনায় আনা যায়– 'ভালবাসার উপগল্প' তার প্রমাণ। একে 'উপগল্প' না বলে 'গল্প-আবেশ' বলাই ভালো। কবি-কল্পনায় পাঠক হিসেবে মুগ্ধ হই। রাস্তায় যেতে যেতে এরপর প্রতিদিন খুঁজি কোনো এক 'ব্যলকনির ফাঁকে' সত্যি কি দাঁড়িয়ে আছে 'আস্তো বাগান' কোনো?

১২.

স্বজনের মুখ

তাৎক্ষণিক-পাঠে এ কবিতার মর্মার্থ অনুধাবন দূরান্বয়ী খানিকটা। নষ্ট সমকালের অভিঘাতে কীটদংশন মানুষের গায়– ভবিষ্যৎ আঁধারে বিলুপ্ত-প্রায়। কীটঘ্ন সাহসী মানুষ সত্যি কি বিরল চরাচরে?– একটা দুঃখবোধ সতত তাড়িয়ে বেড়ায় কবিকে; পাঠকের মনেও তা সঞ্চারিত হয় দ্রুত। কারণ ফুটফুটে চাঁদের মতো 'স্বজনের মুখ' তার অন্ধকারের গভীরে ধাবমান।

১৩.

মারীবীজ

একতার আহ্বান, মানুষের মিলনের মহাবাণী, শুভচেতনা, যূথবদ্ধতা– সব কিছু উপেক্ষা করে প্রচণ্ডতর হচ্ছে অশুভত্বে পক্ষপাত। তা না হলে কশেরুকা পর্যন্ত উড়ে যেতে চাইবে কেন– ঘাড়টাও? ঠিক যেন একই কথা: যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা। তবে কি এখনো কাটেনি আঁধার?

১৪.

ফুলবাড়ি কয়লাখনি দেখে

এ কবিতার বয়নকর্মে ইতিহাসের ইঙ্গিতময়তা বর্তমান। ইতিহাসকে মেলা থেকে কিনে আনা সাজকর্মে জমান হয়েছে যেন। কিন্তু এখানে শুধু মিষ্টত্ব নেই, আছে কটু স্বাদও। অবহেলা আর নিগ্রহেরও যে ইতিহাস থাকে– ছেঁকে আনা হয়েছে সেই সত্য। এক বার কবিতাটি পাঠের পর
চিন্তামগ্ন না হয়ে উপায় নেই।

১৫.

টিপ

টিপ হল নারীর সেই অঙ্গ-প্রসাধন যার স্পর্শে স্নিগ্ধতায় নেয়ে ওঠে নারী– অপার সৌন্দর্য মুখ জুড়ে আসে তার– সরল আকর্ষণে জাগায় পুরুষের চোখ। আর এই টিপ নিয়ে যখন কবি লেখেন কবিতা, তখন কবিতাও স্নিগ্ধতার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারে পাঠককে। হয়েছেও তাই। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে, বিকেলের পড়ন্ত লাল সূর্যকে টিপ কল্পনায় এনে কবি এই কবিতার প্রথম স্তবকে একটি চমৎকার আবেশময় চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। তারপর গেছেন নারীর কাছে, প্রেমিকায়– গেছেন প্রেমিকার নাভিমূল অবধি। সেটা যান তিনি; কবি যখন– তখন সে অধিকার তাঁর আছে– আর সে যদি প্রেমিকা হয় তাহলে খুবই স্বাধীনতা আছে তার কাছে গিয়ে কবির লুটোপুটি খাবার। কবি এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন মৃত্যু-পরবর্তী ধর্মীয় সংস্কারকেও। মিশে গেছে দুই ধর্মেরই সংস্কার। মৃত পুরুষের পদাঙ্গুল দিয়ে নারীর সিঁদুরের টিপ তুলে নেয়া– একই সঙ্গে অন্ধকার কবরের বুকে সাদা কাফনে কর্পুরের দানার টিপ– সত্যি সর্বত্র টিপময় হয়ে যাওয়া নয় কি? আর টিপময় হয়ে যাওয়াই তো সৌন্দর্যময় হয়ে যাওয়া– স্নিগ্ধতা ছড়ানো! 'টিপ' কবিতা সেই সুন্দরতা ও স্নিগ্ধতার আধার।

১৬.

পূর্ণতার গল্প

আমি কবি হলে এ কবিতার নাম দিতাম 'পরিপূর্ণতার গল্প' । 'পূর্ণতা' আর 'পরিপূর্ণতা'র মধ্যে ব্যাকরণগত প্রভেদ খুব সামান্য হলেও চেতনাগত প্রভেদ প্রচুর– অর্থগত ফারাকও অনেক । সব কিছু বিসর্জন দিলেই তবে নির্বাণ– ভারতীয় পুরাণের এই মর্মবাণীই কি কবিকণ্ঠে 'তোমায় আমি দিই নি কেন সকল শূন্য করি'র মতো করে প্রকাশ পেয়েছে? এ কবিও কি তাই বললেন– এবার সে একটা একটা করে দিতেই থাকল এবং শুন্য হতে হতে পূর্ণ হতে থাকল? সত্যি, এক এক করে বাঁধন খুলে ফেলার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই, নির্ভার হওয়ার মতো সুখ আর কিছুতেই নেই– আর সুখেই তো পরিপূর্ণতা ।

১৭.

বুবুর কাছে পত্র

ভূগোলের দূরত্ব নিয়ে সহোদরের প্রতি মনের আকুতি মেশানো অনুভব । সত্যি এমন গ্রামীণ অনুভব উষ্ণতা ছড়ায় নগুরে পাঠকের ঊষর চিত্তে । পাঠক নস্টালজিয়া তাড়িত হন– মানসপটে ভেসে ওঠে গ্রামমাখা নিজের অতীত । কবিতাটির ছন্দোবদ্ধতা যে দোলা জাগায়, সেই ঝিমুনিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বপ্নে দেখা যায়; বিশেষ করে তাঁর 'শাশ্বতী' কবিতা । অবশ্য স্বপ্নের কোনো মানে নেই, দিবাস্বপ্ন হলে তো নেই-ই ।

১৮.

ফেরা

সময় নিয়েছে কেড়ে– সব । প্রেম গেছে, পরিচিতি গেছে, বন্ধুত্বও অবশিষ্ট নেই । পকেটটা কালো টাকার থলে হয়নি বলে পালিয়ে যায় পরিচিত স্বৈরিণী । অবশ্য স্বৈরিণী আজ সে; গতকালও সে ছিল প্রেমের মাধবীলতা । সময়ই করেছে তাকে পথচারিণী । সব যাওয়ার মধ্যে সত্যি কিছু বাকি নেই আর– গেছে সাধের অতীতও; গেছে শৈশব, ভালোলাগার মধুর দিনগুলো । ফলে বৃশ্চিক-সময়ের অভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ কোথায় খুঁজবে আশ্রয় পরিশ্রান্ত বেলায়! –কবির জিজ্ঞাসা এটাই । আশ্রয়ের সন্ধানে কবি । কিন্তু নিজেকে বেমানান লাগছে তাঁর পরিবর্তিত পরিপার্শ্বে । ফেরা তাঁর হবে কি নিশ্চয়? পাঠকও তো ফিরতে চান– কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার জালে আটকা পড়েছে আজ অসংখ্য রুপালি ইলিশ!

১৯.

চোখে আত্মহত্যার জল

সমস্ত প্রতিকূলতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মহামহিম হওয়া সহজ নয়। কিন্তু চোখের সামনে যেখানে বিধ্বংসের নিনাদ, মায়াবী হরিণীর আর্তচিৎকার সেখানে কাউকে না কাউকে তো ঘুরে দাঁড়াতে হয়ই। সম্মুখযাত্রার ইঙ্গিত দিয়েই কবিতার পাদপত্র রচনা। চরৈবেতি!!

২০.

রেশন কার্ড

আত্মতন্ময়তার কবিতা 'রেশন কার্ড'। কখনো এ কবিতাই হয়ে ওঠে আত্মবিস্মৃতির– কখনো প্রলাপের। ভাবনার কুণ্ডলি বেরুবার পথ খোঁজে– পায় না সহজে। দারুণ কিছু অনুভবাত্মক তুলনা আছে এ কবিতায়। এ কবিতায় ঘাস যখন ছায়ার শরীর হয়ে ওঠে তখন জীবনানন্দের সুরঞ্জনাকে মনে পড়ে– 'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস'। কিন্তু সুরঞ্জনা পাঠকের মাথা থেকে ত্বরিত মিলিয়ে যায়। কারণ কবির ত্র্যম্বকে তাঁর সম্মুখে দৃশ্যমান হয় মার্জিত বাসাঞ্চল থেকে দেহজীবিনীদের ঘুপচি ঘর অবধি। এখানে এলায়িত প্রণয়-কথন নেই, আছে জীবনের তপ্ততায় অভিজ্ঞতার বারুদ। সত্যি ছায়াই ঘুমায়, জেগে থাকে মানুষ, অতন্দ্র সে!– এর চেয়ে আত্মতন্ময়তা আর কী হতে পারে?

২১.

কান্নাশিল্প

প্রতিবার মিলনের আগে যে নারী হয় অচ্ছেদযোনী তার অধিবাস তো পৃথিবীতে নয়; পৌরাণিক গল্প-সমাচারে জীবন্ত যে অপ্সরা। কিন্তু প্রেমিকমনের কাছে প্রেমিকা কি পুরনো কখনো– প্রতিবারই কি নতুন নয়? নিশ্চয় নতুন। তাই তো কম্পিত হস্তে প্রেমিকা বাড়িয়ে দেয় হাত প্রেমিকের দিকে, প্রেমিক স্বেদের অচ্ছোদনীরে ধুইয়ে দেয় প্রেমিকার গা। তৃপ্তির পুলকে নেয়ে ওঠে তারা। এ চিরন্তন রীতি– কৃষ্ণকাল থেকে একাল অবধি। তাই জোছনা পোহালে কী হয়– জিজ্ঞেস করতে নেই। সঙ্গসুখলিপ্ত-জন জিজ্ঞেস করে বরং: জোছনা তুমি যেও না এ-ত তাড়াতাড়ি, মোটেই পোহাবে না আজ! সে-সূত্রেই বলা যায়, এ কবিতায় কবির অসমাপ্ত প্রশ্নের মানচিত্রটি একটু বেমানান; বাকিটুকু পাঠক-মনোহরী।

শেষ কথা:

কবিতা-পাঠে শেষ কথা বলে কিছু নেই। একই কবিতা: ঘুমোবার আগে পড়লে এক রকম, ঘুম থেকে উঠে পড়লে আরেক রকম– শ্রেণিকক্ষে পাঠ করলে এক রকম, ভ্রমণকালে চোখ বুলালে তা অন্য রকম মনে হয়। তাই 'গোলাঘর' প্রকাশ-পূর্বে এর সম্পাদকের অনুরোধে কবিতা পড়ে সেগুলো সম্পর্কে লেখা যে রকমই হোক, 'গোলাঘর' প্রকাশ হলে সেই কবিতাই ভিন্ন 'পাঠ' নিয়ে প্রতিভাত হতে পারে। তবে এ 'ভিন্ন' পাঠ অবশ্যই 'বিপ্রতীপ' পাঠ হবে না– বিশ্বাস করি।

রাজনীতি/প্রবন্ধ

শেখ বাতেন

.....

বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদ ও মুক্তির সংগ্রাম

বিশ্বায়ন কী? বিশ্বব্যবস্থায় একটি নতুন পর্যায়? সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়? খোলাবাজারে পুঁজির ঐতিহাসিক বিজয়? সমাজতন্ত্রের শেষ মৃত্যুঘণ্টা? নাকি যুদ্ধ ও দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বে প্রতিরোধ সংগ্রামের বিশ্বায়ন? গ্লোবাল প্রেক্ষিতে সাম্যবাদের নবায়ন? না কোনো উৎকৃষ্ট বিকল্পের প্রাথমিক পর্যায়? শব্দটি যারা নিজে বলেন, অন্যের মুখে শোনেন বা পত্রিকায় দেখেন তারা সাধারণত এর ভারিক্কি অর্থ মাথায় রাখেন না। কারণ, এটা দৈনন্দিনভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, গত পনের-বিশ বছর ধরে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, যা আজকাল দুনিয়ার সব বিষয়ে কথা বলে, এর প্রয়োগকে করেছে জনপ্রিয় এবং সেই মাত্রায় সৃষ্টি হয়েছে অস্পষ্টতা।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক টমাস ফ্রিডম্যান বিশ্ব-পুঁজিবাদের সপক্ষে এই শব্দটির ব্যবহার জনপ্রিয় করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। এর ব্যাপকতায় বোধকরি তিনি নিজেও এখন বিস্মিত। যাই হোক, আপনি কি বিশ্বায়নের পক্ষে না

বিপক্ষে? এটা কি ভালো না খারাপ? এ জাতীয় অবস্থান গ্রহণের পূর্বে তলিয়ে দেখতে হয়, আসলে এটা কী বোঝায় এবং কী বোঝায় না?

একটি প্রত্যয় যখন সমাজ ও সভ্যতার অনেক কিছুর ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে উন্নত দেশের রাষ্ট্রীয় পলিসি, অনুন্নত দেশের জীবনসংগ্রাম, রাজনীতি, অর্থনীতি, মিডিয়ার চরিত্র, সাংবাদিকতা, বুদ্ধিচর্চা, সংস্কৃতি ইত্যাদি তখন এর পদ্ধতিমাফিক ব্যাখ্যার দায় পড়ে সমাজবিজ্ঞানীর ওপর। এক্ষেত্রে গত একযুগ ধরে অসংখ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এ নিয়ে বাহাস-বিতর্ক এখনো থামেনি, যদিও মর্মবস্তু অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এখানে বিশ্বায়নকে যথাসম্ভব সহজভাবে বুঝবার চেষ্টা করব, কে কিভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন সেই সূত্র ধরে। তাই, শুরুতেই সাধারণ পাঠকের জন্যে এটা বলা আবশ্যক যে, এ জাতীয় বিষয়ের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান কী অর্থাৎ তিনি কোন চোখে জগতকে দেখেন তা বিবেচনায় রাখা জরুরি। বর্তমান আলোচনায় যে সকল মতাদর্শিক অবস্থান বিবেচনায় আনা হবে তা হল কনজার্ভেটিভ, নিউ-লিবারেল ও র‍্যাডিকেল যাকে বলা যায় রক্ষণশীল, নব্য-উদারপন্থা ও বাম।

Global শব্দটি চারশো বছরের পুরনো। Globalization শব্দটি ১৯৬০ সনের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ শব্দ হিসেবে অভিধানে স্থান পায়নি। আরো পরে এটি একাডেমিক জগতে প্রবেশ করে এবং প্রত্যয় হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রোনাল্ড রবার্টসন ১৯৮৫ সনে তার একটি প্রবন্ধের শিরোনামে প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন। এই প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দেয়া ও অর্থ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা অগ্রণী। তিনি এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন– Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole...both concrete global interdependence and consciousness of the global whole.[১]

compression of the world মানে অনেকটা সেইরকম, যখন আমরা বলি

পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। এই ধারণা নতুন নয়। ব্যবসার সম্পর্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সামরিক আতাঁত, আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদিতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার মাত্রা ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠা বা সম্পর্ক ঘন হয়ে আসা। intensification of the global consciousness বলতে বোঝায়, চেতনায় বিশ্ব-জগতের উপলব্ধি তীব্র হয়ে ওঠা। এই ধারণাটি অপেক্ষাকৃত নতুন। বিশ্বায়নের আর এক বিখ্যাত তাত্ত্বিক গিডেন্স এই দুর্বলতায় গুরুত্বারোপ করে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন– Globalization can...be defined as the intensification of world-wide social relations which link distant

locations in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa.[২]

অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক এমন তীব্র হয়ে ওঠা যার ফলে কোনো স্থানীয় ঘটনার মধ্যে বহুমাইল দূরের ঘটনার ছায়া (প্রভাব) এসে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন ঘটনার একটা অংশ এমন বোধ জোরালো হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সময় ও দূরত্বের (time and space) মাপ কমিয়ে দেয়। ছোট-র মধ্যে বড়-র প্রাসঙ্গিকতা ও সাপেক্ষতা (relativization and reflexivity) তৈরি করে। অর্থাৎ ছোট্ট কোনো মফস্বলে বাস করলেও দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃহৎ বিশ্বের ধারণা ও মূল্যবোধ ক্রমেই সক্রিয় হয়, হতে চায়।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠকদের নিকট আকর্ষণীয় মনে হবে যে, এই বিশ্বায়ন-ধারণা সমাজবিজ্ঞান বিকাশের সময়ে সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তার মধ্যেও উপস্থিত ছিল। যেমন, সেন্ট সাইমন-এর পর্যবেক্ষণে, শিল্পায়নের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতি সমগ্র জগতের সাধারণ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হবে এবং একটি বিশ্ব-সরকার গঠিত হবে। অগাস্ট কোঁতে বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও শিল্পায়ন সমগ্র বিশ্বকে এক জায়গায় নিয়ে আসবে। সেই বিশ্ব সরকারের কেন্দ্রভূমি হবে প্যারিসে। ডুরখাইমের *ডিফারেন্সিয়েশন* তত্ত্বে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও স্থানীয় জীবন-সংস্কৃতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে আন্তঃসামাজিক বাস্তবতা গড়ে উঠবে। অনুরূপভাবে, ম্যাক্স ওয়েবারের যুক্তিশীলতার তত্ত্বে ব্যক্তির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যুক্তিশীলতা বিস্তার করে জগতে বৃহৎ প্রেক্ষিত সৃষ্টি করবে এমন ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বায়নের রোমান্টিক ধারণাকে বাস্তবের মধ্যে স্থাপন করার জন্যে কার্ল মার্কসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিভাবে এর জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপ থেকে গ্লোবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, কিভাবে 'সস্তা পণ্যের গোলা নিক্ষেপ' করে, অনগ্রসর জাতিকে 'সভ্যতার আওতায় আনতে' গিয়ে নিজেদের ধ্যান-ধারণার আদলে জগৎ নির্মাণ করল তার চিত্র দাঁড় করিয়েছেন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। মার্কসীয় তত্ত্বে জাতি-রাষ্ট্র দুর্বল হবার কথা নেই। তবে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া "গ্লোবালাইজড্ ক্যাপিটাল" পর্যায়ে ধারণা পূর্ণাঙ্গতা পাবার আগেই সংগঠিত প্রলেতারীয় প্রচেষ্টায় জাতি-রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে এ তত্ত্ব দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে *ডিপেন্ডেন্সি* ও *ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম* তাত্ত্বিকদের মধ্যে এর তাত্ত্বিক সমর্থন দেয়া হয়েছে। ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম তত্ত্বে বিশ্বকে একটি একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এজন্যে কেউ কেউ ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনকে বিশ্বায়ন তত্ত্বের যথার্থ পূর্বসূরি গণ্য করতে চান। কিন্তু আধুনিক বিশ্বায়নতত্ত্বের সঙ্গে তার চিন্তার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ব-পদ্ধতি (ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম) তত্ত্বে বিশ্বের অস্তিত্ব ভৌগোলিক, অন্যদিকে বিশ্বায়ন তত্ত্বে তা

চেতনাগত (ফেনোমেনোলজিক্যাল)। বিশ্ব-পদ্ধতি তত্ত্বের কাঠামোতে জাতি-রাষ্ট্র একটি মৌলিক প্রত্যয়, অন্যদিকে বিশ্বায়ন তত্ত্বে জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়।[৩]

বিশ্বায়ন ধারণা পূর্বসূরিদের চিন্তায় কিভাবে কতটা উপস্থিত ছিল তা খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করা গেল। বিশ্বায়নের আধুনিক তত্ত্বের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৮৫ সাল থেকে। গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়ন, গোলকায়ন, ভুবনায়ন ইত্যাদি যেসব ধারণা নির্দেশ করে তা হল আশির দশকে কম্পিউটার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বঅর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি, পণ্য, উৎপাদনের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা জ্ঞান এত দ্রুত চলে যেতে পারছে, অতঃপর এত বেশি পরস্পরনির্ভরশীল হয়েছে, বিশ্বে আধুনিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ও বিষয়গুলো এতটা কাছাকাছি চলে এসেছে– বিশ্বঅর্থনীতিক কাঠামোয় এক নতুন পর্যায় সৃষ্টি করেছে। এখন সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে একটি বিশ্ব, যা আগে কখনো এমনভাবে বাস্তব হয়ে উঠেনি। এই

বাস্তবতায় কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্ষমতাকাঠামোয় বিশ্বজনীন পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। যার ফলে জাতিরাষ্ট্র এবং ভৌগোলিক সীমানা কিছুটা তাৎপর্য হারিয়েছে। রাষ্ট্র আগের চেয়ে দুর্বল হয়েছে। একই কারণে, বিশ্বে বসবাসকারী মানুষের রুচি, পছন্দ, চিন্তন প্রক্রিয়া, স্বপ্ন, আবেগ তথা মানুষের জীবনাচরণে অভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা যেখানেই বসবাস করুন পরস্পরকে এমনভাবে সনাক্ত করতে পারেন যেন তারা কোনো একটি গ্রামের অধিবাসী। প্রযুক্তির উদ্ভবের ফলে এই বাস্তবতার উদ্ভব হয়েছে সকলের জন্যে। এটা কারো ইচ্ছাধীন নয়। কেউ এর বাইরে যেতে পারে না।

খুব মোটা দাগে এই হল বিশ্বায়নের তত্ত্বের মূলকথা। যা বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বিভিন্নভাবে সূত্রায়িত করেছেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়, বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া (মালটিডাইমেনশনাল প্রসেস)। অর্থনৈতিকভাবে, এটা বোঝায় বিশ্বঅর্থনীতি বা বিশ্বপুঁজিবাদ একটি নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে; রাজনৈতিকভাবে, জাতি-রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়েছে; সাংস্কৃতিকভাবে, আমরা একটি বিশ্ব-গ্রামে বসবাস করছি। সব মিলিয়ে পৃথিবী এতটা আন্তঃনির্ভরশীল হয়েছে যে আমাদের বোধে ও বাস্তবে পৃথিবী এখন একটি। এটা বোঝাতে প্রবক্তারা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা হল— "New phase of world capitalism" "End of nation-state" "Global Village" "One World for all of us" . "Single World" ইত্যাদি। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিশ্বায়নপন্থী পণ্ডিতদের সবার মত একরেখায় চলেনি। বিশ্বায়নবিরোধীদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। আরো উল্লেখ্য, বিশ্বায়ন ব্যপারে মার্কসবাদীদের তাত্ত্বিক অবস্থানে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ আকর্ষণীয় হতে পারে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক টমাস ফ্রিডম্যান, যিনি বিশেষজ্ঞ না হয়েও বিশ্বায়নের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে বেশ আলোচিত হয়েছেন। এর কারণ অংশত তাঁর খর্বীং and the

Olive Tree গ্রন্থের ভাষাভঙ্গি। এতে তিনি খোলামেলাভাবে বলেছেন, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাবে এক মানবজাতি, মনে-মেজাজে এক মানবাত্মা, সকলের জন্য এক বিশ্ব যা কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই জীবন-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ বা আমেরিকানাইজেশন। বইটিতে অতিশয়োক্তি ও বাড়াবাড়ি ধরনের মন্তব্য রয়েছে। এই তত্ত্বের জোয়ার যখন তুঙ্গে তখন ৯/১১ তারিখে নিউইয়র্ক শহরের কেন্দ্রস্থল ম্যানহাটনের ডাউন-টাউনে অবস্থিত টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাটি ঘটে, সকালের দিকে। পরদিন আত্মঘাতী আক্রমণের নায়কদের ছবি ও বৃত্তান্ত স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাস্তব বিশ্বে এবং বিশ্ব সম্পর্কিত

তত্ত্বচিন্তায় সুদূর প্রভাব সৃষ্টিকারী

এই ঘটনার ওপর পরদিন মন্তব্য ও বিশ্লেষণ আসতে থাকে ওয়েবসাইট ভর্তি হয়ে। সেখানে বিশ্বমানবের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষক ফ্রিডম্যান-এর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলটুইন টাওয়ার আক্রমণকারীদের মনস্তত্ত্বই আমি আসলে বুঝতে পারছি না। এরা সবাই মেধাবী, পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা মানুষ। এই মানসিক কাঠামোতে কিভাবে এ জাতীয় আত্মহত্যায় নিবেদিত হতে পারল?[৪]

এই জটিল সময়ের সরল স্বীকারোক্তি থেকে যে সন্দেহ বের হয়ে আসে তা হল, আমরা কি আসলে এক বিশ্বে বসবাস করি? আমাদের আবেগ, চিন্তা, ন্যায়বিচার বোধের মানসিক কাঠামোতে পৃথিবী কি অভিন্ন? এই ঘটনার পরে টমাস ফ্রিডম্যান বিশ্বায়নের একবিশ্ব তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আর কোনো আলোকপাত করেছেন কিনা জানা যায় না। যাই হোক, উপরোক্ত বিশ্বায়ন তত্ত্বের মধ্যেকার ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে যে বিচার-বিশ্লেষণ আছে, অতঃপর আমরা সেগুলোকে উপস্থাপন করব।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন (Economic globalization)

সমসাময়িক বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে এমন কী গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে যার জন্যে প্রয়োজন হল এর একটি নতুন নাম বিশ্বায়ন? বিশ্বায়ন কি নতুন কিছু? প্রবক্তারা তা-ই দাবি করেন, বিশ্বপুঁজিবাদ এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। পুঁজিবাদের ইতিহাসে বিশ্বায়ন হল চতুর্থ স্তর। ইতিহাসে পুঁজিবাদের উদ্ভবের পর প্রথম স্তর ছিল মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজম যা সামন্তবাদের শেষে ইউরোপে প্রথম বিকশিত হয়েছিল। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অন্য দেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা গ্লোবের অন্যত্র পুঁজির সম্প্রসারণ। এটা পুঁজিবাদের শৈশব। দ্বিতীয় স্তর ছিল শিল্প-পুঁজিবাদ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম) যার সনাক্তকারী ঘটনা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব, জাতিরাষ্ট্রের জন্ম, (আঠার শতকে) ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব। পুঁজিবাদের তৃতীয় স্তর হল ফাইনান্স ক্যাপিটালিজম যা বিশ শতকের শুরু থেকে শুরু। অর্থ লগ্নিকারীদের কয়েকজন মিলে বা জোটবেঁধে পুঁজির ওপর মনোপলি

ও বিভিন্ন কর্পোরেট শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হল পুঁজির প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি যার পরিণতিতে বাধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুগে বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। পুঁজিবাদের চতুর্থ স্তর হল বিশ্বায়ন। এর বৈশিষ্ট্য হল প্রযুক্তি হিসেবে মাইক্রোচিপসের উদ্ভাবন যা দিয়ে নির্মিত হয়েছে কম্পিউটার, বিপ্লব এসেছে তথ্যপ্রবাহে। মানবমস্তিষ্ক পেয়েছে অভূতপূর্ব দ্রুততার ক্ষমতা। রাজনৈতিকভাবে এর বৈশিষ্ট্য হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, বার্লিন দেয়ালের পতন এবং সর্বশেষে নিকারাগুয়ায় সান্ডিনিস্টাদের পরাজয় বিশ্বের মানুষের জন্যে পুঁজিবাদের বিকল্প উপস্থাপনে ব্যর্থতা।[৫]

প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনে নতুন সমাজকাঠামোর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কিভাবে বিশ্বায়নের আগমন ঘটল, কাল মার্কস-এর বরাত দিয়ে সে দাবি পেশ করেছেন শিবানন্দন—If hand mill gives us the society of feudal lord and steam-mill gives us the society with industrial lord then, in line with Marx, microchips gives us the society with global capitalist.[৬]

প্রযুক্তি নতুন সমাজ নির্ধারণ করে না। সমাজও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নির্ধারণ করে না। এগুলো অনেক ফ্যাক্টরের মিথষ্ক্রিয়ার ফলাফল। ম্যানুয়েল ক্যাসেল কিছুটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেও সিদ্ধান্তে অভিন্ন। অর্থাৎ পুঁজিবাদ আগের স্তরে নেই, আগের সঙ্গে মিল নেই। এবং এই পরিবর্তন গুণগত। পুঁজির বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও ও বিচরণ সমগ্র গ্লোব। এটা একটা নতুন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা। যার নাম তিনি দিয়েছেন Informational Mode of Production এবং এর ওপর যে নতুন সমাজ নির্মিত হয়েছে তাকে বলেছেন নেটওয়ার্ক সোসাইটি।[৭]

উপরোক্ত বিশ্বায়নপন্থীরা ফ্রিডম্যানের মতো সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক নয়। যদিও বিশ্বায়নবিরোধীদের একটা বড় অংশ হল মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল পণ্ডিতেরা। এক্ষেত্রে যার নাম অগ্রণী তিনি পল সুইজি, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত মার্কসবাদী পত্রিকা *মান্থলি রিভিউ*-এর সম্পাদক। তার বক্তব্য হল, পুঁজিবাদ কোনো নতুন স্তরে প্রবেশ করেনি। পুঁজিবাদ এখনো পুঁজিবাদই আছে। এর কাঠামোতে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। প্রযুক্তির কারণে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে, অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বায়নের নামে যা বলা হচ্ছে তাতে রয়েছে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি। বিশ্বায়ন কোনো প্রপঞ্চ নয়। এটা পুঁজিবাদের বাস্তব প্রক্রিয়া। একে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ফেলে বিশ্লেষণ করুন, দেখবেন পুঁজিবাদ জন্ম থেকেই ছিল বিশ্বজনীন। জন্মের পর চার/পাঁচশ বছর ধরে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলছে। শুরু থেকেই এটা কোনো জাতীয় সীমারেখার ভেতরে পরিভ্রমণ করেনি। সুতরাং আজকে একে নতুন নামে ডাকতে হবে কেন? নতুন নামের আড়ালে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা সাম্রাজ্যবাদের বহুদিনের বদনাম ঘোচাতে চায়। যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি তা একবিশ্ব নয়। বিশ্ব দুইটি– ধনী ও দরিদ্রের, শোষক ও

বঞ্চিতের। এই সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরাবার জন্যে, অনুন্নত রাষ্ট্রের ওপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের আধিপত্যের জন্যে, গুটিকতক বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা বিশ্বের অধিকাংশের সম্পদ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে এবং যুদ্ধের নামে কম্পিউটার চালিত অস্ত্র দিয়ে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে হত্যা ও বর্বরতাকে আড়াল করার জন্যে বিশ্বায়নের প্রত্যয় ব্যবহার করা হচ্ছে। আপাতভাবে নির্দোষ মনে হলেও বিশ্বায়ন তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে সম্প্রতিকালের পুঁজিবাদ যে একটা ভালো জিনিস এরকম ধারণা তৈরি করার মতাদর্শগত অপচেষ্টা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশ্চিমা পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ চালিয়ে যাওয়া যা এক সময়ে আধুনিকায়ন তত্ত্বের নামে চালানো হয়েছিল।[৮]

বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের ধারকদের একটা মতাদর্শগত অপচেষ্টা, এর বেশি কিছু নয় এই ধারণা বাস্তবসম্মত ও সমর্থনযোগ্য নয় এমন মনে করেন কতিপয় বিশ্বায়নপন্থী। এরা বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ, অন্যদেশে পুঁজি বিনিয়োগ (এফডিআই), গ্লোবাল শ্রম বিভাগ, আন্তর্জাতিক সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ইত্যাদির বরাত দিয়ে বলেন যে, এই পরিবর্তন যুগান্তকারী। যদিও এই প্রবক্তাদের মধ্যে নব্যউদারবাদী থেকে শুরু করে উত্তর-আধুনিক বামপন্থী পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তার লোক রয়েছেন এবং এরা এক-এক বিষয়কে এক-এক ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বক্তব্যের স্বপক্ষে পরিসংখ্যানের উপস্থাপন করে এরা বলেন, ১৯৫০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বিশ্বে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ গুণ। ১৯৯৪ সনে নেয়া হিসাবে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ ৮.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ২,৮০,০০০ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান পণ্যে ও সেবায় যে উৎপাদন/সার্ভিস প্রদান করেছে তার মূল্য ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। তাদের বক্তব্য, এফডিআই-কে ধনী দেশের জাতীয় পুঁজির নিছক আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ মনে করলে ভুল করা হবে। ১৯৯৬ সনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অন্যদেশে এফডিআই হয়েছে ৮৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (গ্লোবাল এফডিআই-এর এক-চতুর্থাংশেরও কম); এবং অন্যদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এফডিআই হয়েছে ৮৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কানাডা, জার্মান ও জাপানভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি অনেক মার্কিন কোম্পানি কিনে নিয়েছে কিংবা সম্পদ কিনে সংযুক্তি ঘটিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে, ১৯৮০ সনে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবার পর, ১২ বছরে এফডিআই বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ গুণ; এর অধিকাংশ গিয়েছে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে। এভাবে অনুন্নত দেশে বুর্জোয়ারা গ্লোবাল পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে। What is happening here is a process of transnational class formation, including the emergence of transnational bourgeoisie out of national bourgeoisie as national circuit of accumulation become integrated at the global level.[৯]

মান্থলি রিভিউ পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিন্ডা ওয়িজ দেখিয়েছেন, এসব উপস্থাপিত এফডিআই পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিকর। এসব বিদেশি বিনিয়োগের সিংহভাগ হল

অনুৎপাদনশীল খাতেরিয়েল এস্টেট ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা, খেলার মাঠ, ইন্সুরেন্স, বিভিন্ন অর্থলগ্নি কার্যক্রম ও ফটকাবাজারিতে। যেমন, ১৯৯৫ সনে দক্ষিণ এশিয়ায় এফডিআই-এর দুই-তৃতীয়াংশ (৬৩.৩ %) অনুৎপাদনশীল খাতে। জাপানি বিনিয়োগ ছাড়া বাকি সব বৈদেশিক বিনিয়োগের এই দশা। সস্তা শ্রম, কাঁচামাল ও আয়কর সুবিধা ইত্যাদি কারণে ঐতিহাসিকভাবে পুঁজি বিনিয়োগ হবার কথা অনুন্নত দেশগুলোতে, অথচ হচ্ছে ধনী দেশগুলোতে। ১৯৯১ সন পর্যন্ত এফডিআই-এর শতকরা ৮১ ভাগ স্টক ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও কানাডায়। তন্মধ্যে প্রথম দুটি রাষ্ট্রের এফডিআই স্টক এশিয়াসহ দক্ষিণের সকল দেশের স্টকের চেয়েও বেশি। গ্লোবাল কিছু এলাকায় কোনো কোনো দেশের ও ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক ব্যবসা-বিনিয়োগ সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান, যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, চীন-আশিয়ান-জাপান, ইউরোপের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে, এশিয়ার দেশগুলোর নিজেদের ভেতর। এলাকা ভিত্তিক গড়ে-ওঠা এসব সম্পর্ককে বলা যেতে পারে রিজিওনালাইজেশন, একে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের লক্ষণ গণ্য করা ঠিক না।[১০]

কোনো তত্ত্ব এবং এর মধ্যে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এটা বাস্তবতাকে কতটা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তার ওপর। এই বিবেচনা থেকে অধ্যাপক জেমস্ পেট্রাস বলেন, বিদ্যমান বিশ্বঅর্থনীতির ব্যাখ্যা করতে বিশ্বায়ন তত্ত্ব যথেষ্ট দুর্বল, তারচেয়ে বরং সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয়টি অনেক বেশি বিশ্লেষণ-মূল্য ধারণ করে। তিনি একটি তুলনামূলক আলোচনায় তা দেখিয়েছেন: প্রথমত, বিশ্বায়ন প্রত্যয় মতে বিশ্বের জাতিসমূহ স্বার্থ, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার দিক থেকে আন্তঃনির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয়টি বলে, সাম্রাজ্যবাদী উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে অনুন্নত দেশ ও বিশ্বের দরিদ্র মানুষের সম্পর্কটা আসলে আধিপত্যের। ব্যবসা, কাঁচামাল, অন্যের বাজার দখল ইত্যাদি দিক থেকে স্পষ্টত সাম্প্রতিক বিশ্বে সম্পর্কটা একমাত্রিক। উন্নত পুঁজির রাষ্ট্রের স্বার্থেই এটা নির্ধারিত হয়। অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা (আইএফআই)-এর নিকট কার্যত বন্দি হয়ে আছে। দুর্বলেরা সহযোগিতা করতে বাধ্য। আধিপত্যমূলক সম্পর্কের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সামরিক নীতি ও সামরিক ইন্টেলিজেন্স। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে কাজ করছে। কিন্ত অনুরূপ অনুন্নত রাষ্ট্রকে মার্কিন রাষ্ট্র কি তাদের সামরিক তথ্য-প্রযুক্তি শেয়ার করতে দেয়? তাহলে আন্তঃনির্ভরশীল কিভাবে হল? দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন তত্ত্ব অনুসারে কম্পিউটার তথ্য-প্রযুক্তি বিশ্বঅর্থনীতিকে চালিত করে বাজারের নিজস্ব নিয়মে। সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয় অনুসারে প্রযুক্তির নিজস্ব নিয়ম বা সত্তা নেই, শ্রেণী ও রাষ্ট্র এটাকে যেভাবে চালায় সেভাবে চলে। পুঁজি, প্রযুক্তি ও পণ্য বিশ্বের কোথায় যাবে না যাবে সেটা ঠিক করে দেয় বহুজাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা। অর্থাৎ সে-সব সংস্থার পরিচালনায় যারা থাকে সেই শ্রেণী। তৃতীয়ত, বিশ্বায়ন

তত্ত্ব বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্যে অভূতপূর্ব সম্পদের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই কথা বলে। এটা অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার ব্যাপারে কথা বলে না। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যয় পুঁজিবাদের বৈষম্য বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেয়। শ্রেণী পর্যায়ে, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য-পরিসংখ্যান প্রদান করে বলে দেয় কোথায় শোষণ হচ্ছে কতটা হচ্ছে। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক মুনাফা, আয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি কতটা আন্তঃনির্ভরশীল আর কতটা একমুখী স্বার্থের দ্বারা তাড়িত সেই রূঢ় বাস্তবতা উন্মোচিত করে, ব্যাখ্যা করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্লেষণ-কাঠামো। এ তুলনামূলক আলোচনা নির্দেশ করে যে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয়টি বিশ্বায়ন প্রত্যয়ের চেয়ে বিদ্যমান বাস্তবতাকে অধিকতর পারঙ্গমতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে।[১১]

রাষ্ট্র ও সামাজিক শ্রেণীর বিশ্বায়নরাজনৈতিক বিশ্বায়ন

যারা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন অর্থাৎ বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশ্বায়ন ঘটেছে বলে মনে করেন তারা সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক বিশ্বায়ন বা পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন-এর কথা বলেন, কারণ দু'টি প্রত্যয় পরস্পর সম্পর্কিত। বিশ্বায়ন প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও কার্যাবলি ক্রমেই কতিপয় অধিরাষ্ট্রীয় সংস্থা (Supranational Organizatoin)-র হাতে চলে যাচ্ছে। কারণ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন জাতীয় ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে সীমায়িত থাকছে না, তেমনি জাতীয় সরকার ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড (প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) আগের মতো আনুষ্ঠানিক সীমারেখার ভেতরে অনুধাবন করা যাবে না। এর ওপর (অর্থনৈতিক) বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে। কারণ, বিশ্বায়ন একটি সার্বিক প্রক্রিয়া (holistic process)।[১২]

ডেভিড হেল্ড দেখিয়েছেন, এসব বহুজাতিক সংস্থা অনেক রাষ্ট্রের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। এসব সংস্থাগুলো আকারে এবং প্রকারে দুদিক থেকেই বাড়ছে। যেমন জাতিসংঘ, ডব্লিউটিও, আইএমএফ, ন্যাটো, ওপেক, এপেক, ইইউ, আসিয়ান ইত্যাদি। রাষ্ট্রকে এসব সংস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে হয়। এবং স্বীয় সার্বভৌমত্বের কিছুটা এদের অনুকূলে ছেড়ে দিতে হয়। এসব সংস্থা অনেক আগে থেকেই উদ্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এরা আমাদের চেতনায় বাস্তব হয়ে উঠেছে। এরাই ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের ভিত্তি তৈরি করছে যা এখনই দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তার বাস্তব সম্ভাবনা ধারণ করছে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নপন্থীরা প্রায়শ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উদাহরণ দিয়ে থাকেন এবং বলেন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় অনুরূপ সংস্থার ভ্রূণ পর্যায় লক্ষ করা যাচ্ছে।[১৩]

বিপরীত দিকে, র‍্যাডিকেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদের এই পর্যায়ে রাষ্ট্র ধারণা নয় বরং অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বিশ্বায়ন বলে যদি কিছু থাকে সেটাও

রাষ্ট্র ও সামাজিক শ্রেণীর ফাংশন বা ফলশ্রুতি। বহুজাতিক সংস্থাকে আন্তর্জাতিক শোষণ চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক সরবরাহ যোগান দিচ্ছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। জাতীয় কিংবা বহুজাতিক পুঁজি বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে জাতি-রাষ্ট্রের পাইপলাইন দিয়ে। আর অনুন্নত বিশ্বে রাষ্ট্র বরাবর দুর্বল ছিল, শ্রমিক নির্যাতন ও অন্যান্য রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, সেখানেও রাষ্ট্রও শক্তিশালী ভূমিকা নিচ্ছে। সুতরাং দুর্বল রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে এটাই বাস্তবতা। জাতি-রাষ্ট্রের এই ক্ষীণ বা দুর্বল হবার তত্ত্ব হল নিউ-লিবারেল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণীত মতাদর্শ। তাতে দারিদ্র্য ও বেকারত্বসহ অনেক জনপ্রিয় দাবিকে পাশ কাটাতে সরকারগুলোর সুবিধা হয়, জনগণকে বোঝাতে সহজ হয় যেআমরা চাচ্ছি কিন্তু পারছি না, বিশ্ববাজার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেই, ইত্যাদি।[১৪]

নব্য বামপন্থীদের একটি দল বিশ্বায়নের পক্ষে যদিও তাদের শব্দপ্রয়োগ (জারগন) ও ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত সামাজিক শক্তির প্রভাবে সামাজিক শ্রেণী আর জাতি-রাষ্ট্রের ভেতরে সীমায়িত নেই। শ্রেণীর একটি বহুজাতিক কাঠামো (Transnation Social Classes) গড়ে উঠেছে। পুঁজির জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ে এই বিশ্বশ্রেণী-কাঠামো (World Class Structure) ছিল এরকম: প্রথম বিশ্বে একটি কেন্দ্রীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও অন্যান্য অধস্তন শ্রেণী নিয়ে গঠিত যারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমায়িত ছিল; দ্বিতীয় বিশ্বে, ১৯৭০ পর্যন্ত, একটি শ্রেণী যারা বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাইরে ছিল; তৃতীয় বিশ্বে, উপনিবেশের অবসানের পর বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্গে আবদ্ধ বহুস্তর বিশিষ্ট শ্রেণী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই বিশ্বশ্রেণী কাঠামোটি যে অবয়বে দেখা যায় তা হল : প্রথম বিশ্বে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রবক্তা একটি শ্রেণী; দ্বিতীয় বিশ্বে পুঁজিবাদের বিকল্প নির্মাণে সক্রিয় একটি শ্রেণী ; তৃতীয় বিশ্বে সকল শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি শ্রেণী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে উৎপাদন আন্তর্জাতিক হতে থাকে, বহুজাতিক সংস্থা গড়ে উঠে এবং সেই সঙ্গে উদ্ভব হতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি আন্ত র্জাতিক শ্রেণী যারা বিশ্বপুঁজিবাদের ব্যবস্থাকে ধারণ করছিল। বর্তমান বিশ্বায়নের পর্যায়ে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীটি স্থানীয়ভাবে উদীয়মান আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর দেহের মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে– যেখানে যেই মাত্রায় স্থানীয় উৎপাদন আন্তর্জাতিক উৎপাদনের মধ্যে প্রবেশ করেছে সেখানে সেই মাত্রায়। স্থানীয় ও বৈশ্বিক পুঞ্জীভবনে (একুমুলেশন) স্বার্থের অভিন্নতার কারণে আগের মতো জাতীয় পুঁজিপতিদের বৈরিতা যুদ্ধের দিকে গড়ায় না।

[The] determining feature of contemporary capitalism is that the whole set of nation-state institutions is becoming superseded by transnational institutions. The transnational bourgeoisie exercise its class power through a dense network of supranational institutions and relationships that increasingly bypass formal states, and that these

transnational state or entity should be conceived as emerging and has not yet acquired any centralized institutional form.[১৫]

নব্য-বামদের বিশ্বায়ন ব্যাখ্যার বিরোধিতায় বামপন্থীরা বলেন, সঞ্চয়ের শক্তিশালী এজেন্ট এখনও জাতি-রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। এই কাজে রাষ্ট্র ও বহুজাতিক সংস্থা হাত ধরাধরি করে কাজ করে থাকে। এমন দৃষ্টান্ত নেই যে, বহুজাতিক সংস্থা এর জনক জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।[১৬] যেসব 'স্বঘোষিত বামপন্থীরা' নতুন চিন্তার জনকের মতো *থার্ড ইকোনমির* কথা বলেন তারা বিশ্বঅর্থনীতিতে পুঁজি, পণ্য ও প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রবাহের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বুঝতে পারেন না। এরা প্রযুক্তিকে রাষ্ট্র ও সামাজিক শ্রেণীর উপরে (Placing technology over the state and social Class) স্থান দিয়ে বিশ্লেষণ করেন বলে এইরকম ভুল সিদ্ধান্তে চলে আসেন। রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ধারণা জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে।

It is impossible to understand the current phase of capitalism without understanding the decisive role of the state and its relation with MNCs and other transnational organizations. Powerlessness of the nation-state, in the thesis of political globalization, has ideological contents to disorient struggle from the national scenario.[১৭]

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন গ্লোবাল ভিলেজ না গ্লোবাল পিলেজ

প্রবক্তারা যেহেতু বিশ্বায়নকে একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেন তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মতো সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংগ গণ্য করেন। এক্ষেত্রে বহুল আলোচিত ম্যাকলুহান ও তার গ্লোবাল ভিলেজ তত্ত্ব। ম্যাকলুহানের ধারণা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় এর উপাদানের দ্বারা নয়, যে গণমাধ্যমে এটা সম্প্রচারিত হয় তার দ্বারা। গণমাধ্যম বলতে বোঝায় স্থানান্তরে পরিবহনের ও যোগাযোগের এমন প্রযুক্তি ব্যবস্থা যা মানবইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতকে সম্প্রসারিত করে। অন্য কথায়, যেমন গিডেন্স বলেছেন, এমন ব্যবস্থা যা সময় ও দূরত্বের বোধকে কমিয়ে দেয় (টাইম-স্পেস কমপ্রেশন)। ম্যাকলুহানের বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ও স্তরবিন্যাসের ধারণার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুরখাইমের বহুল আলোচিত ম্যাকানিক্যাল সলিডারিটি ও অর্গানিক সলিডারিটি ধারণার সঙ্গে মিল আছে। প্রথম স্তরটি হল Tribal Epoch বা আদিবাসী মানবের যুগ যেখানে মূলত মুখের ভাষা ও চলাচলের চাকাই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। এতে মানব-অভিজ্ঞতা ছিল আবশ্যিকভাবে তাৎক্ষণিক ও সমবেত। দ্বিতীয় স্তর হল Industrial Epoch বা শিল্পযুগ মুদ্রণযন্ত্র, কাগজ, রাস্তা ও টাকার ব্যবহার ইত্যাদি যোগাযোগের প্রযুক্তির উদ্ভাবন। যার মাধ্যমে দূরের জনপদের সঙ্গে যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি হয়েছে এবং চেতনা বা উপলব্ধির মধ্যে স্থানীয়তা কিছুটা কমে গিয়ে দূরের সঙ্গে নৈকট্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বায়নের যুগে চেতনায় দূরের সঙ্গে নিকটের এই সম্পর্ক

সমগ্র বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। এর কারণ হল কম্পিউটার প্রযুক্তির নজিরবিহীন দ্রুততা। এর ফলে, যোগাযোগ ও স্থানান্তরের একটি কাঠামো তৈরি হয়েছে যাতে মানব-অভিজ্ঞতার অনেকগুলো দিক এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। স্পর্শ, গন্ধ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় যা কিছু দূরের তা হয়ে উঠেছে তাৎক্ষণিক, যুগপৎ এবং সবার জন্যে। এভাবে মানবচেতনায় শিল্পযুগের পৃথিবীর বদলে এসেছে এক নতুন পৃথিবী। ম্যাকলুহান যার নাম দিয়েছেন গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম। একটি আদিবাসী সমাজের মানুষ যেমন পরস্পরের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতন, সর্বদাই একে অন্যকে বিবেচনার মধ্যে রাখেন যা এড়ানো যায় না, তেমনিভাবে বিশ্বের সকল মানুষ একটি গ্রামের মধ্যে থাকে, গ্রামবাসীর মতো। তারা পরস্পরের চেতনায় উপস্থিতি এড়াতে পারেন না। যদিও একটি আদিবাসী গ্রাম আর পৃথিবীর মধ্যে স্থানীয় দূরত্বের ব্যাপকতায় অনেক ফারাক। কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে সে ফারাক ঘুচিয়ে দিয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। সংক্ষেপে ও সহজে এটাই গ্লোবাল ভিলেজ তত্ত্বের সারকথা।[১৮]

এটা আরও পরিশীলিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন রবার্টসন—Thus, the emerging reflexivity or self-conscious intentionality is a holistic process that raise global consciousness and increases the probability that the world will be reproduced as a single system.[১৯]

এভাবে বিশ্বায়নের চেতনায় বিশ্ব হয়ে গেছে একমাত্র বিশ্ব এবং জীবন হয়ে গেছে একটি বিশ্বায়িত পদ্ধতি। সাংস্কৃতিকভাবে, এই পদ্ধতি কি সমরূপতা (হোমোজেনাস) বিশিষ্ট? এমন কথা বলেননি রবার্টসন। অন্যদিকে এর ওপরই জোর দিয়েছেন ফ্রিডম্যান, বিশ্বায়নের সংস্কৃতির মধ্যে থাকবে সমরূপতার ঝোঁক। তার মতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন, পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে, কার্যত মার্কিন সংস্কৃতির গ্লোবাল সম্প্রসারণ বা আমেরিকানাইজেশন।[২০]

মার্কসীয় বিশ্লেষকদের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন তত্ত্বে নিয়ে সরাসরি সমালোচনা নেই। এর কারণ সংস্কৃতি বা কালচারকে মার্কসীয় তত্ত্বে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। এটা মার্কসবাদের কোনো মৌল প্রত্যয়ও নয়। মৌল প্রত্যয় হল মতাদর্শ (ইডিওলজি), যা এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। আমেরিকানাইজেশন, ওয়েস্টার্নাইজেশন যাই বলা হোক, মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের বিবেচনায়, এটা আসলে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অন্য নাম। সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে এর মতাদর্শের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এর বিশ্বদৃষ্টি। যাতে রুচি, ফ্যাশন, ভোগ করার নানা উপাদান ও আচরণ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মানুষের নিকট তুলে ধরে। এই কাজ আগে করা হত বেতার, টেলিভিশন, বার্তা সংস্থা এসবের মাধ্যমে। আর গত শতকের আশির দশক থেকে একটা দ্রুত গতি পেয়েছে ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের দ্বারা। কম্পিউটারচালিত গণমাধ্যম পৃথিবীর সাতটি বড় বড় সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এগুলো হল ডিজনি, এওএল-টাইম ওয়ারনার, সনি, নিউ কর্পোরেশন, ভিয়াকম,

ভিবেন্ডি ও বারটেলস্ম্যান। এরা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বের তাবৎ ফিল্ম স্টুডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। বৃহদায়তন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো, যেমন সিএনএন, রাজনীতি ও জীবন-জগত নিয়ে নিজস্ব আদলে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর। অনেকটা নিয়মিত প্রার্থনার মতো। সন্দেহ নেই, এর ফলে এদের চিন্তা, রুচি, পোশাক ও ক্যারিয়ারের ধারণা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর দ্বারা সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। এই সকল সেবা ও বিনোদন মূলত ধনী দেশগুলোর জন্যে এবং দরিদ্র দেশের ধনী অংশের জন্যে যারা রাজধানী ও বড় বড় শহরের বাসিন্দা। এটা এইভাবে বিশ্বমানবকে ব্যাপক সম্পর্কে আবদ্ধ করছে আবার একই সঙ্গে ব্যাপক অংশকে সম্পর্কচ্যুতও করছে। [২১]

গ্লোবাল ভিলেজ তত্ত্ব বলে না কিভাবে পিলেজ বা লুণ্ঠন হয়, তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে কীভাবে অনুন্নত দেশ থেকে ধনী দেশে, সাধারণ মানুষ থেকে বৃহৎ কর্পোরেশনের নিকট সম্পদ পাচার হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সূত্রায়ন যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণও নয়। প্রবক্তাদের নিজেদের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। বিশ্বগ্রাম ধারণার বড় অংশই কল্পনাশ্রয়ী। জগৎ-বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হয় না। উপরের আলোচনা এই সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে যে, বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ পুঁজির ও মুনাফার বিশ্বব্যাপী বিস্ত ারকে বাদ দিয়ে বুঝা যাবে না। তথ্য-প্রযুক্তি, বিশ্ব গণমাধ্যম ও বিশ্ব-সংস্কৃতিকে নব্যউদারবাদ, বাজার ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে ব্যাখ্যা করলে সত্যের বড় অংশটাই ঢাকা পড়ে থাকবে।

বিশ্বায়নের সংকট ও মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বায়ন

'প্রতিদিন সূর্য ওঠে। আমাদের ভালোর জন্যই ওঠে। আমি না চাইলেও উঠবে। আমার এতে কিছুই করার নেই। আমি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু করিনি। আমি চাইলেও সেটা থামাতে পারি না।' বিশ্বায়নের মঙ্গলময়তা ও অনিবার্যতা সম্পর্কে এরকম কাব্যিক বয়ান ব্যবহার করেছেন এর বহুল আলোচিত প্রবক্তা টমাস ফ্রিডম্যান। তার দৃষ্টিতে, কম্পিউটার প্রযুক্তির বিপ্লবে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে বিশ্বঅর্থনীতিতে ও জীবনে। পুঁজি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে গেছে নতুন নতুন এলাকায়, গ্লোবের সুদূর প্রান্তের দেশে, কোণাকাঞ্চিতে। যেখানে কাজ নেই, যেখানে শ্রম সস্তা। এইসব এলাকাকে আবার সংযুক্ত করছে নিউ ইয়র্ক, হংকং, টোকিও, লন্ডন এইসব উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে। এভাবে পৃথিবীর প্রান্তিক ও দরিদ্র কোটি কোটি মানুষের নিকট খুলে গেছে কর্মের সুযোগ ও দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা। সুতরাং সমাজতন্ত্র বা সে জাতীয় কোনো বিকল্পের জন্যে সংগ্রাম হয়ে পড়েছে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন। ধনী ও দরিদ্র এখন একইভাবে পৃথিবীর সম্পদ ভাগ করে নিতে পারবে, এ সুযোগ গ্রহণ না করলে পস্তাতে হবে। কারণ এটাই বাস্তবতা। পুঁজিবাদ ইতিহাসের প্রতিযোগিতায় টিকে গেছে। এর কোনো বিকল্প নেই। দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টিনা (TINA)

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখিয়েছি, প্রযুক্তি পরিবর্তন এনেছে সত্য তবে বিশ্বায়ন তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদকে মানুষের জন্যে মঙ্গলদায়ক বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপনের মতাদর্শগত প্রচেষ্টা। বিশ্বায়ন ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এর নিজস্ব দ্বন্দ্ব রয়েছে। বাস্তবতা বলে, বিশ্বের যেখানে পুঁজি প্রবেশ করেছে সেখানেই সঙ্গে নিয়ে গেছে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও পরিবেশ দূষণ। ইউএনডিপি হিসেব দেয়, ২০ শতকের শেষের দিকে পাঁচটি সবচেয়ে ধনী দেশের সঙ্গে পাঁচটি দরিদ্র দেশের মানুষের আয়-বৈষম্য ১৯৬০ সনে ছিল ৩০ গুণ। ১৯৯০ সনে ৬০ গুণ এবং ১৯৯৭ সনে তা হয়েছে ৭৪ গুণ। ঐতিহাসিকভাবে, যে সময়টায় পুঁজির দ্রুত গ্লোবাল সম্প্রসারণ হয়, সেসময় বৈষম্যও তীব্রতর হয়। সম্পদ-স্ফীতি বা পোলারাইজেশনের মাপ নিলে দেখা যায় ১৯৯৮ সনের এক হিসাবে বিশ্বের ৩ জন বিলিয়নিয়ারের সম্পদ বিশ্বের সবগুলো অনুন্নত দেশের জিএনপি ও সেখানকার ছয়শ' কোটি মানুষের সম্পদের যোগফলের চেয়েও বেশি।[২২]

উন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরের চিত্র কী? বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ওভারসিজ ব্যয় মেটাতে গিয়ে রাষ্ট্রের ভেতরে সাধারণ মানুষের জীবনমান নেমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ মিলিয়ন লোকের স্বাস্থ্যসেবা নেবার ক্ষমতা নেই, থাকলেও অপর্যাপ্ত। খণ্ডকালীন কাজ, কাজের অনিশ্চয়তা বাড়ছে। ফলে নিম্নতম মজুরির চেয়েও কমে কাজ করছে মানুষ, উপবাসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। অনাথ আশ্রমে শিশুর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে দারিদ্র্যকবলিত শিশু সংখ্যা। সাধারণভাবে বাড়ছে বেকারত্ব। কিন্তু এর বিপরীতে বড় বড় মার্কিন কোম্পানি যেমন মাইক্রোসফট, গোল্টম্যান স্যাক-এর মুনাফা ও সম্পদের বার্ষিক বৃদ্ধির অঙ্ক কী রকম আকাশ ছুঁয়ে যায়, তা কারো অগোচর নয়। অতএব, বিশ্বায়নের গোলাপি চিত্র মানবজাতির সবার জন্যে নয়। ফটকাবাজারি, বিনিয়োগকারী ও দালালদের জন্য। যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইডেন, জার্মানি ও ইউরোপে অন্যান্য ধনী দেশের অভ্যন্তরে অন্ধকার বৈষম্যের অনুরূপ চিত্র পরিসংখ্যানে অঙ্কে ধরা পড়ে।[২৩] অনুন্নত বিশ্বের চিত্র কী? বিশ্বায়ন শুরু হবার পর, ৯০ দশকের শুরুতে অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ১৫টি দেশে, যার মধ্যে আর্জেন্টিনা ও ভেনিজুয়েলার মতো অগ্রসর দেশ রয়েছে, মানুষের আয় নেমে গেছে। অন্যান্য দরিদ্র দেশের সামগ্রিক চিত্র হল, এক দরজা দিয়ে পুঁজি প্রবেশ করে আর অন্য দরজা দিয়ে বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অপরাধ। বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষের কাছে বিশ্বায়নের দাবিকৃত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পৌঁছায়নি। ডেভিড কর্টন, এক সময়ের বিশ্বায়ন সমর্থক অবস্থাদৃষ্টে পরবর্তীতে বিশ্বায়নের সমালোচক, এই মন্তব্য করেন যে, পুঁজিবাদ বিশ্বে যতটা সফল হয় ততটাই ব্যর্থ হই আমরা বৈষম্যের যাঁতাকলে।[২৪]

গ্লোবাল পুঁজির সম্প্রসারণের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে পরিবেশ ধ্বংসকরণ ও জীবনবিপন্নকরণ প্রক্রিয়া এ ব্যাপারে আজ আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। অনুন্নত বিশ্বের ভূমিক্ষয়, ভূমির উর্বরতা নষ্ট, পানির স্তর নেমে যাওয়া, পানিতে

আর্সেনিক ও অন্যান্য রাসায়নিক, খরা বেড়ে যাওয়া, বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, বন্যার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বেড়ে যাওয়া এসব দুর্গতি নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ায় বহুজাতিক তেল কোম্পানি শেল কিভাবে তেল উত্তোলন প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে হাজার হাজার একর চাষাবাদের জমিকে স্থায়ীভাবে নিষ্ফলা করেছে, ব্যাপক জলাশয় রাসায়নিকে দূষিত করেছে এবং ব্যাপক জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলনে নামার পর কিভাবে পরিবেশ আন্দোলন-কর্মীকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সারা পৃথিবীতে তা আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ডকুমেন্ট রয়েছে।[২৫]

পুঁজি অনুপ্রবেশের সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল হল বন উজাড়করণ (ডিফরেস্টেশন)। উন্নয়নের নামে, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার প্রকল্পের ব্যানারে দক্ষিণ এশিয়ার ও অন্যত্র বনভূমি সাবাড় করা হয়েছে। একটা দেশ শেষ হলে এরা নতুন ভার্জিন এলাকার সন্ধানে গ্লোবের আরও ভেতরে ঢোকে– এভাবে নিউগিনি, বার্মা, লাওস কিংবা বাংলাদেশ। খবর পাওয়া যায়, মিৎসুবিশি ও ওয়ের হাউজার কোম্পানির তৎপরতা সাইবেরিয়ার গভীর জঙ্গল পর্যন্ত ইতোমধ্যে ঢুকে গেছে। দুর্গমতার জন্যে পৃথিবীর এই এলাকাটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল।[২৬]

এই বহুজাতিক কোম্পানি শেল-এর যথেষ্ট বদনাম থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একে কাজ করতে আনা হয়েছিল। এর পর অক্সিডেন্টাল কোম্পানি সিলেটের মাগুরছড়ায় গ্যাস উত্তোলনের কাজ পায়। সেখানে ১৯৯৭ সালের ১৫ মে গ্যাস-দুর্ঘটনার দাবানলে (ব্লো-আউট) যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাসসহ ওই এলাকার বিস্তৃত বনাঞ্চল, কৃষিজমি ও জনবসতির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় এরা আরেক কোম্পানি ইউনোকলকে দায়িত্ব দিয়ে চলে যায়। ইউনোকলেরও অন্যদেশে কাজ করার সুনাম নেই। এরপর ২০০৫ সালের জানুয়ারি ও জুন মাসে আর এক বহুজাতিক কোম্পানি নাইকো-র দায়িত্বহীনতায় ছাতকের টেংরাটিলায় দুই বার করে গ্যাস-বিস্ফোরণে পরিবেশের ও প্রতিবেশের যে ক্ষতি করেছে তার ছাপ আছে এখনো। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে চরিত্র তা দিয়ে এইসব মুনাফাবাজ বহুজাতিক সংস্থার লাগাম ধরা কার্যত সম্ভব হয় না। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট দিনাজপুর জেলায় ফুলবাড়িতে বহুজাতিক সংস্থা এশিয়া এনার্জি-র কয়লা উত্তোলন প্রকল্পে বসতি ও পরিবেশ ধংসের আশংকা দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষ ও আদিবাসীদের ব্যাপক প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। তাতে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে বটে। তবে এর জন্যে ফুলবাড়ির ৫ জনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং গুলিতে আহত হয়েছিল ২০ জন। এসব স্থানীয় পর্যায়ের চেয়েও বিপদজনক পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। একদিকে হিমালয়, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানের এই বদ্বীপ, যা আবহমান কাল থেকে পছন্দনীয় জনবসতি হিসাবে বিবেচিত ছিল, তা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কু-প্রভাবে বিপন্ন পরিবেশের শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক আলোচনায় উঠে এসেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ক্রমে ক্রমে

স্থলভাগ তলিয়ে যাওয়া, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকা ঝড়-ঝঞ্ঝার তীব্রতায় বসতির অযোগ্য হয়ে পড়া, নদীর নাব্যতা ও জলজ সম্পদ হ্রাস পাওয়া, আবহমান গতিপথ বদলে যাওয়া, বনভূমি বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকা বিপর্যয়ের আওতায় আসা এসব বিপদ ভবিষ্যতের নয়, ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই দরিদ্র ও ঘনবসতির দেশে মাটি, বায়ু ও পানি আক্রান্ত হয়ে জীবন-জীবিকায় হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে মানুষ, যার জন্যে এই ভুক্তভোগীরা দায়ী নয় কিছুতেই।[২৭]

এভাবে বিশ্বায়নের সংকট বাড়ছে এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বন্দ্ব হচ্ছে বিশ্বায়নের বহির্দেশীয় সম্প্রসারণের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও জীবনমানের অবনতির, ক্রমশ বেড়ে-ওঠা সম্পদশালীদের সঙ্গে লুণ্ঠিতের, দারিদ্র্যকবলিত গ্লোবের দক্ষিণাংশের সঙ্গে উত্তরের, সর্বোপরি পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার বিশ্বের ভুক্তভোগী মানুষের সঙ্গে গুটিকয় বহুজাতিক সংস্থা ও তার কর্তাদের সঙ্গে। এই দ্বন্দ্বই পুঁজির বিকাশের আবশ্যিক পরিণতি। পল সুইজির ভাষায়

Thus, historically, conflict is the nature of the capitalist accumulation. Increased transnational economic activity does not mean that the laws of the motion of the system have been dispensed with and capitalism has transcended its contradictions. Rather, it reveals that the more globalized the system, the greater the danger of global waves of crises.[২৮]

এই সংকট এবং দ্বন্দ্ব থেকে তৈরি হচ্ছে একে প্রতিরোধ করার অভিন্ন তাগিদ। বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠছে সাধারণ মানুষের মঞ্চ। গত শতকের শেষ এবং এই শতকের শুরু থেকেই বিভিন্ন বিশ্বায়ন এজেন্ট অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সহ বিভিন্ন বিশ্বঅর্থলগ্নি সংস্থা ও এদের মদদদানে নিয়োজিত ধনিক রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। নানান প্রতিরোধ আন্দোলনের পৌনঃপৌনিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে বিশ্বায়নের কেন্দ্র বলে দাবিদার দেশের হৃৎপিণ্ডস্থল নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্রাগ, রোম, মন্ট্রিল, মেলবোর্ন, মুম্বাই, হংকং ইত্যাদি শহরে।

১৯৯৯ সনের নভেম্বরে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে সিয়াটলে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ সংগঠিত হয়। শ্রমিক, ছাত্র, পরিবেশ-কর্মী ও ধর্মীয় সংস্থা সহ অসংখ্য সংগঠনের ৪০ হাজার মানুষ ডব্লিউটিও-এর নির্ধারিত মিটিং বন্ধ করে দেয়। এই প্রতিরোধ ছিল যথেষ্ট জঙ্গী। মার্কিন সমাজের ভেতরে কোনো উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব নেই এটা সেই লালিত অসত্যকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। সিয়াটলে পরাজয়ের পর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কর্তৃপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও দূরবর্তী স্থানে সমাবেশের স্থান নির্বাচন করা নিরাপদ মনে করে। এই বিবেচনায়, মধ্যপ্রাচ্যের কাতারের দোহা শহরে এরা সমবেত হয়ে নব্য-উদারবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রকল্পের নীলনকশা তৈরি করে এবং ২০০৩ সনে সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোর কানকুনে সংস্থার পরবর্তী সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত করে।

কানকুনের এই স্থানটিও দুর্গম ও প্রতিবাদ সমাবেশের জন্যে অসুবিধাজনক। নির্ধারিত সময়ে সেটাকে পুলিশ দিয়ে আরো দুর্ভেদ্য করা হয়। তৎসত্ত্বেও ল্যাটিন আমেরিকা, মেক্সিকো, ফিলিপাইন থেকে আগত কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র; যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিশ্বায়নবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, পরিবেশ-কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন-কর্মী, রাজনৈতিক-বিপ্লবী মিলে ১০ হাজার লোক সমবেত হয়। সংখ্যায় সিয়াটল প্রতিরোধের চেয়ে কম কিন্তু সমাবেশের মেজাজ জঙ্গী হয়ে উঠে যখন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত ডেলিগেটের কৃষক লী কিয়াং হেই সমাবেশস্থলেই প্রকাশ্যে নিজের বুকে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করে। সেটি ছিল ডব্লিউটিও-এর কৃষিনীতির দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ও দেউলিয়াগ্রস্ত এই অতিষ্ঠ কৃষকের প্রতিবাদ। এই ঘটনায় বিশ্বায়ন-বিরোধী সমাবেশ দ্রুত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ও আন্দোলন-কর্মীরা নিরাপত্তা-বেষ্টনী ভেঙে উপড়ে ফেলে প্রতিনিধি মন্ত্রিবর্গের সমাবেশের দিকে এগুতে থাকলে এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ ডব্লিউটিও-এর সমাবেশ বন্ধ ঘোষণা করে। এক দেশের কৃষকের অন্য দেশের প্রতিরোধ সমাবেশে উপস্থিতি ও আত্মাহুতি পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন মন্তব্য করেন, গড়পড়তা মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ বিশ্বের শক্তিশালী কর্পোরেশন ও শাসককে স্তব্ধ করে দিতে পারে। এটাই প্রমাণিত হয়েছে কানকুনে।[২৯]

দারিদ্র্য, যুদ্ধ, বিশ্বঅর্থলগ্নি সংস্থার ব্যবসা, শক্তিশালী রাষ্ট্রের সামরিক নীতি যতই বিশ্বের মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্কিত হচ্ছে ততই বাড়ছে মুক্তির সংগ্রামের উদ্যোগ, বিশ্বায়নবিরোধী বিক্ষোভের পৌনঃপৌনিকতা: এই শতকের শুরু থেকে ২০০০ সালের নভেম্বরে মন্ট্রিলে জি-২০-এর বিরুদ্ধে, ২০০১ সালের জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডে বিশ্বঅর্থনৈতিক ফোরামের বিরুদ্ধে, ২০০১ সালের জুলাইতে ইতালিতে জি-৮ সামিট-এর প্রতিরোধে, ২০০২-এর ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্কে, ২০০৩-এর জুলাইতে মন্ট্রিলে, ২০০২-৩-এ ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাছাড়াও প্যারিসে এবং ইতালির ফ্লোরেন্সে, এবং ২০০৪-এ মুম্বাই প্রথমবারের মতো এশিয়ায় ভারতে।[৩০]

ভারতের মুম্বাই-এ প্রতিরোধ সমাবেশ ৬ দিনব্যাপী চলে, জানুয়ারি ১৬ থেকে ২১ পর্যন্ত। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সমাবেশে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পঁচাত্তর হাজার সক্রিয়কর্মী ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল। মুম্বাইতে একই সময়ে আরো একটি সমাবেশ হয় Mumbai Registance 2004-এর ব্যানারে। প্রথমটি আয়োজন করে ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম অন্যটি বিপ্লবী বামপন্থীরা। এখানে গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে গণআন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলছে বাস্ত বক্ষেত্রে তার মধ্যে দুটি প্রবণতা দেখা যায় এবং এই প্রবণতা শ্রমিকশ্রেণীর

অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। যা মুম্বাইতে আলাদা সমাবেশ করার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।[৩১]

বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনে দেখা যায় কোথাও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা শক্তিশালী (যেমন সিয়াটলে), কোথাও আবার এমন ধরনের আন্দোলনকারী উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছেন যারা বিশ্বপুঁজিবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে একটি মতাদর্শগত পাথর্ক্যের অবস্থান রয়েছে যা বিপ্লবী বাম ও নব্য-বামেরা প্রতিনিধিত্ব করেন। আমরা আলোচনায় দেখিয়েছি, মার্কসবাদী ও নব্য-মার্কসবাদীরা একই দৃষ্টিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে দেখেন না। এর প্রভাব পড়েছে পুঁজিবাদি বিশ্বায়নকে মোকাবেলা করার প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্রের ওপর। অর্থাৎ আন্দোলনের মূলশক্তি বা অ্যাক্টর কারা হবে এবং এর লক্ষ্য কী হবে? এখানে তার কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা যাবে না। কারণ মার্কসবাদীদের মধ্যে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে কোনো অভিন্ন অবস্থান নেই। বিতর্ক চলমান রয়েছে।

বিশ্বায়নপন্থী মার্কসবাদীরা বলেন, তারা বিশ্বায়ন প্রত্যয়টির বিরোধী নন, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি নিরপেক্ষ এবং বাস্তব পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিবানন্দন বলেন, বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন শক্তি (ফোর্সেস অব প্রোডাকশন)-এর যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তা বিবেচনায় না রাখলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সফল হবে না। তিনি কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন : মার্কসবাদীরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে আজকের বিশ্বে পুঁজিবাদ কেন অত শক্তিশালী এবং শ্রমিকশ্রেণী কেন এত দুর্বল? পুঁজিবাদ সবচেয়ে কোথায় তীব্র আঘাত হানছে? কোথায় শোষণ এবং পরিবেশ বিপর্যয় সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে? কেন পুঁজিবাদ প্রতিরোধের আন্দোলনে শিল্পশ্রমিকদের সোল্ এজেন্সি থাকবে? পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক বদলে গেছে। শোষণের ভারকেন্দ্র এখন প্রান্তের দেশগুলোতে চলে গেছে। সেখানে অনুন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদ তার আচরণের সমস্ত সীমা লংঘন করেছে। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রামও হবে সেখানেই। তাই সেটা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের নিছক শ্রেণীসংগ্রাম হবে না, হবে পুঁজিব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল গণমানুষের সংগ্রাম (the struggle cannot be just class but mass)[৩২]

পল সুইজি তার *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকায় এই মতের বিপরীতে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন, একটি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মান্থলি রিভিউ গ্রুপের এলেন উড বলেন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নব্যমার্কসবাদী প্রকল্পের সামাজিক ভিত্তি নেই। এটা বিমূর্ত। এটা শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণী রাজনীতি থেকে পশ্চাদপসরণ। এর ফলে পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শ্রেণীসংগ্রাম সকল মুক্তিসংগ্রামকে ধারণ করে না সত্য, না করলেও এটা সকল মুক্তিসংগ্রামকে এক ধরনের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে; যা উত্তরাধুনিক মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপস্থিত।[৩৩]

বিপরীত দিক থেকে বলা হয়, গতানুগতিক বামপন্থীদের জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ের পুঁজিবাদের ধারণা ও কৌশল বদলাতে হবে। এটা সেকেলে হয়ে গেছে। উৎপাদন সম্পর্ক বদলে গেছে। জাতীয় বুর্জোয়ারা এখন একই সময়ে বহুজাতিক বুর্জোয়াও বটে। এদের শ্রেণীক্ষমতা আসে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা থেকে, জাতি-রাষ্ট্রকে পাশ কাটিয়ে। এদেরকে মোকাবেলা করার জন্যে প্রতিরোধ সংগ্রামকেও হতে হবে বহুজাতিক। সংগ্রামের সাংগঠনিক মঞ্চও হবে বহুজাতিক।[৩৪]

[The] struggle against contemporary capitalism must take on transnational perspective. New social movements need transnational organizing platform.

বহুজাতিক মঞ্চের সাংগঠনিকতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের ভেতরের শ্রেণীসংগ্রামের যারা টার্গেট সেই শোষকদের ওপর থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরে যায় কিনা বা সরানো হচ্ছে কি না, এই রকম অভিযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রের ভেতরের সংগ্রাম সর্বাধিক গুরুত্ব দাবি করে। বিশ্বায়নবিরোধী সংগ্রাম কোন রূপ নেবে তা নির্ভর করে আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী তার ওপর। এর উদ্দেশ্য কি বিশ্বপুঁজিবাদ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদিকে আরো মানবিক করার জন্যে সংগ্রাম? নাকি এর বিকল্প নির্মাণের জন্যে সংগ্রাম? সেই বিকল্প কি সমাজতন্ত্র? এক'শ বছর পর কোন সমাজতন্ত্র? এটা কি নতুন জন্ম নেবে, নাকি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে?

It is a socialism of place, a socialism with local agenda, a socialism with a hundred faces and experiences, a socialism without a name or a grand narrative at present.[৩৫] ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার অর্থ কি এই যে, ভবিষ্যতে আবার সফল প্রচেষ্টা গ্রহণ অসম্ভব? ইতিহাস তা প্রমাণ করে না। মধ্যযুগে পুঁজিবাদ একবার নয়, কয়েকবার ব্যর্থ যাত্রা শুরু করেছিল। সেসব প্রচেষ্টার শুরুতে সম্ভাবনা থাকলেও ঐ পর্যায়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী সামন্ত পরিবেশে টিকে থাকার মতো শক্তি এর ছিল না। এর পর কয়েক শতাব্দী লেগেছিল নতুন সন্ধিক্ষণ দেখা দিতে, যখন অঙ্কুরিত পুঁজিবাদ শেকড় বিস্তার করল এবং শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করার মতো শক্তি অর্জন করল। যুৎসই শক্তি অর্জনের পর পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করল। কোনো ঘটনা একবার ঘটেছে বলে আবার ঘটবে, তা নয়। তবে ঐ ঘটনার ধরনটি এই যুক্তিকেই জোরদার করে যে, তা ঘটতেই পারে।[৩৬]

পথের মতাদর্শিক পার্থক্য পথেই সমন্বিত হবে, চলতে চলতে গন্তব্য স্পষ্টতর হবে ইতিহাসের নিজস্ব প্রক্রিয়ায়। ততদিন মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টা, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ, বিশ্বায়নবিরোধী গণআন্দোলন থেমে থাকবে না। সেটা চলছে এবং তার মধ্যে উপস্থিত আছে শ্রমজীবী, পরিবেশবাদী, নারীবাদী, বর্ণবাদবিরোধী মানুষ। কোনো আন্দোলনে এগিয়ে আছে রেলশ্রমিক, কোনো দেশে খনিশ্রমিক, কোথাও পাবলিক সেক্টরের শ্রমিক, কোথাও ভূমিহীন কৃষক, নির্ভুল কম্পিউটার প্রযুক্তিচালিত সমরাস্ত্রে নিহত ভুল মানুষের স্বজন, স্রেফ যুদ্ধবিরোধী মানুষ নিজ নিজ জখম ও ক্ষতি থেকে মানুষ প্রতিরোধ

আন্দোলনে সামিল হচ্ছে এবং হবে এটাই নিয়ম। এই উপাদানগত বিভিন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অভিন্নতা খোঁজার ঐতিহাসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন মাত্রায় প্রতিরোধ সংগ্রাম ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বিশ্বের ব্যাপক মানুষের ভরণ-পোষণের অযোগ্য বণিকতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর কিছুর প্রত্যাশা মানুষ করবেই। সে জন্যে স্থানীয়ভাবে এবং আগের চেয়ে অধিকতর আন্তর্জাতিকভাবে শক্তির সন্ধান ও সমন্বয় প্রয়োজন হয়েছে প্রতীয়মান হয়। বিশ্বব্যাপী পুঁজির সম্প্রসারণের মোকাবেলা করুক মুক্তির সংগ্রামের বিশ্বায়ন।

তথ্যনির্দেশ

১. Robertson, R. 1992. *Globalization.* London: Sage p.8

২. Giddens, A 1990. *The Consequences of Modernity,* Cambridge: Polity Press. p.64.

৩. Baten, Sheikh A 2008. *Globalization and Anti-Globalization: A Critique of Contemporary Capitalism and its Counter Trends,* Dhaka: Pathak Samabesh, Ch.1

৪. Baten, ibid; Friedman, Thomas L 1999. *The Lexus and the Olive Tree,* New York : Farrar, Straus and Giroux

৫. Burback, Roger and Robinson, William I999. "Globalization As Epochal Shift" in *Science and Society,* 63:1, p.11; Castells, M 1996. *The Rise of the Network Society.* Oxford: Blackwell, p.18-21.

৬. Sivanandan, A 1997. "Capitalism, Globalization and Epochal Shifts: An Exchange". *Monthly Review,* 48:9, p.20.

৭. Castells, M 1996. *The Rise of the Network Society.* Oxford: Blackwell, p.469-474.

৮. Sweezy, Paul 1997. "More (or Less) on Globalization". *Monthly Review,* 49:4.

৯. Baten, op. cit. pp.5-54; Burback and Robinson, op. cit.p.20.

১০. Weiss, Linda. 1997. "Globalization and the Myth of the Powerless State." *New Left Review,* 225, pp.8-12; Hirst, Paul and Thomson, Graham. 1996. *Globalization in Questions: The International Political Economy and the Possibilities of Governments.* Cambridge: Polity Press, p.13 ; Stallings, Barbara and Streeck, Wolfgang 1995. "Capitalism in Conflict? The United States, Europe, and Japan in the Post-Cold War World", in Stallings, Barbara (ed.). *Global Change, Regional Response,* Cambridge: Cambridge University Press, p.73.

১১. Petras, J and Veltmeyer, H 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century.* Delhi: Madhyam Books, ch.1.

১২. Ohmae, K 1995. *The End of the Nation State.* New York: Free Press; Giddens, op.cit.
১৩. Held, David 1991. "Democracy and the Global System". in Held, David (ed.). *Political Theory Today.* Cambridge: Polity, pp.207-9; Robertson, op. cit. pp.58-60.
১৪. Petras, James 1999a. "Globalization: A Critical Analysis". *Journal of Contemporary Asia,* 29:1: Weiss, op. cit.
১৫. Burback and Robinson, op. cit.pp.30-35; Castells, op. cit.
১৬. Doremus, Paul N et al 1998. *The Myth of Global Corporation.*: Princeton, NJ: Princeton University Press.
১৭. Petras, James 1999a, op. cit.
১৮. McLuhan, M 1964. *Understanding Media.* London: Rutledge; Carpenter, E and McLuhan M (ed.). 1970. *Explorations in Communications,* London: Cape
১৯. Robertson, ibid.
২০. Friedman, op.cit.p.8.
২১. McChesney, Robert W 1998. "The Political Economy of Global Communication" in McChesney, Robert W et al (ed.). *Capitalism and the Information Age: The Political Economy of the Global Communication Revolution.* New York: Monthly Review Press; Wresch, William 1996. *Disconnected: Haves and Have-nots in the Information Age.* Rutgers University Press, New Jersey.
২২. UNDP (United Nations Development Programme) 1999. *Human Development Report 1996.* New York: Oxford University Press
২৩. Petras, James 1999a, op. cit.
২৪. Korten, David C 1999a. *The Post-Corporate World: Life After Capitalism.* Hartford: Kumerian Press
২৫. Cohen, Mitchel 1996. "Murder in Nigeria: Ordered by Shell and the IMF, Paid for by the US Government." in *Canadian Dimension,* 30:3

২৬. Goldsmith, Edward 1996. “Global Trade and the Environment” in *The Case Against Global Economy: And for a Turn Toward the Local*. Mander, Jerry and Goldsmith, Edward (ed.). San Francisco: Sierra Club Books.
২৭. মুহাম্মদ, আনু ২০০৬, ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬. ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী; দৈনিক
প্রথম আলো ২০০৯. বিশেষ সংখ্যা, ১৩ ডিসেম্বর ।
২৮. Sweezy, Paul et al 2000. “Towards a New Internationalism”. *Monthly Review*, 52:3
২৯. Baten, op.cit. ওয়ার্লড-সিস্টেম তাত্ত্বিক এন্টি-সিস্টেমিক মুভমেন্টের প্রবক্তা আমার
শিক্ষক ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন আগাগোড়া কানকুন আন্দেলন পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন ।
৩০. Callinicos, Alex 2001. “The Anti-Capitalist Movement and the Revolutionary Left” as retrieved from *Socialist Workers Online* http://www.marxist.de/anticap/index.htm
৩১. Baten, op. cit.
৩২. Sivanandan, A 1998. “Globalization and the Left”. *Race and Class.* 40:2-3
৩৩. Wood 1999. “An Interview with Ellen Meiksins Wood” by Phelps, Christopher, *Monthly Review,* 51:1
৩৪. Burback and Robinson, op. cit.p.37.
৩৫. Burback, Roger 1997. “Socialism is Dead, Long Live Socialism.” *NACLA Report on the Americas*.31:3 (November-December)
৩৬. সুইজি, পল এম ২০০৮. *বিশ্বায়ন নতুন কিছু নয়: নির্বাচিত প্রবন্ধ.* ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী.
পৃ-১৩০. (অনুবাদ ফারুক চৌধুরী)

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস ও সংস্কার

বাংলাদেশ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অংশ। এই সভ্যতা কৃষিসভ্যতা। নদীতীরবর্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাংলাদেশের এই সভ্যতা বেশ প্রাচীন। মিসরের নীলনদ-তীরবর্তী অঞ্চলে যেমন প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা, চীন ও মেসোপটেমিয়ায় যে সভ্যতা তা-ও নদীতীরবর্তী এবং সুপ্রাচীন। প্রাচীন কৃষিসভ্যতার আনুষঙ্গিক নানা সংস্কার-বিশ্বাসও এই সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এসব সংস্কার প্রথমে কৃষি উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল, পরে নববর্ষ উৎসব চালু হলে এসব সংস্কারমূলক আঞ্চলিক উৎসব তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের প্রাচীন এমন একটি সংস্কারমূলক উৎসবের নাম 'আমানি' উৎসব। আমানি ছিল মেয়েলি উৎসব, এর লক্ষ্য ছিল পরিবারের কল্যাণ ও পারিবারিক কৃষির সমৃদ্ধি কামনামূলক। এই পারিবারিক উৎসবের আচার সম্পন্ন করতেন বাড়ির মহিলাকর্ত্রী। কৃষি আবিষ্কারে নারীর পথিকৃতের ভূমিকা এবং তারই ফলে নারীতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্মৃতিচিহ্নবাহী বলে কেউ কেউ এ আচারমূলক অনুষ্ঠানটিকে চিহ্নিত করেন। এ ছাড়া সমাজে শত্রুনিধনের আচার পালন করার রীতি ছিল বছরের প্রথম দিনে। লোকবিশ্বাস ছিল, এতে সারা বছর শত্রুর আক্রমণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে নববর্ষে উদ্‌যাপন করা হতো বিগত বছরের গ্লানি মুছে ফেলার কামনায় কিছু আচার-অনুষ্ঠানও। চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো অঞ্চলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। অন্যদিকে চৈত্রসংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখের দিনে গাজন বা চড়ক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে নতুন বছরের শুভকামনা। লোকবিশ্বাস : চড়কের বাণফোঁড়ের ক্লেশের মধ্য দিয়ে বিগত বছরের পাপক্ষয়ের আরাধনা এবং নতুন বছরের সুখ কামনা করা হত। আবার অন্য একটা চিত্রও পাওয়া যাচ্ছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন : 'প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষের উৎসব হত। দোলযাত্রা বা হোলি সেই উৎসবেরই স্মারক।' 'দোলযাত্রা' ও 'হোলি' আনন্দোৎসব– চড়ক ক্লেশ ও বেদনার। তাহলে দেখা যাচ্ছে চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষকে জোড়া-উৎসব ধরা হলে তা একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনা দু' ধরনের উৎসবকেই অঙ্গীভূত করেছে।

দুই

বাংলা নববর্ষের উৎসব এখন বাংলা বর্ষপঞ্জির বোশেখ মাসের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয়। বহু আগে নববর্ষ যে অন্য সময়ে হত তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে নববর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিতায় অগ্রহায়ণ বন্দিত হয়েছে এই ভাষায়, 'ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস। বিফল জন্ম তার, নাই যার চাষ।' কবির অগ্রহায়ণ বন্দনার কারণ– যতদূর জানা যায়, তখন অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ ছিল। তবে কখন কীভাবে বৈশাখ মাসে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হল তা জানা যায় না। কিন্তু মুকুন্দরামের সময়ে অগ্রহায়ণ মাসে যদি নববর্ষ হয়ে থাকে তাহলে ভারতচন্দ্রের সময়ে যে বৈশাখে নববর্ষ হয়ে গেছে তার প্রমাণ আছে তাঁরই কবিতায় : 'বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়। নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ হয়।' তাছাড়া বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলীবর্দি খাঁ বৈশাখের প্রথম দিনে পুণ্যাহ করতেন। এ দেশের কবিদের কবিতা ও গানে নববর্ষের নানা আবহ ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নববর্ষের উৎসবকে ভিন্ন তাৎপর্য ও নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। ফলে বাংলা নববর্ষ হয়ে ওঠে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক মিলনমেলা। স্বার্থহীন বা লোভ-লালসাহীন মানবমৈত্রীর গভীরতর দ্যোতনায় বৈশাখের এ অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে সর্বসম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও ঐক্যচেতনার প্রতীক। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাঙালি জাতির এক সর্বজনীন মহান উৎসব। সকল বাঙালির মিলনমেলা। কৌম, গোত্র বা সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক ক্রিয়াকরণধর্মী (Ritualistic) আঞ্চলিক নববর্ষ উৎসব-আচারের জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ঐতিহ্যভিত্তিক নতুন এক জাতীয় দিবস : বাংলা নববর্ষ, বাঙালির নববর্ষ।

তিন

সুপ্রাচীনকাল থেকে বঙ্গদেশে বাঙালি কৃষিজীবী মুসলমান সম্প্রদায় নানা দেশীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ আবাহন করেছেন। হিন্দু জমিদারের পুণ্যাহ আর দোকানদার-মহাজনের হালখাতা অনুষ্ঠানে সাধ্যমতো অংশ নিয়েছে। জমিদারি উচ্ছেদের পর পুণ্যাহ অবলুপ্ত হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে নগদ পয়সার নিত্যনৈমিত্ত প্রবাহ না থাকায় বাকিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনা ছিল অপরিহার্য। ফলে হালখাতার গুরুত্বও ছিল বিরাট। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখন ভোক্তার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বাংলাদেশ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ঢুকে যাওয়ায় মানুষের হাতে নগদ পয়সাও জমা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটায় বাকির ব্যবসা প্রায় উঠেই গেছে। আর তাই জৌলুস হারিয়েছে হালখাতা অনুষ্ঠানটিও। তবে নববর্ষের অন্যান্য গ্রামীণ অনুষ্ঠান ও মেলা এখনো কিছু পরিমাণে চালু আছে, উদাহরণ হিসেবে লাঠিখেলা বা কাঠি নাচ (কুষ্টিয়া, নড়াইল ও কিশোরগঞ্জ),

ষাঁড়ের লড়াই (কেন্দুয়া, নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চল), মোরগের লড়াই (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), গরুর দৌড় (মুন্সিগঞ্জ), হাডুডু খেলা (মানিকগঞ্জসহ অন্যান্য স্থানে) এবং সারা দেশে নানা রকমের মেলার নাম উল্লেখ করা যায়। এসব অনুষ্ঠান-উৎসব বা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক আনন্দের উৎস এবং ঐতিহ্যে অংশগ্রহণের উপযোগী মাধ্যম। কিন্তু সর্বজনীন জাতীয় বিস্তার এসব অনুষ্ঠানের ছিল না এবং এসব অনুষ্ঠানকে পরিকল্পনার মাধ্যমে নববর্ষের উৎসবের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তও করে নেওয়া হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নব-উদ্ভূত শিক্ষিত নগরবাসী বাঙালি মুসলমান ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নানা গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকরণকে (Rituals) জাতীয় আধারে বিন্যস্ত করে নতুন এক সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে শামিল হতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক এবং পূর্ব বাংলায় তার অনুসারীরা বাঙালির সমন্বিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেছে, একে নানা কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কারণ এর মধ্যে তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যুবীজের অঙ্কুরোদগম লক্ষ করেছে। তাই এর বিরুদ্ধে শুরু করেছে বাঙালিকে জাতিগত নিপীড়ন–তার আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দেওয়ার কূটকৌশল। এই ধারাতেই বাধা এসেছে বাঙালির নববর্ষ উদ্‌যাপনেও। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ উৎখাত হয়ে যাওয়ার পরই শুধু যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করে বাঙালির জাতিগঠন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করেন এবং সে বছর বিপুল উৎসাহে বাঙালি তার নববর্ষ উদ্‌যাপন করে।

চার

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির উৎসমুখ খুলে যাওয়ায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে স্বৈরশাসন চালু এবং রাজনৈতিক কর্মী, এমনকি সংস্কৃতিক্ষেত্রের প্রগতিশীল সক্রিয়বাদীদের বিপুলহারে গ্রেপ্তার করায় সংস্কৃতির মুক্তধারার যে উৎসমুখটি খুলে গিয়েছিল তা আবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৫৮-এ আইয়ুবের সামরিক শাসন জারি হওয়ায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা, গণমুখী সংস্কৃতির অনুশীলন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু জনতার সংগ্রাম থেমে থাকতে পারে না। ১৯৬১ সালে ছাত্রলীগ বের করে গোপন লিফলেট 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'। ১৯৬২ সালে চার ছাত্রনেতার নেতৃত্বে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস গঠন, এই বছরেই 'দেশ ও কৃষ্টি' বইয়ে বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলন সামরিক স্বৈরতন্ত্রের ওপর তীব্র আঘাত হানতে থাকে এবং বাঙালির এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলন তার রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ

নেয়। এই সময়ের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা' এক নতুন ও নব দিকনির্দেশক স্লোগান হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাঙালিত্বের চেতনার তীব্র চাপে সে বছর (১৯৬৪) প্রাদেশিক সরকার বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করে। সেদিন ঢাকার বিভিন্ন নববর্ষ অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়। বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১), পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, নিক্কণ ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্র সংসদ, গীতিকলা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাঙ্গামার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পরও বাংলা একাডেমীর বটতলায় 'ঐক্যতানের' অনুষ্ঠানে এত দর্শক-শ্রোতার সমাগম হয় যে, ভিড়ের চাপে কয়েকজন আহত হয়। বাঙালির নববর্ষ অনুষ্ঠানে এত বিপুল মানুষের উপস্থিতি দেখে দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার বিস্ময় প্রকাশ করে।

এরপর বাংলা নববর্ষকে জাতীয় উৎসবে রূপ দিয়ে রমনার অশ্বত্থমূলে অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করে ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর 'ছয় দফা' আন্দোলন শুরু করার পর এই আয়োজন এক নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। সেই থেকে বাংলা নববর্ষ সকল বাঙালির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

পাঁচ

এবার আমরা বাঙালির বর্ষপঞ্জি বা পঞ্জিকা বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব। নববর্ষ উৎসব সব দেশেই সর্বজনীন উৎসব। সে জনেই সমাজবিকাশের ধারায় একটা উন্নত পর্যায়েই কোনো জাতির নববর্ষ উৎসব ও তার পঞ্জিকার উদ্ভব ঘটে। তাই এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে বাংলায় বর্ষবরণ ও বাঙালির বর্ষপঞ্জি উদ্ভাবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্যান্য সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়ারই পরিচয় বহন করে।

ইংরেজি 'ক্যালেন্ডার' শব্দটি মূলে ল্যাটিন শব্দজাত। যত দূর জানা যায়, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল : 'হিসাব-বই'। অন্যদিকে ইংরেজি আলমানাক শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমিত হয়। 'আলমানাক' যে অর্থ প্রকাশ করে তার বাংলা অর্থ করলে 'পঞ্জিকা' বলা যেতে পারে। ক্যালেন্ডার বলি, আর আলমানাক বলি–দুয়েরই জন্মস্থান প্রাচীন মিসর। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পঞ্জিকা মিসরে প্রস্তুত হয়েছিল বলে পঞ্জিকাকে মিসরীয় সভ্যতার অবদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মিসরীয়রাই প্রায় ৬ হাজার বছর আগে চান্দ্র-হিসাবের ভুল চিহ্নিত করে সৌর পদ্ধতির গণনা শুরু করে। নীলনদ-তীরবর্তী এই বাসিন্দারা অত আগে প্রায় ৩৬৫ দিনে বছরের হিসাবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে (The Calender : Devid Erwing Duncan : Fourth Estate, London, 1998)। এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল কৃষির সঙ্গে পঞ্জিকার অপরিহার্য সম্পর্ক। মিসরকে নীলনদের দান বলেছেন বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডেটাস।

নীলনদের একদিকে সবুজ কৃষিক্ষেত্র, অন্যদিকে ধূসর মরুভূমি। নীলনদ না থাকলে মিসর কৃষিসভ্যতার জননীস্বরূপ হতে পারত না। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী রোমে রোমান ক্যালেন্ডার (ইংরেজি ক্যালেন্ডার কথাটি ভুল। কারণ ওই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে রোমের ক্যাথলিক ধর্মের সম্পর্ক ছিল–প্রটেস্টান্ট ইংরেজরা তাই ওই ক্যালেন্ডার ১৭০ বছর পর্যন্ত গ্রহণ করেনি) বা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়ে তা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বহাল থাকে। পরে সে ক্যালেন্ডারের ভুলভ্রান্তি শুধরে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়। সে ক্যালেন্ডার এখন সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে।

আমরা বলেছি, কৃষির সঙ্গে পঞ্জিকার সম্পর্ক নিবিড় ও অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা মিসরীয় ক্যালেন্ডার এবং ইউরোপের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের কথা বলব। মিসরীয় সভ্যতায় বিশ্বের প্রথম যে ক্যালেন্ডার তৈরি হয় তাতে কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবই ছিল প্রধান। কারণ কৃষি ঋতুনির্ভর। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ফসলের বীজ সংগ্রহ, বীজ বপন, ফসলের পরিচর্যা ফসল কাটা–সবকিছুই সময়মতো করা চাই। তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডার কৃষির জন্য উপযোগী নয়। চান্দ্র ক্যালেন্ডারে বছরে সাড়ে ১০ দিনের হেরফের হয়। তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডার (হিজরি ইত্যাদি) অনুসরণ করলে এ বছরে যখন ফসল বোনা হবে, তিন বছর পরে তা এক মাস পিছিয়ে যাবে। কৃষি উৎপাদন ও তার ব্যবস্থাপনায় তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে সৌর ক্যালেন্ডার প্রচলন হয়। মিসরীয় ক্যালেন্ডারেই এ সংশোধন করা হয়। বহু পরে (১৫৫২) ইউরোপের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ত্রুটি দূর করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। ফলে জাগতিক কর্মকাণ্ড সূর্যের আবর্তননির্ভর বা ঋতুনির্ভর আর ধর্মীয় উৎসবাদি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে পঞ্জিকার মধ্যেও আমাদের সমাজজীবনের ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দুই সত্তাই একত্রে অবস্থান করাতে পঞ্জিকা জীবনের পূর্ণতারও প্রতীক।

বাংলা ও বিহারের (বাংলার বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এবং বিহারের ঐতিহাসিক অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ) প্রখ্যাত বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক মনে করেন বাংলা সনের উদ্ভাবক সম্রাট আকবর। তিনি তাঁর রাজ্যশাসনের ২৯ বছরে (হিজরি ৯৯২ এবং ১৫৮৪ সালে) পঞ্জিকা সংস্কারে হাত দেন। তিনি তাঁর নবরত্নসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেউল্লাহ সিরাজির নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সনকে সৌর ও চান্দ্র বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত করেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় ইলাহি সন করেছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের ঋতু ও কৃষি উৎপাদনের দিকে লক্ষ রেখে প্রজাদের খাজনা দেওয়ার সুবিধার্থে নানা আঞ্চলিক সনের প্রবর্তন করেন বা আঞ্চলিক সনের কাঠামো নির্দেশ করে দেন। সেই কাঠামো-সূত্র অবলম্বন করেই কোনো কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক অধিপতি বাংলা সন চালু করেন। আমরা মনে করি নবাব মুরশিদ কুলি খান বাংলা সনের প্রবর্তক। আকবর অন্য যে আঞ্চলিক সন প্রবর্তন করেন তা হল উড়িষ্যার আমলি সন, বিলায়েতি সন, সুরাসানি সন ইত্যাদি। এই সনগুলোকে

বলা হয় 'ফসলি সন'। বাংলা সনও তেমনি ফসলি সন। "আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায়, সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌর সনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যই আদর্শ হবে। বাংলা সনের মধ্যে তার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল বলে লক্ষ করি। কেননা বাংলা সন যেমন হিজরি সন নয়, তেমনি এটি ইলাহি সনের উপজাত হলেও মূল ইলাহি সন থেকে ভিন্ন। হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করা হলেও এর গঠন-পদ্ধতি ভারতীয় শকাব্দের মতো, তবে এটি শকাব্দের সমগোত্রীয় নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক এইটুকু যে, এর মাস ও দিনের নাম শকাব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।"

বাংলা সন একেবারেই স্বকীয়। আমাদের এ অঞ্চলে ২৪টির মতো সন ছিল। সেসব সন রাজা-বাদশাহ, ধর্ম বা সীমিত অঞ্চলের (ত্রিপুরা রাজ্য), কিন্তু বাংলা সন বাংলাদেশ ও জাতির নামে। তাই এ সন বাঙালির এত প্রিয়–জনজীবনে এত গুরুত্ববহ।

ভারত উপমহাদেশে পঞ্জিকা-সংস্কার উদ্‌যোগ প্রথমে নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত (দ্র. The Indian Calender, Robert Sewel & Sankara Balkrishan Dikshit : M. B. Das Publishers, Delhi, 1995), বেংকটেশ বাপুশাস্ত্রী কেতকর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ড. মেঘনাদ সাহা ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ। শহীদুল্লাহ্ বাংলা একাডেমীর পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রধান ছিলেন। তাঁর সংস্কারের পর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স শহীদুল্লাহ্ কমিটির সংস্কার প্রস্তাবনার উন্নয়ন সাধন করেন। তা নিম্নরূপ :

সাধারণভাবে বাংলা বর্ষপঞ্জির বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০ দিন গণ্য করা হবে।

গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষ গণ্য করা হবে।

অধিবর্ষে ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে গণ্য হবে।

আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী রাত ১২টায় তারিখ পরিবর্তিত হবে।

উপসংহারে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা সন-তারিখে যে অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা দরকার। এই অসামঞ্জস্যের ফলে নববর্ষ, রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী দুই অঞ্চলে একদিন আগে-পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর দায় বাংলাদেশের নয়। শহীদুল্লাহ্‌র সংস্কারে বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার সংস্কার প্রস্তাবকেই বাংলা একাডেমীর পঞ্জিকা সংস্কারে গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ভারতে ড. সাহার প্রস্তাবের কিছু সংশোধন করে এস.পি. পাণ্ডে কমিটি ১৪ই এপ্রিলে পহেলা বৈশাখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পাণ্ডে শীর্ষক কমিটির রিপোর্টে বলা হয় "The Year shall start with the month of vaisaka when the sun enters niranayana mesa rasi which will be 14th April of the Gregorian calendar. (Indian Journal of History of sciences 39.4(2004) 519-534). বাংলা একাডেমীর টাস্কফোর্সও একই তারিখে পহেলা বৈশাখ নির্দিষ্ট করেছেন এবং বাংলাদেশে সরকারিভাবে তা চালু হয়েছে। কিন্তু ভারতে সেখানকার পঞ্জিকাকারদের ব্যবসায়িক স্বার্থে পাণ্ডে কমিটির রিপোর্ট কার্যকর হয়নি।

নাটক/প্রবন্ধ

নাসির উদ্দীন ইউসুফ

.....

আগামীর থিয়েটার গল্পহীনতার

শিরোনাম শুনে অনেকেরই ভ্রু কুঞ্চিত হবে কিন্তু গত এক দশকে এ ভাবনাটা আমার ভেতরে ক্রমশ পাকাপোক্ত হয়েছে। আমি শিরোনামটিকে খোলাসা করে বলতে চাই, যে নাটকে গল্প নেই সে নাটকই উত্তম নাটক। নাটক এমনই এক শিল্প যা গল্প অতিক্রমকারী সয়ম্ভূ শিল্প। আগামী দিনের সৃষ্টিশীল মানুষেরা যারা নাটক লিখবেন এবং মঞ্চপ্রয়োগ ঘটাবেন তাঁরাই নির্দিষ্ট করবেন ভবিষ্যতের বাঙলা নাটকের রূপকল্প। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, ভবিষ্যতে কেমন নাটক দেখতে চাই। অর্থাৎ ভবিষ্যতের নাটকের রূপকল্প কী হতে পারে। মঞ্চের মানুষেরা রচনা ও মঞ্চপ্রয়োগে কী কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনতে পারেন।

আমি আমার শিরোনামের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দুটো নাটককে আলোচনার জন্য বেছে নেব। একটি বিশ্বখ্যাত নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গডো'

দ্বিতীয়টি নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন রচিত 'নিমজ্জন'। তবে প্রাসঙ্গিক কারণে বলে রাখতে চাই, আমার প্রস্তাবিত পথ একমাত্র পথ এরকম মত আমি পোষণ করি না। তবে বৃত্ত ভেঙে নতুন সৃষ্টির জন্য একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস আবশ্যিক। আমার বিশ্বাসে সবাই বিশ্বাসী হবেন এমন প্রত্যাশা এ রচনার ক্ষুদ্র রচয়িতার নেই।

প্রথম প্রস্তাবনা হচ্ছে, আধুনিক বাঙলা নাটক গড়ে উঠেছে কিনা? প্রশ্নটি আমার নয়, সেলিম আল দীনের। তাঁর ভাষায়, 'আমরা যা করছি তা পরজীবী নাট্যচর্চা।' তাঁর কথার ভঙ্গিতে অসহিষ্ণুতা থাকতে পারে, তবে সত্য যে আছে এ ব্যাপারে আমি দ্বিধাহীন।

যে নাট্যচর্চা আমরা করছি তা কি বাঙালির হাজার বছরের নাট্যঐতিহ্য, আঙ্গিক, শিল্পরূপ, প্রয়োগকৌশল আশ্রিত, না পশ্চিমের থিয়েটারের অনুকরণে বাঙলা নাটক রচনা ও প্রয়োগ-সিদ্ধতা!

বাঙলা আধুনিক থিয়েটার শিকড়হীন পশ্চিমা নন্দনতত্ত্বজাত থিয়েটার বৈ অন্যকিছু নয়। সেলিম আল দীন আধুনিক বাঙলা নাটকের একটি সম্ভাব্য তত্ত্ব উপস্থিত করেন 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' শীর্ষক গবেষণাকর্মের মধ্যদিয়ে। দীর্ঘ তিনদশক সেলিম ঐতিহ্যবাহী বাঙলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, কথানাট্য, পাঁচালি, আখ্যান আঙ্গিকে নাট্যবিন্যাস করে প্রায় বারোটি নাটক রচনা করে– তত্ত্ব ও প্রয়োগ সাধনে বাঙালির জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের রূপকল্প আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি এই জনপদে বসবাসকারী ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নাট্যরীতির সম্মানজনক অবস্থান মূলধারায় নিশ্চিত করেন। সেলিমসৃষ্ট ঔপনিবেশিক অবলেশমুক্ত আধুনিক বাঙলা নাট্যচর্চার মধ্যদিয়ে আমরা পেতে পারি ভবিষ্যতের বা আগামীর নাট্যের পূর্ণ শিল্পরূপ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হল, একজন শিল্পীর শিল্পাদর্শ এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ থাকা আবশ্যিক কিনা? এবং এই দুইয়ের সমন্বয়ে কি একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় নতুন রাজনৈতিক থিয়েটার জরুরি কিনা? আমার মতামত, অবশ্যই জরুরি।

শিল্পাদর্শ যা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সংশ্লেষে সৃষ্ট এবং উত্তর-ঔপনিবেশিককালে নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্যদিয়ে অর্জিত রাজনৈতিক আদর্শ। এই দুই আদর্শের আলোকে মানবমুক্তির এবং নাট্য সম্ভাবনা আগামী দিনে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এ বিভ্রমকালে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুরো মানবজাতি অকল্পনীয় সংকটের মধ্যে নিপতিত তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে নয়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাট্যরীতি, বিষয়চর্চা ও আঙ্গিকের বিকাশ।

নতুন এ ব্যবস্থায় মানুষ এবং শিল্প পণ্য বৈ আর কিছু নয়। আমাদের সকল সৃষ্টি আজ পণ্যে রূপান্তরিত। শিল্পীর দায় আজ জনগণ ও ইতিহাসের কাছে নয়। পুঁজিপতি এবং বাণিজ্যের কাছে। তাই এখন এবং আগামীর দ্বিতীয় কর্ম হল, নিজের সৃষ্ট শিল্পকে

বাঁচানো, নিজের স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার সঠিক বিকাশ। সর্বসময়ের জন্য মানুষের দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা, মুক্তির কথা বলা, জীবনের কথা বলা, বিক্রি হয়ে যাবার কথা নয়, স্বাধীন ও মুক্তমানবের স্বপ্ন চাষ করা।

সুতরাং আগামীদিনের নাটক শুধু লেখার মধ্যদিয়ে কিংবা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণের যে প্রবণতা, সে অনিবার্য অপঘাত থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে একটি মানবকল্যাণবর্তী শাশ্বত শিল্পের ধারার প্রবাহমানতা অব্যাহত রাখা।

তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রস্তাবনা হচ্ছে, সেলিম দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে আমি যেভাবে থিয়েটারকে দেখি তা হচ্ছে, আমি প্রথমত মনে করি, থিয়েটার একটি নির্দিষ্ট স্পেসে হয় এবং সেই শূন্যস্থানকে কুশীলবরা তাদের শিল্পবুদ্ধি, শরীর, মনন, মেধা ও চর্চা দিয়ে স্পেস ও সময়টাকে ভাঙচুর করেন। সেই ভাঙচুরের মূল হাতিয়ার হচ্ছে নাট্যকারকৃত টেক্সট। আবার টেক্সটটাও ভাঙে অর্থাৎ যে স্পেসে সে আছে সেই স্পেসে বা শূন্যস্থান, যে সময়ে আছে সে সময় অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের যে সময়টুকুতে নাটকটি অভিনীত হচ্ছে, সে সময়টুকুর মধ্যে পূর্ববর্তী সময়, বর্তমান সময় অথবা ভবিষ্যতের সময়কে একত্রিত করে ভেঙেচুরে একটা ভিন্ন জায়গা কিংবা ভিন্ন অবস্থান তৈরি করা– যে অবস্থানটি থিয়েটারের একটি অবস্থান, যা একমাত্র থিয়েটারেই সম্ভব, অন্যকোনো মাধ্যমে নয়। যার জন্য আমার সাম্প্রতিক সময়ের লেখায়, বক্তব্যে আমি বলবার চেষ্টা করেছি যে, থিয়েটার গল্পের কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে আসুক। প্রচলিত নাটকে গল্পের একটি আড়ষ্ট কাঠামো আছে। তা গল্পের জন্য অবশ্যই আড়ষ্ট নয়, গল্পের জন্য যৌক্তিক হতে পারে, জরুরিও হতে পারে। কিন্তু থিয়েটারের জন্য তা জরুরি কিনা, সে প্রশ্নটি আমার আছে। অর্থাৎ, থিয়েটারে গল্প অনিবার্য কিনা? যদি থিয়েটারে গল্প অনিবার্য হয় তাহলে তা হবে এক ধরনের থিয়েটার। কিন্তু শুধু গল্পকে আশ্রয় করে থিয়েটার হবে তা তো নয়। আমি যদি বলি, গল্প ছাড়াও থিয়েটার হবে এবং সেটিই ভবিষ্যতের থিয়েটার, যেটি 'ওয়েটিং ফর গডো' এবং 'নিমজ্জন'-এ আছে। কোনো গল্প নেই দুটি নাটকে।

বেকেট 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটকে পশ্চিমের সকল নাট্যরীতি প্রথা এবং শিল্পতত্ত্ব ভেঙে ফেলে সৃষ্টি করলেন এক অবিস্মরণীয় নাটক। এ নাটকে চরিত্র আছে কিন্তু অসম্পূর্ণ-অর্থহীন আপাতবিচারে। কোনো প্লট বা গল্প নেই। চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই ধোঁয়াশা। অপেক্ষা গডোর জন্য। চারটি চরিত্র– ভ্লাদিমির, এস্ট্রাগন, লাকি ও পোজো, উদ্দেশ্যহীন ও অসম্পূর্ণ সংলাপ এবং সামগ্রিক বিচারে গল্প বিতাড়িত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ক্লাইমেক্স, সংঘাত নেই। পারম্পর্যহীন ঘটনার সমন্বয়। বিশ্বনাট্য যেন নতুন ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয় পেল এই মহান নাট্যকারের কাছ থেকে। একটিমাত্র দৃশ্য, চারটি চরিত্রের অর্থহীন উপস্থিতি(!) কী তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালের ইউরোপের অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি-সমাজ, রাষ্ট্র আর মানুষের

আত্মসম্পর্কের চিত্র ও ধ্বনি এক বেদনার্ত বাঁশির মতো বেজে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রু জমাট হয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে। গল্পতো নেই, এমনকি ঘটনাও নেই।

অন্যদিকে, যে আখ্যান রচনা করেছিলেন সেলিম আল দীন, এর আগে যে গল্পকথনরীতি, সে কাঠামোকে ভেঙেচুরে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজের হাতে। 'নিমজ্জন' রচনার পূর্বে সেলিম পাঁচালি আঙ্গিকে নাট্য রচনা করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে তা আধুনিক মনস্কতায় উপস্থাপন করেছেন। সেই রীতি ভেঙে আবার সেলিম লিখলেন খণ্ডিত অথচ সয়ম্ভূ উপাখ্যান 'নিমজ্জন', যেটি এই শতাব্দীর মহাকাব্য। যে যুদ্ধ, ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সভ্যতা, অমানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা– তার বিপরীতে সেলিম মানুষের জয়গান গেয়েছেন। গল্পের কাঠামো থেকে বেরিয়ে নাট্যকার তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শনে, নিজস্ব শিল্পদর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্টি করলেন 'নিমজ্জন'। অবশ্য নিজস্ব বললে ভুল হবে। বলা বাহুল্য যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস থেকে এগুলো আহরণ করেছেন, আহরণ করে তার বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সেগুলোকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যদিয়ে, ঘটনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। গণহত্যার বিপরীতে এবং মানবতা ও শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এ থিয়েটার আর দশটা থিয়েটারের মতো নয়, যেসব থিয়েটারে গল্পের একটি শুরু আছে, একটি ক্লাইমেক্স আছে এবং একটি সমাপ্তি আছে। চরিত্রে সম্পূর্ণ পূর্ণতা দেয়ার একটা চেষ্টা থাকে সাধারণ গল্পের থিয়েটারে। কিন্তু আমরা যদি সেলিম আল দীনের 'নিমজ্জন' নাটকটি দেখি, তাহলে কোনো চরিত্রের পূর্ণতা দেখতে পাই না। যে আগন্তুক বন্ধু আসে সে কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় এবং সে কি আসলেই আগন্তুক বন্ধু কিনা, নাকি অধ্যাপক চরিত্রের আরেকটি সত্তা– সেটাও কিন্তু আমাদের বোঝার অপেক্ষা রাখে, তা বুঝতে একটু সময় লাগে। এই জায়গাতেই হচ্ছে সেলিমের আধুনিকতা, এই জায়গাতেই হচ্ছে ভবিষ্যতের নাটকের একটা ইঙ্গিত। অর্থাৎ একটি চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ নাট্যকারের কাজ নয়, তা অভিনেতার কাজ। চরিত্রের সম্ভাবনার দিকটি নাট্যকারের, সেটিকে পূর্ণতা দেবে অভিনেতা– এটাই ভবিষ্যতের থিয়েটার। তবে এটি খুব কঠিন কাজ। এটিই আমার ভবিষ্যৎ নাটক সম্পর্কে একটি ভাবনা। সেলিমকে আমি এই কথাটিই ২০০০ সালের আগে বলেছিলাম যে, আমি এমন একটি নাটক চাই, যে নাটকে নির্দিষ্ট কোনো গল্প থাকবে না, যে নাটকে টাইম অ্যান্ড স্পেসের কোনো নির্ধারণ থাকবে না। যেখানে সব ভেঙেচুরে দেয়া হবে। গল্পের চলন-বলন-কথনের ধারাবাহিকতা থাকবে না। দুমড়ে-মুচড়ে দাও, সময়টাকে ভেঙে ফেল, স্থানটাকে ভেঙে ফেল। দেখি, থিয়েটার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! সেলিম বলল যে, এভাবে থিয়েটার কীভাবে হবে? আমি বললাম– হ্যাঁ, এভাবেই হোক না। তারপর সত্যি সত্যি তিনি লিখে ফেললেন 'নিমজ্জন' নাটকটি।

আমাদের থিয়েটার, বিশ্ব থিয়েটার আড়াইহাজার বছর গল্পকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলছি না যে, গল্পকে আশ্রয় করে ভালো কাজ হয়নি। হয়েছে, যথেষ্ট ভালো কাজ হয়েছে। আমরা তাতে চমৎকৃত হয়েছি। কিন্তু একটি সময়ে এসে

আমাদের ভাবা উচিত যে, পেইন্টিং তার নিজস্ব ভাষা নিয়ে, স্বকীয়তা নিয়ে, নিজস্ব রীতি নিয়ে যদি শিল্পীর হাত দিয়ে, চোখ দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে, সংগীত যদি তার নিজস্ব আঙ্গিকে, নিজস্ব সুর-স্বরলিপি নিয়ে ও যন্ত্রের ব্যবহারে যদি বিমূর্ত একটা জায়গা তৈরি করতে পারে এবং বিমূর্তকে মূর্ত করতে পারে, মূর্তকে বিমূর্ত করতে পারে– যেটা পেইন্টিংয়ে আছে, সংগীতে আছে, নৃত্যে আছে, কবিতায় তো আছেই। কবিতা ও সংগীত নিজস্ব আঙ্গিক ও ভাষায় দাঁড়িয়েছে। তাহলে নাটক কেন তার নিজস্ব আঙ্গিকের শক্তিতে এবং নিজস্ব ভাষায় দাঁড়াতে পারবে না?

অবশ্যই নাটক হাঁটবে নিজের পথে, প্রকাশিত হবে নিজের ভাষায়, শক্তিতে, রীতিতে ও স্বকীয়তায়। আধুনিক থিয়েটার তথা ভবিষ্যতের থিয়েটারকে এ জায়গায় পৌঁছাতে হবে। তাহলে গল্প কি একেবারেই বাদ দিতে হবে– এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হব এবং হচ্ছিও বটে। আমি বলছি না যে থিয়েটারে কোনো গল্প থাকতে পারবে না। থাকুক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু গল্প ছাড়াও যে থিয়েটার হতে পারে– আমি সেই কথা বলছি। দর্শক ও নাট্যবোদ্ধাগণের বিবেচনার জন্য বলছি, আমার এ প্রস্তাবটি আপনারা বিবেচনা করুন যে গল্প ছাড়াও থিয়েটার হতে পারে।

নাটকের জন্য এ রকম ঔপনিবেশিক চিন্তা আমাদের থাকবে কেন যে, নাটকে সবসময় গল্প, গল্পের মধ্যে উত্থান-পতন, ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি অথবা চরিত্রের সমারোহ, চরিত্রের সঙ্গে সংঘাত ও সংলাপ থাকতেই হবে।

আমার নিজস্ব একটি ধারণা যে, একজন মানুষের এক মুহূর্তের চিন্তা অথবা সারাজীবনের চিন্তা যখন একটি মুহূর্তে প্রকাশিত হচ্ছে, তাহলে একটি মুহূর্তকে আমরা এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার মধ্যে বিকশিত করে থিয়েটার নির্মাণ করতে পারি। সেখানে কোনো চরিত্রই প্রচলিত নাটকের মতো পূর্ণতা পাবে না। কিন্তু যখন নাটকটি শেষ হবে, তখন দর্শক ও শিল্পীর চোখে যে চিত্র ভেসে উঠবে তা বাস্তব নয় অথচ বাস্তবেরও ঊর্ধ্বে একটি শিল্পসত্য। এটি হচ্ছে আগামী দিনের থিয়েটারের ভিত্তি। আমাদের থিয়েটার এখনো ক্লিশে-বাস্তবনির্ভর। বাস্তবতার বাস্তব নিয়ে আছে প্রচলিত নাটক। বাস্তবতার বাস্তব নিয়ে থিয়েটার হয় না। এটিকে ছাড়িয়ে থিয়েটার আরও অনেক দূর এগিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতাভিত্তিক নাটকের উৎকর্ষ আমাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে। আমাদের এই বাস্তবতার নিগড় থেকে বের হতে হবে। নইলে নাটক এক মহা শিল্প-বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

নাটক কবিতার সমকক্ষ হতে পারে, নাটক চিত্রকলার সমকক্ষ হতে পারে, নাটক একটি সংগীতের সমকক্ষ হতে পারে। এ জায়গাটি আমরা কেন অনুভব করতে পারছি না? আমাদের বারবার বোঝানো হচ্ছে যে, থিয়েটার একমাত্র প্লট, সংঘাত, চরিত্রের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হতে হবে। এগুলো যেমন সত্যি, এর বিপরীতে আমার প্রস্তাবিত ভাবনা একটি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আগামীদিনের মঞ্চে। সেখানে হয়তো এমন সব আধুনিক থিয়েটার হবে, যে নাটকগুলো ঘরে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের

সঙ্গে টেলিভিশনে দেখতে পারবে না। একটি শিল্পকর্ম দেখতে হলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দর্শককুলকে সমবেত হতে হবে। সমবেত দেখার মধ্যদিয়ে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে, সেটা বাসায় বসে টেলিভিশন দেখার মধ্য দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। একটা সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেমন যেতে হয়, থিয়েটার দেখতে হলেও একটা থিয়েটার হলে যেতে হবে। সেখানে আর দশজন দর্শক থাকবে, আমিও থাকব। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিতে গ্রহণ করব শিল্পরস।

বাসায় টেলিভিশনে যা দেখা হয়, বই-এ যে গল্পটি পড়া হয়, থিয়েটারে তার ভিন্ন কিছু দেখবে দর্শক। এছাড়া অন্যসব দেখা হয়ে গেছে তাদের। আজকে যদি 'বিষাদসিন্ধু' করি অথবা 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কোনো গল্প করি, তাহলে সেটি নতুনভাবে আলাদা উপস্থাপনায় করতে হবে, যে শিল্পের স্বাদ গ্রহণ অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব নয়। যেকোনো শিল্পমাধ্যমে শিল্পীদের নিবেদিত করতে হয় শতভাগ শিল্পসৃষ্টির জন্য। তেমনি দর্শকেরও শতভাগ মনোযোগ ছাড়া আর যাই হোক নাট্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

থিয়েটার এক ধরনের পঙ্গুত্বের দিকে এগোচ্ছে। কারণ আমাদেরই ভ্রান্তিতে থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে টেলিভিশন। সম্প্রতি টেলিভিশন থিয়েটারের কিছু কিছু ভাষা ধার করেছে এবং পৌঁছে দিচ্ছে মানুষের ঘরে ঘরে। একজন লোক ইচ্ছে করলেই ১০০টি চ্যানেল দেখতে পারছে ঘরে বসে, কিন্তু কোনোটিই সম্পূর্ণ দেখছে না। এই অমনোযোগী দর্শক কখনই শিল্পের সমঝদার হতে পারে না। শিল্পের দর্শক যদি শিল্প থেকে কোনো দর্শন বা ভিন্নতর জীবনবোধ ও আনন্দ না পায়, তাহলে সে শিল্পের বিকাশ কখনোই ঘটবে না।

তাহলে তিনটি সম্ভাবনার কথা এই ক্ষুদ্র উপস্থাপনায় আমরা পাই।

ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতিসমূহের সংশ্লেষে আধুনিক নাটক নির্মাণ।

বিশ্বায়নের নামে নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে প্রতিটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি

রক্ষার সংগ্রাম আত্মস্থপূর্বক নাটক রচনা।

গল্পের আড়ষ্ট কাঠামোর ভেতর থেকে নাটককে মুক্ত করে আনা এবং মঞ্চ আঙ্গিক

ও ভাষায় তা পুনঃসৃজন করা।

এই তিনটির মধ্যে কে কোন প্রস্তাবনা গ্রহণ করবেন তা উপস্থিত নাট্যকর্মীদের বিবেচনা। কিন্তু আমার কাছে এই তিনটি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে, আমার সমাপনী উচ্চারণ–

নাটক কখনো মঞ্চে চলমান চিত্রকলা, কখনো দৃশ্যমান বিশুদ্ধ সংগীত। কখনো ভিজ্যুয়াল পোয়েট্রি (VISUAL POETRY) বা পোয়েট্রি অন স্টেজ (POETRY ON STAGE)। সেখানে গল্প নিঃসাড়, সে তো কোন ছাড়! ধন্যবাদ সবাইকে।

গল্প

রবিউল করিম

....

বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে

এক কাক-ডাকা ভোরেই প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটল।

জমসেদ মিয়া তখন কোর্টে সাক্ষী দেবার জন্য গঞ্জ থেকে ছেড়ে যাওয়া ফার্স্ট ট্রিপের গাড়ি ধরার জন্য জোর কদমে হাঁটছে। হঠাৎ মানিকদের বাড়ির সামনে ঘুলি ঘুলি আলো-আঁধারে কিসে যেন তার ডান পা'টা একটু হড়কে গেল। যদিও তখন ফজরের ওয়াক্ত শেষ, আকাশ অনেকটা ফর্সা। কিন্তু রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়া বিশাল বাঁশঝাড়ের কারণে, মানিকদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা– কিছুটা অন্ধকারই থেকে যায় অনেক সকাল পর্যন্ত। জমসেদ মিয়া প্রথমে ভাবে, গোবর-টোবর কিছু একটা হবে এবং সেই ভেবেই ডান পা থেকে রাটার ৪৫ টাকা দামের রাবারের জুতোটা ঝেড়ে নেয়ার জন্য একটু ঝুঁকে জুতো ধরতেই– ভক্ করে তার নাকে গুয়ের গন্ধ চড় কষে। কিন্তু ততক্ষণে ডান হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলে সেই গুয়ের কিছু অংশ লেপটে যাওয়ায়, জমসেদ মিয়া কিছুতেই আর তার মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না ; চিৎকার করে গালি দিয়ে ওঠে, কোন হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা, হাগার আর জাগা পায়নি। পাছাত মরিচ-পোড়া দিলে গা হয়। সে চিৎকারে বাঁশঝাড়ের দু'একটা শালিক, বক কিংবা গুদোড়কানি পাখা ঝাপটিয়ে সেই গালাগালকে বেপাত্তা করে দেয়, আর মানিকের ৭০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মা– যে হাঁটতে চলতে ফিরতে গেলে বাতের ব্যথায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে ওঠে, সে ঘুমহীন দু'চোখ মেলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে,– জমসেদ মিয়ার অবস্থা কল্পনা করে।

সেই দিন শুরু, তারপর থেকে চলমান এই গু-তাড়িত ঘটনা। প্রত্যেকেরই ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। তা সে গঞ্জেই যাক, কি হাটেই যাক, কি অন্য কোথাও। তাই, বিশেষ করে মানিকদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় পায়ের সাথে দু'চোখটাকে রাস্তা বরাবর চালিয়ে নিয়ে যায়। সবসময় আশঙ্কা,– কখন গুয়ের মধ্যে পা পড়ে। রাস্তায় একটু ধুলো থাকলে তা দিয়ে হয়তো পা থেকে গু মোছা যায় কিন্তু চকচকে মসৃণ রাস্তার বদৌলতে তা করারও জো নেই। ফলে, প্রায় আধ মাইল তক্ হেঁটে গিয়ে রমজানের বাড়ির সামনের চাপকলে পা ধোয়া ছাড়া গতি থাকে না। কিন্তু তাতে করে

গুয়ে পা-পড়ার ঘটনাটা কিছুতেই লুকানো যায় না। কারণ সে পাড়ায় চাপকল বলতে ঐ একটাই, আর তাতে রাজ্যের সব মেয়েছেলেদের ভিড়।

এই রাস্তাটার বয়স বছর তিনেক। আগে অনেকটা জলার মতন ছিল মানিকদের বাড়ির সামনের এই জায়গাটা। গ্রামের দুষ্টু ছেলের দল দুপুরে কোনো কাজ খুঁজে না পেলে,– বাঁশবাগানের ছায়ায় বসে ছিপ দিয়ে দু'একটা শোল, চ্যালা কিংবা ব্যাঙ ধরত। তখন মানিকের বাপ হারান মিয়া বেঁচে। মাঝেমাঝে ছেলেপুলের দল বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করলে,– সে হুকো হাতে কাশতে কাশতে এসে ধমকটমক দিত। তাতে করে অনেকেই মনে করত, এ জলার মালিক মানিকের বাপ হারান। কিন্তু একদিন হঠাৎ উপজেলা থেকে চেয়ারম্যান এসে, গ্রামে একটা ছোটখাটো বিপ্লব ঘটিয়ে চলে গেল। স্কুলের মাঠের চারকোণায় পোঁতা বাঁশের খুঁটিতে নারিকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা বিশাল চোঙঅলা মাইক, গমগম ঝমঝম করে সারা গ্রামের মানুষকে শুনিয়ে গেল,– আজ থেকে অবহেলিত এই চকপ্রাণ গ্রাম উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাবে। স্কুল হবে, মাদ্রাসা হবে, ব্রিজ হবে, কালভার্ট হবে, আরো কত কী হবে, হবের ধাক্কায় সকলে প্রায় বজ্রাঘাতের ন্যায় হবে-ঘাতের শিকার হয়ে,– জবানহারা বনে গেল। কিন্তু করিৎকর্মা চেয়ারম্যানের আশ্চর্য চেরাগের ক্ষমতায়, সত্যিসত্যিই একদিন গ্রামের পায়ে চলার লোমওঠা কুকুরের শরীরের মতন একটু ঘাস– একটু মসৃণ রাস্তাটায়, মাটিকাটা শুরু হল, চওড়া হল এবং আশ্চর্যজনকভাবে মানিকদের বাড়ির ওখানে গিয়ে রাস্তাটা যে বাঁক নিয়েছিল, তা সোজা হল চেয়ারম্যানের তর্জনী আঙুলের মতন। মানিকের বাবা টুঁ শব্দও করল না। মানিক, মল্লিক একটু লাফালাফি করল কিন্তু চেয়ারম্যানের সেই সোজা আঙুল বাঁকা করার সাধ্য কার?

প্রথম প্রথম গুয়ের এই ঘটনাটাকে কেউ গা করেনি। ভেবেছিল, কেউ বেকায়দায় পড়ে হয়তো এরকম কাজ করে থাকবে। কিন্তু যখন প্রাত্যহিক একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়াল মানিকদের বাড়ির সামনে গু, তখন এ নিয়ে গ্রামের হাটে, চায়ের টং ঘরে কিংবা নিতান্তই বৈকালিক আড্ডায় হাসি-ঠাট্টার মধ্যে গু-প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ল। যেহেতু মানিকদের বাড়ির সামনেই এ ঘটনা, সেহেতু প্রথমেই সন্দেহের ডালাপালা মেলল যে, মানিকরাই কেউ এ অসভ্যতার জন্য দায়ী। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এই প্রশ্নে যে, কেন তারা রাস্তায় হাগতে যাবে ? যদি প্রতিশোধ-বাসনা থেকেই এ ঘটনা তারা ঘটিয়ে থাকে তবে রাস্তা যখন তৈরি হয়েছিল তখন কেন তারা রাস্তায় হেগে রাখেনি ? আর মানিক, রতন বা মল্লিকরা এখন যথেষ্ট সচ্ছল। ভালো খায় দায়। এনজিওর টাকায় প্রত্যেকেরই একটা করে পাকা পায়খানা। তারা কোন দুঃখে রাস্তায় পায়খানা করবে? তাদের ছেলেপুলেদের দিয়েও যে একাজ হবে না তা একেবারে নিশ্চিত ; কেননা তিন ভায়ের প্রায় এক ডজন ছেলেমেয়ের প্রত্যেকেই একেকজন ফুটুকবাবু-বিবি। তাদের দিয়ে এরকম ফটকামির কাজ কি সম্ভব ? তাছাড়া গু দেখে মনে হয় যে, তা বড়ো মানুষের। কেমন যেন লাল-হলুদ-মাটিরঙা মোটামোটা প্যাঁচানো প্যাঁচানো, শক্ত ধরনের।

ছেলেপুলের পাছা দিয়ে এরকম গু বের হতে গেলে, পাছা ফেটে রক্ত বের হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে! কেউ কেউ আবার এসবের মাঝে জ্বিন-ভূতের কারসাজিও আবিষ্কার করতে চায় ঠাট্টার আড়ালে। রাস্তা সংলগ্ন বিশাল বাঁশঝাড় এই রহস্য তৈরিতে বিশেষ পরিপুষ্টি দেয়। গ্রামের বয়স্করা বলে যে, একসময় সেখানে নাকি গোরস্থান ছিল। এ নিয়েও ভয়মিশ্রিত একটা সম্ভাবনা কারো কারো মাঝে উঁকি দেয়। অনেকে আবার এ-ও বলে যে, মানিকের বুড়ি মা'ই রাস্তায় হাগে। কেননা আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই, গু কি এমনি এমনি আকাশ থেকে পড়বে ? কেউ কেউ ঠাট্টা করে প্রস্তাব করে, পাহারা বসানোর। কিন্তু যতই ঠাট্টার বিষয় হোক, প্রতিদিন এ নিয়ে মজা করা কিংবা বিব্রত হওয়া থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

রতন, মানিক এবং মল্লিকরা এ ঘটনায় যারপরনাই বিব্রত। হাটে বাজারে গঞ্জে সকলেই তাদের প্রশ্ন করে। 'ক্যা বা এডা এ্যাডা কাম হলো ? ঘাটাত হাগা। ছোলপুলেক নিষেধ করবার পারিন না।' কেউ কেউ আবার আরেক কাঠি বেড়ে শ্লেষ মিশিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে খোঁচা মারে, যাই কন-বা পাকা পায়খানাত বস্যা কি মনের সুখে হাগা যায় ? পাছাত যদি বাতাসই না ল্যাগলো তালে আর হাগা ক্যান ? তারা কী উত্তর দেবে ? তাদের মাথা হেঁট হয়ে আসে। তারা জানে ছেলেমেয়েরা কেউ এ কাজ করবে না। তবুও একদিন ক্রোধবশে অকারণেই বাড়ির ছেলেপুলেদের পিঠের উপর বাঁশের চিকন কঞ্চির বাড়ি পড়ে। তারা হাউমাউ করে কাঁদে এবং তাদের দাদি মর্জিনা বিবি প্রায় ভেঙে-পড়া ঘর থেকে সে-চিৎকার শুনে ছেলেদের গালমন্দ করতে করতে বের হয়ে আসে।

যদিও এর ব্যতিক্রমটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা, ঐসব ছেলেপুলেরা তাদের এই দাদিকে দেখতে পারত না বাপ-মায়ের মতনই। বুড়ি যে ঘরটাতে থাকে, সেই ঘরটাই হল মানিকদের পৈত্রিক ভিটা। তখন মোটে দু'খান ঘর ছিল। বর্তমানে তিন ভায়ের তিনটা আধাপাকা আলাদা দোচালা টিনের ঘর। তাদের বাপ মরে যাবার পর থেকে এই সাত বছরে, একবারই ঐ পুরনো ঘরটার সংস্কার হয়েছিল তা-ও আবার বছর তিনেক আগে,– এক ঘূর্ণিঝড় যদি ঐ ঘরের চালা উড়িয়ে নিয়ে না যেত, তবে আদৌ সংস্কার ঘটত কিনা সন্দেহ। বুড়ি কেন আজো বেঁচে আছে, তাকে কেন কোনো অসুখ কবর পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে না! এই চিন্তা তিন ভায়ের মাথায়, মাঝে মাঝেই যন্ত্রণা তৈরি করে। সংসারে বুড়ো মানুষের কী দরকার ? না তারা কোনো কাজ করতে পারে কিংবা করতে দেয়। সবকিছুতেই একটা বাগড়া বসায়। পান থেকে চুন খসলেই হা হা করে ওঠে। সবসময় একটা ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান লেগেই থাকে– তোর বউ খারাপ, হামাক ঠিকমত খাবা দেয় না, তোর ছোল সবসময় হামাক মরার বুড়ি মরার বুড়ি করে, তিন দিন থ্যাকা হামার পান নেই, সন্ধ্যা হয়্যা গেলেও কেউ হামার ঘরত সাঁঝবাতি দেয় না। এ অপ্রাপ্তির কথাগুলোর ৯০ ভাগই সত্য এবং আরো কিছু সত্য বরাবরই থেকে যায় যেগুলো বুড়ি কোনোদিনই ছেলেদের সামনে প্রকাশ করে না। জানে, যা চাইলে

পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই যদি চেয়ে পাওয়া না যায়, তবে মনের বাকি দুঃখগুলো প্রকাশ করে কী লাভ! কেন সে বলতে যাবে, ছোটবউ দুপুরে তাকে খাবার দিয়ে যাবার সময় একবারও বলে না, মা এই তোমার ভাত থ্যাকলো। উঠো, খ্যায়া লও। এক সানকি ভাত তার সামনে রেখে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কোনোদিন কেউ জিজ্ঞাসা করে না, মা তোমার কি খ্যাবা ভালো লাগে ? সবসময় কেন তার পাতে মাছের লেজটাই-বা থাকবে ? এই বুড়ো বয়সে তার পক্ষে কি মাছ বেছে খাওয়া সম্ভব ? এক গ্লাস পানি খাওয়ার জন্য চেঁচিয়ে কাউকে ডাকলেও কেউ আসে না। তার ময়লা কাঁথা, চাদরটা মাসের পর মাস না-ধোয়া থাকে। কেচে দিতে বললে বলে, আজ সাবান নেই, তো কাল সময় নেই। আর ছেলেরাও কি সপ্তাহে কিংবা মাসে একবার তার কাছে এসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলে ? তার বাতের ব্যথাটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, কই কেউ তো কোনোদিন একটা ওষুধ পর্যন্ত এনে দ্যায় না। উলটা তাদের বৌগুলো, ছেলে স্কুলের ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় অংকেতে কম নম্বর পেলে বলে, প্যাবা না, বুড়ি কি কারো ভালো দেখবা পারে, মেয়েটা কলের পাড়ে পিছলে পড়লে বলে, কলের পাড়ত মুতা থুলে পিছল্যা খাবে না কে? সব অমঙ্গলজনক ঘটনার জন্যই বুড়ি যেন কোনো না কোনোভাবে দায়ী। এই পরিবারটির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মানিকের সবছোট ছেলে ৭/৮ বছরের রঞ্জন। সেই মাঝে মাঝে তার দাদির কাছে যায়। কী সব গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর করে। হয়তো রঞ্জনের কাছ থেকে বুড়ি সারাবাড়ির খোঁজখবর নেয়। তাদের এই হৃদ্যতার কারণ কেউ জানে না। যখনই কেউ দেখে ফেলে রঞ্জনকে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে, তৎক্ষণাৎ সেটা তার মায়ের কানে চলে যায়। আর তখন তার কপালে জোটে পিটুনি। তাই রঞ্জন সাধারণত দুপুরের দিকে কিংবা সন্ধ্যার দিকে সকলের অগোচরে তার দাদির কাছে যায়। দাদিকে তার বইয়ের কিচ্ছার দুয়োরানী বলে মনে হয়। দাদির কাছে গেলেই সে রাজ্যের গল্প শুনতে পায়, আর দাদির সংগ্রহের বিভিন্ন কৌটাও তার রহস্যের একটা বিশাল কারণ।

সারা গ্রামে যখন এই গু-ঘটনা নিয়ে বেচাল অবস্থা, রঞ্জন তখন একদিন তার দাদিকে বলে, ও দাদি, ঐ তালগাছের জ্বিন বুলে হামাকের ঘাটাত হাগে। সে কথা শুনে তার দাদি খিলখিল করে হাসে। রঞ্জন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কেন দাদি হাসে। দাদিকে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, দাদি আরো হাসে। শেষে তার দাদি বলে, যে জ্বিন হাগে, সে জ্বিনক হামি চিনি। সে হেসে উড়িয়ে দেয় দাদির কথা। আর তখন, তার দাদি তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, হামিই হাগি রে।

রঞ্জনের চোখ অবিশ্বাসে ছোট হয়ে আসে। তখন মর্জিনা বিবির কণ্ঠস্বরে বিষাদের ছড়া কেঁদে ওঠে। হয় রে, হামি। হামিই হাগি। ক্যান হাগি শুনবু। রঞ্জন শক্ত হয়ে যায় এই অস্বাভাবিক ঘটনায়। বুড়ি বলে, হামি মরে গেছি না ব্যাঁচা আছি তাই সুময়-সুময় বুঝবা পারি না। কেউ হামার খবর লয় না। সেজন্যিই হামি ঘাটাত হ্যাগা

রাখি। যখুন কেউ গু দেখা গ্যাল পাড়ে, তখন হামার মনে হয় যে হামি ব্যাঁচা আছি। বুঝিছু, খালি একন্যা অ্যানার জন্যিই হামি ঘাটাত লিত্তি রাতে হ্যাগা থুই।
রঞ্জন সে কথা শুনে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার করে তার মাকে ডাকতে থাকে, ও মা, মা। শুনা যা। দাদিই ঘাটাত হাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ি জেনে যায় মর্জিনা বিবির এই কুৎসিত কর্মটির কথা। বউরা চৌদ্দ পুরুষ তুলে গালি দেয় মর্জিনা বিবিকে। সন্ধ্যায় মানিক, রতন ও মল্লিক এলে তাদের বউরা শোনায় তাদের মায়ের এই কুৎসিত কর্মটির কথা। শুনে মানিক, রতন ও মল্লিকের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসে। তারা একযোগে তাদের মায়ের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ক্যা মা তুই লিত্তি হাগিস? ক্যান মা। মর্জিনা বিবি পাশ ফিরে শোয়। তাদের শত প্রশ্নের উত্তরে একটা টুঁ শব্দও করে না।

পরদিন সকালে আবারও কেউ একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় মর্জিনা বিবি, কুত্তা, কুত্তা, এটা কি ম্যানসের বাড়ি! কুত্তার বাড়ি! মর্জিনা বেগম তখন ছেড়া কাঁথায় শুয়ে মিটি মিটি হাসে।

শাহদত হোসেন

.....

ইদ্দিস

শুক্রবার দুপুরের দিকে জুমার নামাজ পড়ার জন্য ঢাকা শহরে উৎসবের আমেজ বয়ে যায়। বিডিয়ারের এক নম্বর গেটের কাছাকাছি জিগাতলার ছোট্ট এক গলিতে আমার বাসা; এই বাসার তিন গজ দূরে মাদ্রাসা কাম মসজিদের সামনেও প্রতি শুক্রবার দুপুরের সময় লোকজনের ভিড়ে ঐ রকম একটা উৎসব-উৎসব ভাব তৈরি হয়।

এক শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে টুথব্রাশ কেনার জন্য দোকানে যাব-যাব করে শেষে দুপুর গড়ালো। নানা ব্যস্ততার কারণে আমার নাস্তা পর্যন্ত করা হয়নি তখনো। হন্তদন্ত হয়ে টুথব্রাশ কেনার জন্য বাসা থেকে বের হই। রাস্তায় নেমে দেখি মসজিদের সামনে জুমার নামাজ পড়তে-আসা শত-সহস্র লোক। মসজিদ ভরে গেছে,

সামনের রাস্তায়ও জায়গা নেই, অনেকে জায়গা না-পেয়ে মসজিদের সীমানা ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে এসে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি লোকজনের ভিড় ঠেলে কোনোমতে মেইন রোডে আসি। দূর থেকে মনে হল, ধানমণ্ডি পনের নম্বরের কেয়ারি মার্কেট এখন হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য মার্কেটের একদম কাছে যাই; মার্কেট ঠিকই বন্ধ তবে পাশেই একটি টঙ দোকানে কলা-রুটির সঙ্গে ঝুলছে টুথব্রাশের একটি প্যাকেটও। দ্রুত ছুটে গিয়ে বলি, ভাই একটি দেন তো। মাত্র দশ টাকা দামে একটি চমৎকার টুথব্রাশ কিনে বাসায় রওনা হই। বাসার কাছে আসতেই দেখি, মুসল্লিরা নামাজ শেষ করে যে-যার বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আমার বাসায় ঢোকার সরু গলির মাঝ বরাবর টকটকা লালরঙা মসজিদটির গা ঘেঁষে পঞ্চাশ ছুঁই-ছুই বয়সী একজন লোক কী যেন করছে; মসজিদের মতো তার পরনেও টকটকা লাল রঙের শার্ট; মনে হল, বাচ্চাদের মতো একহাত দিয়ে এক-পা আলগোছে চেপে আরেক হাত দিয়ে অন্যহাতটি ধরে একপায়ে একা-একা মোরগ লড়াই খেলছে। একজন দূর থেকে চিৎকার করে বলল, এই মিয়া কী করতাছো? বিশাল শরীরের লোকটিও বেশ উচ্চস্বরে জবাব দিল, গাধা বোঝোস না, মোরগ লড়াই খেলতাছি? আমার ছায়ার সঙ্গে মোরগ লড়াই খেলতাছি! এরই মধ্যে বাসায় ঢোকার মুহূর্তে হঠাৎ শুনি, হাঁটু অবধি পাঞ্জাবি পড়া একজন লোককে সে ক্রমাগত বকে যাচ্ছে, "উপর দিয়া ফিট-ফাট তলদিয়া সদরঘাট! বাইরে ধবধবা জামা পড়লে কী হইবো আমরা তো জানি দেলের ভিতরে কী আছে।"

দেখি তো কে কাকে এই কথা বলে! কয়েক কদম পেছনে গিয়ে আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আপনি এই কথা কাকে বল্লেন?" সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, "আপনারে না আপনারে না, আপনি মিয়া এক সাপ্তা হইল ভাড়া আইছেন, আপনারে এই সব বলতে যামু কেন, আমি কি পাগল হইছি?" আমি যেন বাঁচলাম! বাসার লোহার গেটের নিচ দিয়ে যখন ঘাড় বাঁকা করে নিচু হয়ে ঢুকছি, তখনও লোকটির বকাঝকার শব্দ ক্রমাগত কানে ভেসে আসছিল, "পিছনে নামাজ পড়ি দেইখা ভাইবেন না আপনার হাতে সব তুইলা দিছি! হালা রাজাকার! এই এলাকার মানুষগুলা দেখি নৌকায় ভোট দেয়, আবার মসজিদের ইমাম রাখছে হেইডা একটা রাজাকার! নাহ্ এই এলাকায় আর থাকুম না। এই ড্রেনের ময়লার মতনই এইখানকার মানুষগুলা পইচা নষ্ট হইয়া গেছে। এই সমস্যা শ্যাকের মইধ্যেও ছিল; নিজে ছিল যুদ্ধের সোমায় পাকিস্তানে আর যারা এতো অপকর্ম করলো তাদেরগো দিলো ক্ষমা কইরা! মা-বইনগো ইজ্জত গ্যাছে তাতে তার কী, এতো মানুষ খুন অইলো তাতে তার কী! তার ফ্যামিলির তো কেউ ইজ্জত হারায় নাই, এতো বড় যুদ্ধ হইল তার ভাইব্রাদাররাতো একজনও যুদ্ধে মারা যায় নাই..."

দুই

পরের শুক্রবার খুব ভোরে ঘুমের মধ্যে কার যেন গালাগালির শব্দ কানে ভেসে আসে। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে বয়সী একজন মানুষ এভাবে চিৎকার করে এতটা কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করতে পারে। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি বোঝার জন্য যে লোকটা কাকে, কেনই-বা গালি দিচ্ছে। গলির হালকা অন্ধকারে লোকটাকে দেখি ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করছে আর ক্রমাগত গালিগালাজ করছে। আমি অবাক হলাম যে, এত ভোরে লোকটি এইভাবে ড্রেন পরিষ্কার করছে কেন! তাকে তো দেখে সুইপারও মনে হয়নি। একজন সুইপারেরও তো এভাবে গালি দেয়ার কথা নয়!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্য কোনো মানুষজন চোখে পড়ল না। খানিকটা রহস্য নিয়ে ঘুম-ঘুম চোখে বিছানায় গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

বেলা এগারটার দিকে আমি আর আমার বউ অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম; বাসায় ফিরেছি রাত দশটায়। বাসায় ফিরে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আবার বাইরে যেতে হল লেবু, ধনেপাতা আর বোম্বাই মরিচ কেনার জন্য। এসব কিনে বাসার কাছাকাছি আসতেই কে যেন মসজিদের দিকের দেয়াল সংলগ্ন ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে ফিক-ফিক করে হেসে উঠল। অন্ধকারের ভেতর থেকে বলে ওঠে, "শোনেন ভাই শোনেন, শালা খানকির পুত আমার জীবনডা ঝালাফালা কইরা ফালাইছে" আমি বললাম, কার কথা বলছেন? আবার বলে ওঠে, "আমার বাড়িঅলা, বিশ্বাস করেন ভাই, শালায় নাকি মুক্তিযোদ্ধা ছিল কিন্তু বেশ্যার বাচ্চায় রাজাকারের চাইতেও খারাপ"। আমি বললাম, এই কথা কেন বলছেন?– "জানেন না ভাই, এই যে রাস্তা পরিষ্কার করি ড্রেনের ময়লা সাফ করি সেই জন্য আমাকে একটা বেলা ভাতও খাবার দেয় না। ওই শালায় তো দেয়ই না, অন্য বাড়িঅলারাও দুইডা পয়সা দেয় না, সব শালা হারামজাদা।

– আপনি তাহলে ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করেন কেন?

– (নিজের গা চুলকাতে চুলকাতে) কী করমু ভাই, ময়লা সাফ করা তো আমার নেশা। নোংরা কিছু আমি দেখবার পারি না, ছোটবেলা থিকা ময়লা আমি সহ্য করবার পারি না।

– আমি একটু আগে বাইরে থেকে ফিরেছি তো, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করি? এখন যাই...

বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে এসেছি ঠিকই কিন্তু লোকটার কথাগুলো কোনোভাবেই মন থেকে সরাতে পারছি না। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও শেয়ার করলাম যে, ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করা কীভাবে একজন লোকের নেশা হতে পারে! সাথে সাথে আমাদের বাড়িঅলাকে ফোন দিয়ে লোকটির রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আমাদের বাড়িঅলা আমার অবগতির জন্য জানালেন, " ওর নাম মো. ইদ্রিস আলী, সবাই ডাকে ইদ্দিস বলে। রাস্তা এবং ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করা সত্যিই ওর নেশা। এমনকি এর

বিনিময়ে সে কিছু আশাও করে না। এই এলাকায় সে বহুদিন ধরে আছে– দিনে কোনো এক অফিসে চাকরি করে হয়তো, রাতে এই গলির শেষ বাড়ির একটি খুপরিতে ঘুমায়। এত বয়স হয়েছে তবু বিয়ে করেনি। তবে ভাই, লোকটার মুখ কিন্তু ভীষণ খারাপ, নোংরা-ময়লা সাফ করা যেমন ওর নেশা, তেমনি নোংরা ভাষায় সারাক্ষণ গালিগালাজ করাও ওর বদ্ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আপনারা কিন্তু ওর গালিগালাজে মাইন্ড কইরেন না।" আমি বললাম, "ওর গালিগালাজে আপনারা মাইন্ড করেন না?" উনি জবাব দিলেন, "বিনা বেতনে গলিটা এভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে যে রাস্তায় ভাত রেখে যেন ভাত পর্যন্ত খাওয়া যায় আর দেখেন ড্রেনটাও কী ভীষণ পরিষ্কার রাখে– নিচু জায়গা হওয়া সত্ত্বেও ওর কারণে এখানে একটু পানি পর্যন্ত জমতে পারে না। এসব কারণে ইদ্দিস গালি দিলেও আমরা সবাই সহ্য করি।

তিন

এর কয়েক সপ্তাহ পর এক শুক্রবারে সকাল আটটার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে ওই গলি দিয়ে যাচ্ছি। খালি গায়ে লোমাবৃত বুকে কাঁচা হলুদের মতো রঙমাখা লোকটি– একটা হাঁটু রাস্তার কংক্রিটে ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে ড্রেন থেকে কাদাটে ময়লা তুলে পাশে স্তূপ করে রাখছে। হঠাৎ আমাকে দেখা মাত্র দ্রুত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি যেন তাকে দেখিনি এমন ভান করে চলে যেতে লাগলাম।
– ভাইজান, সালাম দিছি কিন্তু!

আমি তারপরও যেন তার কথার কিছুই বুঝছি না।

– ভাইজানের কি মনটা খারাপ?
– না তা নয়। আসলে আমার একটু তাড়া আছে– এই কথা বলে দ্রুত প্রস্থান নিলাম।

বাইরে যে-কাজে গিয়েছিলাম সে-কাজ হল না, কারণ ফ্রিজের মিস্ত্রি স্পটে নেই; সে ফিরলে মালিক তাকে ফ্রিজটা দেখার জন্য পাঠাবে। কিছুটা মন খারাপ নিয়ে দ্রুত গলি পার হচ্ছি। এমন সময় ইদ্দিস ভাই জোরে বলে ওঠে–
– ভাই, আপনি নাকি কবিতা গল্প নেহেন? আমাকে নিয়া একটা গল্প নেকতে পারবেন?
– ইদ্দিস ভাই, আপনার বলার আগেই ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে একটি গল্প লিখব।
– নেহেন ভাই, এই জীবনে মা-বাবা, ভাই-বোইন কেউ নাই। আমার একা জীবন। এতো কষ্ট আমার, আল্লায় যে আমারে কেন নেয় না!
– ধু মিয়া এই সব কী বলেন?
– সত্যি কইতাছি ভাই।
– আপনার স্ত্রী নাই? সন্তান নাই?

– (অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল) ভাই যে কী কয়, এই চাল-চুলা ছাড়া একটা মানুষকে কে বিয়া করবো?
– আচ্ছা আপনি যে এতো কষ্ট করে ড্রেন পরিষ্কার রাখেন সে-জন্য বাড়িঅলারা আপনাকে কিছু কিছু করে টাকা দিতে পারে না?
– সেই কথা আর বইলেন না। ওরা আবার মানুষ নাকি! আমাকেও মানুষ বইলা মনে করে না। কুকুরে যেমন নোংরা খাবার খেয়ে ড্রেন পরিষ্কার করে আমাকেও ওরা কুকুরের মতো মনে করে।

আমার পকেট থেকে একশ টাকার একটি নোট বের করে বলি, এই টাকাটা রাখেন কিছু কিনে খাবেন।
– মিয়া ভাই'র তো দেখি মাথায় সমস্যা আছে। আপনার বাড়িঅলা একটা পয়সা দেয় না আপনি কেন টাকা দেবেন? আমাকে ভাই আপনিও বুঝতে পারলেন না! আমি কিন্তু জমিদার বংশের ছেলে। আমার দাদার বাবা বড় জমিদার ছিল। আমি কিন্তু মেথর না, আমি বড় কোম্পানিতে চাকরি করি, আমাকে কী মনে করলেন? আমি কি রাস্তার ফকির নাকি? ময়লা ছাফ করা আমার নেশা, সখে বুঝলেন সখে এইগুলা করি। আমি কিন্তু হাত পাতার মানুষ না...

আমি মোটামুটিভাবে বোল্ড হয়ে আর কথা না-বাড়িয়ে টাকাটা নিজের মানিব্যাগে রেখে দ্রুত বাসায় ফিরে এলাম...

চার

একরাতে কোনোভাবেই আমার ঘুম আসছিল না, ঘুমের স্বল্পমাত্রার টেবলেট খেলাম তারপরও ঘুম আসল না। কী আর করার, সারারাত লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। শেষরাতে যখন আজান দিয়েছে তখন ঘুম আসল... দ্রুত গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ কীসের যেন খসখস শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে পারিনি এই বাজে শব্দগুলো কীসের, পরে বুঝতে পারি রাস্তায় কেউ ঝাড়ু দিচ্ছে, সেই ঝাড়ু দেয়ার শব্দই কানে এসে লাগছে। প্রতি ভোরে এই সময়টাতে ইদ্দিস রাস্তা ঝাড়ু দেয়, অন্যদিনগুলোতে গভীর ঘুমে থাকি বলেই হয়তো সেই শব্দ টের পাই না। কিন্তু আজ রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার শব্দে সত্যিই ওর ওপর বিরক্তি তৈরি হচ্ছে। নিচতলার রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছে আর তিনতলায় আমার কানে ভেসে আসা শলার খস-খস শব্দ কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছি না। বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে মৃদু স্বরে বললাম,
– ইদ্দিস ভাই ঝাড়ু দেয়া কি আপাতত বন্ধ করা যায়? ঝাড়ুর শব্দে আমি ঘুমাতে পারছি না।

– তাই নাকি? বলেন কি? তিনতলায় ঝাড়ুর শব্দ যায়? ঠিক আছে আপনি শান্তি মতন ঘুম পাড়েন, বেলা উইঠা সারলে তখন আমি ঝাড়ু দেবানে।

মুহূর্তের মধ্যে সে ঝাড়ু দেয়া বন্ধ করে দিল। আমি বিছানায় গিয়ে নাক ডেকে বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমালাম।

আজ শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না তাই বাইরে বের হইনি। সারাদিন বই পড়ে পত্রিকা পড়ে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার পরে আমার স্ত্রী আর আমি হাঁটতে বেরিয়েছি। হাঁটা শেষ করে ওই গলি ধরে বাসায় প্রবেশ করছিলাম, এমন সময় ইদ্দিস পেছন থেকে ডাকল,
– ভাই আমার কারণে আপনার ঘুম কি প্রতিদিনই নষ্ট হয় নাকি আইজই নষ্ট হইল?
– নানা প্রতিদিন না, আজই...
– আমি সত্যিই লজ্জিত ভাই। আর এরকম হবে না।
– এরকম হবে না মানে? আর ঝাড়ু দেবেন না?
– ঝাড়ু দেব, একটু বেলা উঠলে দেব, তাইলে তো আপনার ঘুম আর নষ্ট হইব না। আরেকটা পারি ছনের ঝাড়ু দিয়া ঝাড়ু দিতে– তাতে আপনি ঘুম পারবেন ঠিকই কিন্তু রাস্তার ময়লা ছনের ঝাড়ুতে একটুও পরিষ্কার হইব না। রাস্তার কইলজার মাঝখান থিকা ময়লা বাইর কইরা আনা লাগে– শলার ঝাড়ু ছাড়া এইডা সম্ভব না।
– ইদ্দিস ভাই, আমার স্ত্রী এতক্ষণে বাসায় চলে গেছে, আমি যাই, পরে কথা হবে।
– ভাবী বাসায় চলে গেছে ভালো হইছে, এখন নিরিবিলি শোনেন। মিয়া ভাই দুঃখের কথা, আমি মুখের ওপর উচিত কথা বলি তো সেই কারণে আমাকে এই বাড়ির বাড়িঅলা বাসা থিকা বাইর কইরা দিছে। আইজ রাইতে এই রাস্তায় ঘুমাইতে হইব।
– বলেন কি?
– হ্যারে ভাই আমি কি মিথ্যা কথা বলতাছি? রাস্তা সাফ করার মতন শালাগো কইলজার ভিতর থিকা যদি ময়লা সাফ করবার পারতাম তাইলে শালারা ভালো হইয়া যাইত! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে– যান ভাই যান– ভাইরে দেরি করাইয়া দিলাম।

আজ রাতে একজন 'ইদ্দিস' কোথায় কীভাবে যে ঘুমাবে কোথায় খাবে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আর দশজনের মতোই এড়িয়ে আমিও বাসায় চলে এলাম...

পাঁচ

পরের দিন সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি কিন্তু রাতভর বৃষ্টি থাকায় আজও বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনো রিক্সা ডাকা যায় কি-না চেষ্টা করলাম। এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে বৃষ্টির তোড়ে কাছের জিনিসকেও আবছা দেখাচ্ছে। রিক্সার মতো মনে হলেও অনুমানের ওপর ভর করে

ডাক দেয়া মাত্র সাঁই করে টান দিয়ে চলে যায়, এতো জোরে 'এই রিক্সা এই রিক্সা' বলে ডাকি কিন্তু বৃষ্টির শব্দ এত বেশি যে, আমার ডাক হয়তো রিক্সাঅলারা শুনতেই পাচ্ছে না।

আমি প্যান্ট-শার্ট পড়া অবস্থাতেই বিছানায় অর্ধ টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ি। একটু গড়াগড়ি দিয়ে অফিসের কাজের কথা ভেবে শোয়া থেকে হঠাৎ উঠে কী এক তাড়নায় পায়চারি করতে থাকি। এক সময় জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। আমার দৃষ্টি নিচের গলির ওপর পড়া মাত্র লক্ষ করলাম, ইদ্দিস মসজিদের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে– এক পা মাটিতে আরেক পা মসজিদের গায়ে ঠেস দেয়া। নিচের দিকে বৃষ্টির পতনোম্মুখ ঘন ফোঁটার দিকে ইদ্দিসের দৃষ্টি যেন আটকে আছে। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না এভাবেই সারা রাত কাটিয়েছে ওখানে। রাত থেকে এই অব্দি হয়তো পেটেও পড়েনি কিছু।

তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে 'ইদ্দিস ভাই' বলে ডাক দিলাম। দ্বিতীয় ডাকে মাথা উঁচু করে তাকাল আমার দিকে।
– ভাই সারাটা রাত মশায় কামড়াইয়া শ্যাষ কইরা ফালাইছে। আপনার সঙ্গে একটু কথার দরকার ছিল, আপনি কি একটু নিচে নামবার পারবেন?
– হ্যাঁ, এক্ষুণি নিচে আসছি।

একটি ছাতা নিয়ে প্যান্টের বর্ডার তুলে প্রচণ্ড বৃষ্টির ভেতর ইদ্দিসের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

– ইদ্দিস ভাই কী খবর বলেন?
– ভাই আমারে তো বাড়ি থিকা বাইর কইরা দিছে– সেইটা তো আপনাকে বলেছি। রাতে হইছে কি, ঘুমে দেখি পইরা যাই, শেষে ওই সিঁড়ির ওপর একটু কাইথ হইছিলাম। ভাইরে ভাই অনেক রাতে পেছন থিকা কে যেন আমাকে খালি লাথি মারতাছে। দুই-তিন জনের ধাক্কা-লাথির চোটে আমি গড়াগড়ি খাইতে খাইতে সিঁড়ির নিচে পইরা গেছি। বুকে ভীষণ চোট লাগছে! বড় ব্যথা করতাছে। আপনার পরিচিত কোনো ডাক্তার আছে?

ওদিকে প্রবল বৃষ্টির কারণে রাস্তায় একহাঁটু পানি জমে গেছে। ইদ্দিস সকালে ড্রেন পরিষ্কার না-করায় পানি সরছে না। ময়লা পানির ভেতর দিয়ে বাড়িঅলা এক হাত দিয়ে লুঙ্গি উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে ইদ্দিস আর আমার পাশ দিয়ে। ইদ্দিসের দিকে একবারও তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না। আমাকে দেখে জানতে চাইল আমি কেমন আছি। জবাবে জানালাম, ভালো আর থাকি কী করে? আমার এমন প্রশ্নের

তাৎপর্য নিশ্চয়ই 'উনি' বুঝতে পেরেছেন। মাথা নিচু করে কোনো প্রত্যুত্তর না করে চলে গেলেন।

ছয়

বাড়িঅলা বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পরও ইদ্দিসের যাওয়ার কোনো জায়গা না-থাকায় ওই বাড়িরই সিঁড়ির নিচে এখনও অসহায়ভাবে রাতে ঘুমায়। আমার পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি বিনা পয়সায় প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়েছেন– ওষুধের ওই বিশাল তালিকার ওষুধগুলো আমি পরের দিন কিনে দিয়ে বললাম, আপনার মুখটাকে একটু নিয়ন্ত্রণ না-করলে সিঁড়ির নিচেও তো আপনাকে থাকতে দেবে না।

– ভাই, আমি আসলে এইখানের মায়া ছাড়তে পারতাছি না। পনেরো-ষোলো বৎসর যাবত থাকি তো, ছাড়তে মায়া নাগে। তারপরও এইখানে আর থাকুম না, যামুগা!

– যা ভালো মনে করেন সেটাই কইরেন। আমি এখন যাই...

– আচ্ছা ভাই ভোট দিবেন কারে? সামনে তো নির্বাচন!

– আমি ভোট দেই না।

– আমিও দেই না। তয় এইবার নৌকায় ভোট দিমু রাজাকার ঠেকানোর জইন্য। আমি তো আওয়ামী লীগ করি না, তারপরও নৌকায় ভোট দিমু। আর খালেদা জিয়া কত্ত বড় বেক্কল, দেখেন পনের আগস্ট তার জন্মদিন বানাবার কী দরকার ছিল? এই জন্য খালেদারে আমি দেখবার পারি না। এত্তো সুন্দর মহিলা অথচ মনটা দেখেন কত খারাপ।

– আপনার এতো প্যাচাল ভালো লাগছে না, আমার হাতে একেবারে সময় নেই, ইদ্দিস ভাই আমি যাই...

– ভাই আর দুইডা কথা শোনেন, আমি কোন্ পার্টি করতাম জানেননি? আমি করতাম সিরাজ শিকদারের পার্টি। বঙ্গবন্ধু নাকি তাকে হত্যা করছে এইডা কি ঠিক?

– আমি এক মূহুর্তও থাকতে পারছি না। এই বলে তার হাত থেকে আমার হাত মোচড় দিয়ে ছুটিয়ে দ্রুত চলে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সামনে এসে দুই হাত দিয়ে বেড়া দিয়ে আমার পথ আগলে রেখে আবার বলতে শুরু করে–

– আচ্ছা ভাই আপনি কি রাজনীতি বোঝেন না? আপনি যে প্রশ্ন করলেন না, আমি সিরাজ শিকদারের মতের মানুষ হইয়াও কেন নৌকায় ভোট দিমু। শোনেন ঢাকার পলাশীতে বুয়েট আছে না, ইঞ্জিনিয়াররা যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে– অনেক আগে একদিন সেইখানে দেখি সিরাজ শিকদারের বোইন শামীম শিকদার শ্যাকের মূর্তি বানাইতাছে। ভাইরে ভাই এত্তো উপরে শ্যাকেরে ফিট করছে আর বড় বড় বুদ্ধিজীবী কবি গায়ক নেতা সবাইকে রাখছে নিচে। বলেন তো শামীম শিকদারের ভাইরে যেই লোকটা মারলো সেই লোকটার মূর্তি কীভাবে সে বানায়? আর শ্যাকেরে উপরে

উঠাইছে ভালো কথা কিন্তু এত্তো উপরে উঠাইছে– দেখতে গেলে ঘাড়ে ব্যথা লাগে। বিষয়ডা আমার ভালো লাগে নাই...

– এই মিয়া আপনি তো আজ আমার সব কাজ নষ্ট করে ফেলবেন! এত বেশি বেশি কথা বলেন, এগুলো শুনতে গেলে আমার এক জীবনে হবে না, আরও একটা জীবন দরকার হবে। আমি যাই... এই বলে খানিকটা কৌশলে পাশকাটিয়ে দৌড় দিয়ে কেটে পড়ি...

সাত

এর পর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত এই গলিতে ইদ্দিসকে দেখিনি। বহুদিন যাবত কেউ আর গলিতে ঝাড়ুও দেয় না। অনেক দিন ধরেই ইদ্দিসের গালিগালাজের আওয়াজে আমাদের মধ্যে এক ধরনের অভ্যস্ততা এসে গিয়েছিল; এখন সেই গালির আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। ইদানিং সামান্য বৃষ্টি হলেই গলিতে বেশ পানি জমে যায়, ড্রেন থেকে মানুষের মল বৃষ্টির পানিতে ভেসে ওঠে। স্যান্ডেল-জুতা খুলে প্যান্টের বর্ডার হাঁটু পর্যন্ত তুলে ময়লা পানির ভেতর দিয়ে বাথরুমের দলা-দলা পায়খানার পাশ দিয়ে চোখ-নাক বন্ধ করে যেতে হয়।

এই গলির অন্য সব ভাড়াটিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ বাসা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আমি আর আমার স্ত্রীও অন্যত্র বাসা খুঁজছি কিন্তু বাসা ছাড়ি-ছাড়ি করেও এভাবে প্রায় বছর দেড়েক সময় পার করে দিতে হল। গলিটির যে হাল হয়েছে তাতে এখানে বাস করায় প্রমাণিত হয় এই শহরে আমরা কতটা অসহায় হলে এখান থেকে ভালো কোনো জায়গায় যাওয়া আমাদের সম্ভব নয়! এই এলাকার ময়লা পানির সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে বিদ্যুতের লোডশেডিং, গ্যাসও সারাদিন প্রায় থাকে না, শেষ রাতের দিকে গ্যাস আসে আবার সকাল সাতটার আগেই চলে যায়। পানির লাইনও সংযুক্ত হয়ে গেছে সুয়ারেজ-এর পাইপের সঙ্গে; পানি থেকে মল-মূত্রের গন্ধ আসে।

এতকিছুর পরও এই গলির এই বাসাটি ছেড়ে দিতে পারছি না অন্যত্র বাসা না-পাওয়ার কারণে। প্রায় প্রতিদিন বউয়ের সঙ্গে এ নিয়ে ছোট-খাট ঝগড়া বাধে। বাসা বদল নিয়ে অশান্তি যেন স্থায়ী বাসা বেঁধেছে আমাদের সংসারে। তারপরও এভাবেই দিন সপ্তাহ মাস কেটে যাচ্ছে। জানি না এর শেষ কোথায়। প্রায়ই মনে হয় ইদ্দিস ভাই এই গলিতে থাকলে অন্তত সুয়ারেজের লাইন আর পানির লাইন এক হয়ে যেত না, ময়লায় রাস্তা আর ড্রেন এভাবে চিরদিনের জন্য আটকে যেত না! মাঝে মধ্যে খুব আফসোস হয় লোকটার জন্য...

একদিন বিকেলের দিকে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম; হঠাৎ কে যেন আমার ডান হাতখানা মুঠি করে ধরে ফ্যালে। প্রথমে চমকে উঠি; পরে তাকিয়ে দেখি ইদ্দিস ভাই।

– ইদ্দিস ভাই কেমন আছেন?
– ভালা নাই ভাই!
– কেন?
– পনেরো ষোলো বৎসর ধরে ওই গলিতে ছিলাম। বাড়ি থিকা আমাকে বাইর কইরা দিল, অন্য একজন বাড়িঅলাও প্রতিবাদ করল না– সেই বাড়িতে আমি কী কইরা থাকি? ওই গলিটাতে আমার কত স্মৃতি– বলেন তো ভালো থাকি কী করে?
– আপনি না থাকাতে গলিটা তো এতদিনে ডাস্টবিনে পরিণত হয়ে গেছে আর ড্রেনে পলিথিন আর ময়লা জমে ড্রেন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি জমে যায় আর সেই পানিতে বাথরুমের ময়লা ভাসতে থাকে– তার মধ্য দিয়েই বাসায় যেতে আসতে হয়।
– দাদা ভাইরে, পুরা দেশটাই তো একটা ডাস্টবিন হয়ে গেছে– এই দেশের মানুষ কি মানুষ আছে! মোসলমানদের ঈমান নষ্ট হইলে মলমূত্রের চাইতেও খারাপ হইয়া যায়। আমরা একাত্তরে পাকিস্তান থিকা স্বাধীন হইলাম আমরা বাঙালি বইলা আর সাতচল্লিশ সনে ভারত থিকা স্বাধীন হইছিলাম আমরা মোসলমান বইলা, তাই না? কিন্তু এই কি মোসলমানের চরিত্র? আমরা একটা কুত্তার জাত!

ইদ্দিসের সেই প্যাচালের অভ্যাস একটুও বদলায়নি। বিরক্তিকর বাচনভঙ্গি আর চিৎকার করে ওর কথা বলার ধরন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদায় নিতে চাইলাম,
– ইদ্দিস ভাই আপনি থাকেন কোথায়– এই প্রশ্নের জবাব না-পেতেই আবার বলি, ভাই এখন যাই, পরে আবার দেখা হবে, যাই, না...?
– (আমাকে কোনো রকম বিদায়সূচক আচরণ না-দেখিয়ে) আমার আবার থাকা! কোনোদিন মসজিদে কোনোদিন মন্দিরে আবার কোনোদিন রাস্তায় ঘুমাইয়া থাকি।
– আচ্ছা যাই, ভালো থাইকেন...
– এতোদিন পর দেখা, এতো যাই যাই করেন কেন? ভাই আপনার কেনা ওষুধ তো খাইলাম কিন্তু এতোদিন হইল বুকের ব্যাদনা তো সারল না...। আচ্ছা ভাই একটা কথা বলি মাইন্ড করবেন না তো? শ্যাক সাহেবের খুনিদের তো ফাঁসি হইল, তাই না? জাতি একটা কলঙ্ক থিকা মুক্তিও পাইল। কিন্তু সিরাজ শিকদারের খুনি নাকি শ্যাক সাহেব নিজেই– তাইলে সেই বিচার কে করবে?
– ইদ্দিস ভাই আমার তাড়া আছে আমি যাই, ভাই ভালো থাইকেন...

আট

গত বর্ষায় এ বাসায় কোনো মতে থেকেছিলাম। এবার বর্ষা শুরু হতে না হতেই অবস্থা বেগতিক ঠেকছে। এক বৃষ্টিতেই পানি স্থায়ী বাসা বেধেছে পুরো গলি জুড়ে। সেই পানিতে মানুষের তাজা মল ভাসছে। দুদিন দেখেছি তিন-চারজন লোককে বাঁশের চটি

দিয়ে ড্রেনের ভেতরে খোঁচাখুঁচি করতে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। প্রায় এক হাঁটু পানি কোনোদিকে সরছে না, সম্ভবত পুরো ড্রেন ময়লা পলিথিন আর কাদায় বন্ধ হয়ে গেছে। গলিটি অনেকটা নিচু অবশ্য, পানি জমে থাকার সেটিও একটি কারণ। ইদ্দিস প্রতি শুক্রবার এই সব ময়লা তুলে মেইন ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসত। ইদ্দিস চলে যাওয়ার পর এতগুলো মাস পার হয়েছে, এরপর কেউ তো এক কোদাল ময়লাও ড্রেন থেকে তুলে অন্যত্র ফেলেনি! সেই ময়লাই কাল হয়েছে। বর্ষার ঘনবৃষ্টি শুরু হলে ময়লা পানি গলি উপচে আশপাশের বিল্ডিংগুলোর নিচতলা পর্যন্ত সয়লাব হয়ে যেতে পারে। সেই ভয়ে ইতোমধ্যে নিচতলার দু'তিন ভাড়াটিয়া বাসা ছেড়ে দিয়েছে। নিচতলার বাসাগুলোর জন্য টু-লেটও দেয়া হয়েছে কিন্তু ময়লা পানির ভয়ে কেউ ভাড়া নিতে আসছে না। বাড়িঅলারা ড্রেন পরিষ্কারের জন্য কোনো চেষ্টা যে করছে না, তা বলা যাবে না। তবে খুব নজর যে এদিকটাতে তাদের আছে তা-ও মনে হচ্ছে না। কারণ বাড়িঅলারা প্রায় কেউই এখানে থাকে না, তারা এগুলো ভাড়া দিয়ে অন্যত্র ফ্ল্যাট ভাড়া কারে থাকে। মাসের চার-পাঁচ তারিখে এসে ভাড়া নিয়ে চলে যায়। এছাড়া কালেভদ্রে হয়তো এদিকে তারা আসে কিংবা কোনো কোনো শুক্রবারে নামাজ পড়তে এই মসজিদে আসে। এই গলির কোনো সমস্যা নিয়ে বাড়িঅলাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও তাদের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং নানান সমস্যার কারণে আমিও-যে অন্যত্র বাসা খুঁজছিলাম, সেই বাসা একসময় পেয়েও যাই এলিফ্যান্ট রোডে।

নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ঠিক করে বাসার জিনিসপত্র নামিয়ে ভাড়া করা পিকাপ ভ্যানে বাসার মালপত্র তুলতে থাকি। পিকাপে মাল তোলা শেষ হলে আমি আর আমার স্ত্রী পিকাপের জিনিসপত্রের একপাশে দাঁড়িয়ে কাচে বাঁধানো চে'গুয়েভারার ছবিটি এবং ফিদেল কাস্ত্রোর ছবিটি সতর্কতার সঙ্গে ধরে রাখি, যাতে কাঁচ ভেঙে না যায় বা ছবিগুলোর কোনো ক্ষতি না হয়। পিকাপ ভ্যানটি জিগাতলা ছেড়েছে, যাবে এলিফ্যান্ট রোডে। জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মোড় দিয়ে বেরিয়ে বিডিয়ারের এক নম্বর গেটের সামনে দিয়ে আমাদের পিকাপ ভ্যানটি যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটি বাস এসে জোরে ধাক্কা দিল, আমি আর আমার স্ত্রী ভীষণ একটা ঝাঁকুনি খেলাম। আমাদের ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বুঝতে পারলাম আমি আর আমার স্ত্রী কাত হয়ে জিনিসপত্রের উপর পড়ে গেছি এবং তাতে ভীষণ ব্যথা পেয়েছি। দুজনের হাতের ছবি দু-টি ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে! আমরা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের ড্রাইভার নেমে এসে বাসের ড্রাইভারকে দু-একটা ধমক দিচ্ছিল অমনি বাসটি টান মেরে চলে গেল। ড্রাইভার বোঝার চেষ্টা করল আমাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে কি-না; এরপর সে হয়তো ভাবল আমরা ঠিক আছি এবং সে নিজের সিটে গিয়ে আবার পিকাপে স্টার্ট দিল। স্টার্ট দেয়া মাত্র আমি আর আমার স্ত্রী লক্ষ করলাম, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ র‍্যাব-এর কয়েকজন কুচকুচে কালো পোশাকের

সদস্য রাস্তার ওপারে বিডিয়ারের এক নম্বর গেটের কাছ থেকে ইদ্দিসকে টেনেহিঁচড়ে তাদের গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। আমরা আমাদের ড্রাইভারকে চিৎকার করে পিকাপ ভ্যান থামাতে বললাম। আমাদের গাড়ি থামামাত্র আমরা দুজন লাফ দিয়ে পিকাপ থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে বিডিয়ারের এক নম্বর গেটের কাছে গেলাম। র‍্যাব ততক্ষণে ইদ্দিসকে তাদের গাড়িতে তুলে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। বিডিয়ারের এক নম্বর গেটে দায়িত্বরত জোয়ানদের বললাম,

– র‍্যাব টেনেহিঁচড়ে তাদের গাড়িতে যাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল সে আমাদের পরিচিত। আমাদের বাসা সংলগ্ন গলিতে সে থাকত। কিন্তু তাকে এভাবে ধরে নিল কেন?

– আচ্ছা আপনারা বলুন তো তার নাম কী?

– মো. ইদ্দিস আলী। সবাই অবশ্য ইদ্দিস বলে ডাকে।

– হ্যাঁ, নাম ঠিক আছে।

– কিন্তু তাকে র‍্যাবের লোকেরা ধরে নিল কেন?

– গত বছর বিডিয়ার বিদ্রোহের সময় জোয়ানদের পক্ষে সাধারণ মানুষদের অনেকেই এই গেটের কাছে মিছিল করেছিল। সার্কিট ক্যামেরায় দেখা গেছে এই লোকটিও মিছিলকারীদের মধ্যে ছিল। সেই কারণেই র‍্যাব তাকে বহুদিন ধরে খুঁজছিল।

– কিন্তু সে অপরাধ করলে তাকে তো পুলিশের ধরার কথা? র‍্যাবের সদস্যরা ধরল কেন?

আমাদের কথোপকথন শুনে একজন বয়স্ক শিক্ষিত গোছের লোক দাঁড়িয়ে পড়লো। অনুমতি ছাড়াই আমাদের কথার মধ্যে উনি ঢুকে পড়লেন। আমার প্রশ্ন শুনেই দায়িত্বরত বিডিয়ার জোয়ানদের সুযোগ না-দিয়ে উনি নিজেই বলতে লাগলেন,

– পুলিশে ধরলে তো ভালোই হতো। বিচার পাওয়ার একটা সুযোগ হয়তো তাহলে থাকত। র‍্যাবের হাতে ধরা পড়াতে বিচারের আর আশা নাই। ওর জীবন তাহলে ধরে নেন গেছে...

– আচ্ছা, ইদ্দিস কি স্বীকার করেছে যে সে-ও মিছিল করেছিল?

– হ্যা সে পরিষ্কারভাবেই তা স্বীকার করেছে...শুধু তাই নয়, সে বিডিয়ার বিদ্রোহের পক্ষে একটু আগেও চিৎকার করে অনেক কথা বলছিল।

– কিন্তু ইদ্দিস তো একটু মেন্টালি ইমব্যালেন্সড্?

– ভাই সেটা আমরা জানি না। সেটা যারা ধরেছে তারা বুঝবে...

– আচ্ছা সে যেহেতু স্বীকার করেছে, তার কী ধরনের শাস্তি হতে পারে?

– আমরা জানি না! আপনারা এখন আসুন...

পথচারি বয়স্ক শিক্ষিত লোকটি আবার বলে উঠল,
– ওর পরিণতি কী হবে এখনো তা বুঝতে পারছেন না?

আমি আর আমার স্ত্রী যেন মূহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হয়ে গেলাম! আমরা মাথা নিচু করে আমাদের পিকাপ ভ্যান রাস্তার যে-পারে দাঁড়িয়ে আছে, সে-পারে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলাম; নতুন বাসায় পৌঁছে জিনিসপত্র সাজাতে হবে। পরের দিন আবার দু-জনেরই অফিস আছে। ভীষণ তাড়া আমাদের...

০১ মে ২০১০

প্রকাশিত গল্পের আলোচনা

.....

হা মী ম কা ম রু ল হ ক

[গল্পকারদের নাম গোপন রেখে 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে' ও 'ইদ্দিস' গল্প দু'টি আলোচনার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক, সমালোচক হামীম কামরুল হককে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে গল্প দু'টি আগাগোড়া পাঠ করে তিনি নিচের আলোচনাটি লিখে দিয়েছেন 'গোলাঘর'-এ ছাপার জন্য। শ্রমলব্ধ কাজটি করে দেয়ার জন্য আলোচককে জানাই ধন্যবাদ। আশা করা যায়, এই আলোচনা অন্তত গল্পকার-ব্যক্তির প্রভাব-নিরপেক্ষ হয়েছে। গল্প দু'টি এবং এর ওপর আলোচনাটি কেমন হয়েছে, সেই বিচারের ভার অবশ্য বর্তায় শেষপর্যন্ত পাঠকের ওপর।]

০১.
বেঁচে থাকাকে পরীক্ষা করার গল্প কিন্তু...

মানুষ নিজের বেঁচে থাকাকে কতভাবেই-না পরীক্ষা করতে পারে। সেই কত হাজার বছর আগে সক্রেটিসের বলা কথা, অপরীক্ষিত জীবন যাপন করারই যোগ্য নয়। এর

একটা সামগ্রিকতা আছে। আর এর পেছনে আছে নিজেকে জানার চিরন্তন প্রয়াস। লেখার বিষয় যেকোনো কিছুই হতে পারে। চেখভ বলেছিলেন তিনি যে তিনি স্রেফ একটা কমলালেবুকে নিয়ে গল্প লিখতে পারবেন। লেখার নামে আমরা নানান সংস্কার লালন করি। লেখার আগে কি লেখার মধ্য দিয়ে আমরা যেখানে প্রচলিত অনেক অলীক বাস্তবতা থেকে, সংস্কার থেকে মুক্ত হব, সেখানে লেখাই হয়ে ওঠে সংস্কারের আগার। কী নিয়ে লেখা যাবে, আর কী নিয়ে যাবে না এটা অনেকেই পুষে রাখেন। শরীর সংক্রান্ত বিষয়াদি আমাদের এই ছুৎমার্গীয় প্রবণতার একটি। কেউ কেউ যৌনতা নিয়ে লেখালেখি গাইনিকোলজির বিষয় মনে করেন। কেউ প্রেম নিয়ে লেখালেখিকে মনে করেন মধ্যবিত্ত প্যাঁচপ্যাঁচানি। এসব আদতে নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টামাত্র। লেখার বিষয় যেকোনো কিছুই হতে পারে। লেখার মধ্যে রাজনীতি, দর্শন এবং ইতিহাসের মিশেল না হলে তাকে অনেকে লেখা পদবাচ্য পর্যন্ত মনে করে না। এমনই নানা ধরনের ছুৎমার্গ আমাদের কেবলই পিছিয়ে দিয়েছে। মৌলিক লেখা, প্রভাবমুক্ত লেখা– এমন সব উদ্ভট ধারণা মনে-মগজে গাঁথা। অনেকে ভাবেন, লেখায় কারো প্রভাব থাকা মানে লেখা রসাতলে গেল। লেখাকে এমন মৌলিক হতে হবে যেন সেই মাল হাতে নিয়ে বলা যায়, 'ওয়ান পিস মেড/ কারিগর ডেড'। যাই হোক এসব নিয়ে আঁদ্রে জিদের মতো লেখক 'সাহিত্যে প্রভাব' নামের বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছেন। (মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ অনূদিত, ঢাকা, শাহবাগের পড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত 'তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ' নামে সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বইটি পড়ে দেখার অনুরোধ করি। বুদ্ধিমান ও লম্বাদৌড়ের সাহিত্যসেবীদের জন্য এখানে অনেক ইশারা আছে। জিদের লেখাটি নতুন করে ভাবতে সহায়তা করতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের ওপর আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।)

'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে' গল্পটি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে যে-কারোই ওই রকম দ্বিধায় ভুগতে হতে পারে। গল্পের নাম থেকে শুরু করা যাক। নামটা জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা থেকে নেওয়া। কাব্যিক নাম। বিষয়টা ততটাই বলা যায় অকাব্যিক। গল্পটা আগাপাশতলায় এমন একটি বিষয় ঘুরপাক খেয়েছে যাতে আমাদের 'মধ্যবিত্তে'র রুচিবোধে আহত হতে পারে। সংলাপে বোঝা যায় উত্তরবঙ্গের রংপুর বা এর কাছাকাছি কোনো অঞ্চল এর পটভূমি।

কাকডাকা ভোরে জনৈক জামসেদ মিয়া কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল। দ্রুতবেগে হাঁটার সময় মানিকদের বাড়ির সামনে তার ডান পা'টা হড়কে গেল। জুতোটা ঝেড়ে নেওয়ার সময় নাকে গুয়ের গন্ধ এসে লাগে। গু তার হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলেও লেগে যায়। এবং 'হাগার আর জাগা পারে না' বলার আগে কুত্তার বাচ্চা, হারামজাদা ইত্যাদি গালাগালি শুরু করে। সেই গালাগালি মানিকের সত্তর বছর বয়স্ক মায়ের কানে পৌঁছায়, যে ওই সময় বাতের ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠার পাশাপাশি

ওই গালাগালি শুনে মুচকি মুচকি হাসে। যেকোনো বোদ্ধা পাঠক মাত্রই শতভাগ নিশ্চিত হবেন যে কাজটি ওই বুড়িরই করা। তবে তখনও মনে হয় না যে গল্পটা এই হাগাকে নিয়ে এগুবে। হয়তো জামসেদ মিয়ার কোর্টে যাওয়া গ্রাম্য রাজনীতি বা জমিজমা নিয়ে মামলামোকদ্দমার দিকেই হয়তো যেতে পারত কিন্তু পরের অনুচ্ছেদে বোঝা গেল, সে সব কিছুই নয়, গল্পটা 'গু-তাড়িত ঘটনা' নিয়েই পাক খাবে। এবং এর সঙ্গে গ্রামের কিছু কথা এসে পড়ে। উন্নয়নের নামে বিপ্লব ঘটানোর কথা, মানিকের বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা হওয়া, মানিকের বাবার টুঁ শব্দ না করা-র কথা। মানিক, মল্লিক সামান্য কিছু লাফালাফি করে কোনো বিহিত না করতে পারার কথা। এভাবে একটা ইতিবৃত্ত থেকে লেখক আমাদের ঘুরিয়ে আনেন। আমরা আরো জানি এনজিওর টাকায় মানিক, রতন মল্লিকেরা এখন বেশ স্বচ্ছল। তাদের দিন ফিরেছে। এবং তারপরেই আরো স্পষ্ট করে জানা হয় যে কেউ একজন নিয়মিত রাস্তায় হাগার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলে ভূতের কারসাজি। কেউ-বা গুয়ের ধরন, রঙ, আকার-প্রকৃতি নিয়ে বুঝে নিয়ে চায় কোন বয়সের লোক কাজটা করে। এখানে ইংগিত আসে মানিকের বুড়ি মার দিকে, যে সেই কাজটি করে কিনা। ঘটনাটি নিয়ে রতন, মানিক এবং মল্লিকরা বিব্রত হয়। ঠাট্টা করে কেউ কেউ পাহারা বসাতে বলে, আবার কেউ রসিকতাও করে যে,' পাছাত যদি বাতাসই না ল্যাগলো তালে আর হাগা ক্যান।' এরপর আমরা জানি এর দায়ে ছেলেপিলে এক দফা মারও খায়। এখানে ওই বুড়ির নাম জানা হয় মর্জিনা বিবি। সে ছেলেপেলেকে মার দেওয়ার প্রতিবাদ করে। এরপর আমরা আরেকটি ইতিবৃত্তের ভেতরে আসি। এখানে মানিকদের পরিবারে পুরনো বাড়ি– যে বাড়িতে বুড়ির থাকা ও অযত্নের কথাগুলো বর্ণিত হয়। তিন ভাইয়ের আলাদা তিনটি দালান হয়েছে। আধপাকা দোচালা টিনের ঘর। বুড়ি যে পুরনো ভিটায় থাকে সেই বাড়িটার কোনো সংস্কার হয়নি বিগত তিন বছর। এবং আর কোনোদিন হবে কিনা সন্দেহ। বুড়ি মরে না কেন, কেন তার কোনো অসুখ হয় না এই নিয়ে তিনভাইয়েরই মাথায় মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। আমরা বুড়ির অভাব-অভিযোগ শুনতে পাই, "সংসারে বুড়ো মানুষের কী দরকার? না তারা কোনো কাজ করতে পারে কিংবা করতে দেয়। সব কিছুতেই একটা বাগড়া বসায়। পান থেকে চুন খসলেই হা হা করে ওঠে। সবসময় একটা ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান লেগেই থাকে। "তোর বউ খারাপ, হামাক টিকমতো খাবা দেয় না, তোর ছোল সবসময় হামাক মরার বুড়ি মরার বুড়ি করে, তিন দিন থ্যাকা হামার পান নেই, সন্ধ্যা হয়্যা গেলও কেউ হামার ঘরত সাঁঝবাতি দেয় না।" তার এই অভিযোগগুলো যে সত্য তা-ও জানা হয়। এবং সংসারের খুটিনাটি নানান অমঙ্গল, এমনকি পরীক্ষায় বাড়ির কোনো ছেলে অংকে কেন কম পেল– তার দোষও বুড়ির ঘাড়ে চাপে। কেবল একজন, মানিকের ছোট ছেলে রঞ্জন এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তার বয়স সাত/আট বছরের। সে সকলের অগোচরে দাদির কাছে যায়। দাদিকে তার গল্পের বইয়ের দুয়োরানি বলে মনে হয়।

তারপর গল্প আবার গুয়ের দিকে ফেরে। হাগার ওই ঘটনা নিত্যদিন চলতে থাকার ফলে রঞ্জন দাদিকে বলে, দাদি, ঐ তালগাছের জ্বিন বুলে হামাক ঘাটত হাগে। শুনে তার দাদি মুচকি মুচকি হাসে। হাসির কারণ জানতে চাইলে সে আরো হাসে এবং জানায় কাজটা সে-ই করে। এবং কেন সে কাজটা করে তার কারণটা তখন বলে, সে নিজে মরে গেছে নাকি বেঁচে আছে এটা অনেক সময় সে ভুলে যায়, কেউ তার কোনো খবর নেয় না। তাই গু দেখে যখন লোকজন অজানা কারো উদ্দেশ্যে গালি দেয়, তাতে সে মনে করে, এই তো আমি বেঁচে আছি। বুড়ির স্বীকারোক্তি শুনে রঞ্জন আর দেরি না করে এতদিনের রহস্য ও বিরক্তির গোমর ফাঁস করে। সবাই জেনে গেলে মর্জিনা বিবিকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি দেয়। শুনে মানিক, রতন মল্লিকের মাথা হেঁট হয়ে আসে। তারা একযোগে মায়ের কাছে অনুযোগ করে কেন সে এমন কাজ করে। মর্জিনা বিবি পাশ ফিরে শোয়। কিছু বলে না। পরের দিন কেউ এই ঘটনা তুলেই বাড়িটাকে কুত্তার বাড়ি বলে। সেই গালি শুনেও মর্জিনা বিবি মিটিমিটি হাসে।

গল্প এখানেই শেষ।

বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া যাক। গ্রাম্যজীবনের গ্রাম্য গল্প। সরাসরি দেখলে এমনই মনে হবে। এক বুড়ি নিজের জীবনের বেঁচে থাকাকে অনুভব করতে রাস্তার ওপরে হাগে। যে রাস্তাটি চেয়ারম্যান জোর করে তার বাড়ির ওপরে দিয়ে নিয়ে গেছে। গ্রামে উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলে সবার তো আর উন্নয়ন হয়নি। বুড়ির ছেলেদের স্বচ্ছলতা এলেও তার প্রতি কারো কোনো যত্ন নেই। তাই তার অভাব-অভিযোগেরও শেষ নেই। আর তাকে কেউ পাত্তা দেয় না, কেউ খোঁজ নেয় না, এমনকি নিজেও মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে সে বেঁচে আছে না মরে গেছে– সেই বাঁচাকে বোধ করতে সে একটা নোংরা পথ বেছে নেয়– রাস্তায় পায়খানা করা। লোকজনকে বিরক্ত করা। গল্পটি পড়ে পাঠকও বিরক্ত হবেন। বোধ করি এটাও লেখকের সার্থকতা। জনৈক সাহিত্যিক বলেছিলেন, লিখে যদি কাউকে বিরক্ত না করতে পারেন তাহলে না লেখাই ভালো। এই গল্প নিজের বেঁচে থাকাকে পরীক্ষা করার গল্প, এ গল্প প্রতিবাদেরও গল্প। আমাদের প্রচলিত বোধকে আহত করার গল্প। কিন্তু কথা হল শিল্পসম্মত লেখার স্তরে কি এই লেখা উঠেছে? কেউ কি একবারের জায়গায় দুইবার এই লেখা পড়বে? লেখায় এমন কোনো রহস্য-রসবোধ আছে যা বার বার ফিরে অনুভব করতে ইচ্ছা করে?

বলা হয়, সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য হল– সংবাদ একবার পড়লেই চলে, কিন্তু সাহিত্য একবার পড়বার বিষয় নয়। ফলে সংবাদ সাহিত্য নয়। এই গল্প আমাদের একটা সংবাদ দেয় মাত্র। তার মানে কি এটি সাহিত্য হয়ে ওঠেনি? এখানেই গল্পটি আমাদের দ্বান্দ্বিক পথে ঠেলে দেয়। গল্পের মূল লক্ষ্যটা 'নিজের বেঁচে থাকাকে পরীক্ষা' আর তা যে এইভাবেই হতে পারে– সেটি আমরা জানলাম। আর হল উন্নয়নের নামে বস্তুগত উন্নয়ন কোনো উন্নয়ন নয়, চাই মানসিক উন্নয়ন। এটাও গল্পের আরেকটা বক্তব্য বোধ করি। তবে এটা পাঠক ভেবে নিতে পারেন। লেখক এসবের

কোনোটাই বলেন না। গল্পে সরাসরি এর কোনোটাই তুলে ধরা হয়নি। নিপাট বাস্তবতাকে একেবারে ছককেটে বসানো। কিন্তু জীবনাকাঙ্ক্ষাকে এইভাবে পরীক্ষা– এটা মেনে নিতে কষ্টই হয়। আবার মনে হয়, হোক না। এ-ও জীবনের একটা অংশ। এই যে দ্বিধার মধ্যে পাঠককে রেখে দিলেন গল্পকার এটা তার অর্জন। গল্পের আঙ্গিকটাও জটিল কিছু নয়। একেবারে সরলরৈখিক তা-ও নয়। মাঝে কেবল গ্রামের অবস্থা, মানিকের পরিবারের অবস্থা এবং বুড়ির প্রতি অযত্ন-র কথা বলা। অর্থাৎ একটা সরলরেখা, তারপর একটা বৃত্ত তারপর আবার একটা সরলরেখা। সোজা করে বললে, একটা বৃত্ত ছেদ করে একটি সরলরেখা বয়ে গেছে।

গল্পের গদ্য গতানুগতিক। শব্দ ব্যবহারও সচেতন নয়। প্রথমেই 'দুর্ঘটনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে– এর প্রয়োগ সঠিক হয়নি। এরকম ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলা কি চলে? বিপত্তি বলা যেতে পারত বা অন্য কিছু যার ব্যাপ্তি বা রেঞ্জটা একটু ছোট। তারপর তিনি বিশেষায়িত করেছেন 'গু-তাড়িত' শব্দটি প্রয়োগ করে। তিনি পাঠককে কেন বোঝাতে চাইছেন যে বিষয়টি গু-তাড়িত? এটা তো পড়ার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। আরো কিছু শব্দ ব্যবহার যেগুলো বোধ করি এই সময়ের গল্পে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। প্রবন্ধের জন্য যে শব্দ উপযোগী তা কি গল্পে প্রয়োগ করা ঠিক? যেমন 'প্রাত্যহিক'-এর বদলে 'প্রতিদিনের' বলা যেতে পারত, 'সংলগ্ন'-এর বদলে 'ঘেঁষা' বা 'লাগোয়া' ব্যবহার করতে পারত। তিনি 'সংস্কার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পরপর দুটো বাক্যে, যেটির কোনো টিউনিং তৈরি করেনি। কোনো গল্পে পরপর বাক্যে তো বটেই, পুরো গল্পে এই ধরনের শব্দ একবারের বেশি ব্যবহার করা বোধ করি সমীচীন নয়। তারপর তিনি 'অমঙ্গলজনক', 'একমাত্র ব্যতিক্রম', 'কুৎসিত কর্মটি'– এমনি বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করে গল্পলেখক হিসেবে গদ্য ও শব্দ ব্যবহারের মৌলিক কৌশলে অদক্ষতা দেখিয়েছেন। গল্পে বিশেষণ ব্যবহার করলে গল্প লেখা কেন? কেউ ভণ্ড এটা তো তার আচার-আচরণেই বোঝা যায়। 'লালসালু'তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কি একবার বলেছেন যে মজিদ লোকটি ভণ্ড ? কেউ যদি আতঙ্কিত হয় তাহলে সেটি গল্পে লেখায় তার আচরণজাত বর্ণনা দিয়েই বোঝানোই যায়– এবং তার জন্যই তো গল্পটা লেখা। বিশেষায়িত করতে গেলেই গল্প মার খায়। এবং আরো একটি কথা বলতেই হয়, বাঙালির রসিকতা মাথা পর্যন্ত ওঠে না। সাহিত্য আমাদের এখনও চিন্তার খোরাক হয়ে উঠতে পারেনি বলেই, আমরা মননশীল আর সৃজনশীল আলাদা করি। সাহিত্য চিন্তার আনন্দময় খোরাক বা আনন্দের চিন্তাময় খোরাক এমন কিছু একটা হতে পারত। তবে এ গল্পকার একটি অস্বস্তিকর বিষয় দিয়ে জীবনের বেঁচে থাকাকে পরীক্ষা করেছেন সেটি স্বীকার করতেই হয়। এটুকুও ছোট বিষয় নয়।

দুই

ছায়ার সঙ্গে মোরগ লড়াই

দু'বার কথাটা ধাক্কা দিয়েছিল। প্রথমে পড়ে। পরে শুনে।
একটি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, বলেছিলেন, বাংলা ছোটগল্প থেকে রহস্য হারিয়ে যাচ্ছে। সুনীল কি সুবিমল কারো ভেতরেই সেটি নেই। জবাবে সুবিমল একটি গল্প লিখেছিলেন। আর সুনীল কী করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। পরে প্রশান্ত মৃধার সঙ্গে মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে কথাটা দ্বিতীয়বারের মতো শুনি। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্তব্যটা করেছিলেন। বলেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় অনেক রহস্য আছে। পরবর্তীকালে এক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কারো লেখায় এটি থাকল না। এই রহস্য গোয়েন্দা উপন্যাসের রহস্য নয়, লেখকের যে নির্মিতি ও আবেদন (একে অ্যাপিল নাকি অ্যাপ্রোচ বলব), তার ভেতর দিয়ে জীবনের রহস্যময়তার দিকে বোধকে চালিত করার বিষয়। বঙ্কিমের লেখার অনেকস্থানেই তা বর্ণনার বদলে আভাস হয়ে ওঠে। সংলাপে আসে চরম ইঙ্গিতময়তা। এই আভাস ও ইংগিত একই কথা হলেও কিন্তু এক জিনিস নয়। বলাবাহুল্য আমরা যে রহস্যের কথা বলতে চাইছি বোদ্ধাপাঠক সেবিষয়ে অনেক আগে থেকেই অবগত।

'ইদ্দিস' গল্পটি পড়ে মনে হল এর লেখকও ঠিক সেই দিকে যাচ্ছিলেন। গল্পের শুরু থেকে একটা রহস্যবোধ এতে জারি ছিল। কিন্তু গল্পটিকে তিনি প্রতিবেদন করে তুললেন। তাতে খুব ক্ষতি হয়ে গেছে কিনা তা বলা মুশকিল। অনেকের কাছেই এই গল্পের প্রতিবাদের জায়গাটি ভালো লেগে যেতে পারে। ভালো লেগে যেতে পারে রাজনীতির অসংগতি নিয়ে করা ঠাট্টাগুলোও। গল্পটি উত্তম পুরুষে আটটি পরিচ্ছেদে লেখা। কথক নিজেও গল্পলেখক। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বসবাসে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হওয়ার জন্য তাকে মাঝে মাঝে বাড়ি বদলাতে হয়। গল্প শুরু হয় যেখান থেকে সেখানে তিনি সপ্তাহখানেক হয় এসেছেন। এর ভেতরে একদিন টুথব্রাশ কিনতে বেরিয়েছেন। দিনটা শুক্রবার। দেখলেন, তার বাসা যে গলিতে সেই গলির মুখে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই একজন লোক একহাতে ভাঁজ-করা পা ধরে আরেক হাত পিঠের দিক দিয়ে পা-ধরা হাতটির বাহু ধরে লাফাচ্ছে। জুমার নামাজ শেষ করে বের হয়েছে মুসল্লিরা। যে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে তারা বের হয়েছে তার রঙ লাল টকটকে। আর এই লোকটির পরনের কাপড়ও লাল রঙের। একজন ওই লোকটিকে দূর থেকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে কী করছে– উত্তরে সে জানায়, সে ছায়ার সঙ্গে মোরগলড়াই খেলছে। এই লোকটির নামই ইদ্দিস। কথক সেদিন থেকে নানান সময় তার মুখোমুখি হন, কিছু প্রশ্ন করেন। উত্তরে লোকটি কখনো দার্শনিক কখনো রাজনৈতিক উত্তর দেয়। লোকটির আচরণ রহস্যময় কারণ সে বিনামূল্যে কোনো পরিশ্রমিক ছাড়াই ওই এলাকার ময়লা

পরিষ্কার করে। কথক তাকে একদিন একশো টাকার একটা নোট দিতে গেলে সে প্রত্যাখ্যান করে। জানায়, সে ভিক্ষুক নয়। এর আগে লেখক ঠিক করেন তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন। কথককে বিভিন্ন বিষয়ে যেচেও কিছু কথা বলেন। ময়লা সাফ করা তার নেশা। তার ইচ্ছা, মানুষের ভেতরের ময়লা যদি সে পরিষ্কার করতে পারত। এক বাড়ির সিঁড়ির ঘরের নিচতলায় ইদ্দিসের থাকার জায়গা। এলাকা পরিষ্কার রাখার সুবাদে দয়া করে এই আশ্রয় মিলেছে। যে তাকে আশ্রয় দিয়েছে তার সম্পর্কেও সে আজেবাজে কথা হরদম বলে থাকে। বাড়ির মালিকও তা জানে। একদিন হঠাৎ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। ছয় নম্বর পরিচ্ছেদে আমাদের জানা হয়, সে সিরাজ শিকদারের পার্টি করত। সে ভোট দেয় কিনা এই প্রসঙ্গ উঠলে সে খালেদা জিয়া, শেখ মুজিব, শামীম শিকদার সম্পর্কে খোলামেলা মন্তব্য করে।

ইদ্দিস আর নালা পরিষ্কার না করায় এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এখানে ঢাকা শহরের নাজুক স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাটি বর্ণিত হয়। বেশ কিছুদিন পর জেনেভা ক্যাম্পের কাছে দেখা মেলে ইদ্দিসের। সে না থাকায় এলাকায় কী অবস্থা দেখা দিয়েছে তা কথক তাকে জানান। বলেন পুরো এলাকাটা নোংরা আবর্জনায় ভরে উঠেছে। উত্তরে সে বলে, "পুরো দেশটাই তো একটা ডাস্টবিন হয়ে গেছে– এই দেশের মানুষ কি মানুষ আছে! মোসলমানদের ঈমান নষ্ট হইলে মলমূত্রের চাইতেও খারাপ হয়ে যায়। আমরা একাত্তরে পাকিস্তান থিকা স্বাধীন হইলাম বাঙালি বইলা আর সাতচল্লিশ সনে ভারত থিকা স্বাধীন হইছিলাম মোসলমান বইলা , তাই না? কিন্তু এই কি মোসলমানদের চরিত্র? আমরা কুত্তার জাত!" গল্পটি যে অতি সাম্প্রতিককালে লেখা তার প্রমাণ পাওয়া গেল এতে শেখ মুজিবরের হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর প্রসঙ্গটা দেখে। কথক তাকে এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন দেখে সে অনুযোগ করে, এতদিন পর দেখা হল, অথচ তিনি কেবলই যাই যাই করছেন কেন, তারপর সে একটা প্রশ্ন করে ,"শ্যাক সাহেবের খুনিদের তো ফাঁসি হইল, তাই না? জাতি একটা কলঙ্ক থিকা মুক্তি পাইল। কিন্তু সিরাজ শিকদারের খুনি নাকি শ্যাক সাহেব নিজেই– তাইলে সে বিচার কে করবে?" কথক এর উত্তর না দিয়ে একরকম পালিয়েই আসেন। গল্পের শেষটায় আমরা দেখি কথক ও তার স্ত্রী বাড়ি বদলের জন্য জিনিসপত্র পিকআপে তুলে রওনা হচ্ছেন। পিকআপে স্টার্ট দেওয়ার সময় দেখেন ইদ্দিসকে টেনে-হিঁচড়ে র‍্যাব সদস্যরা একটা গাড়িতে তুলছে। কথক তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ইদ্দিসের কাছে পৌঁছানোর আগেই র‍্যাবের গাড়িটি ছেড়ে দিয়েছে। পরে জানা গেল, তাকে ধরার কারণ বিডিআর বিদ্রোহের সময় ক্লোজসার্কিট ক্যামেরায় দেখা গেছে বিদ্রোহী জওয়ানদের পক্ষে মিছিলে সে অংশ গ্রহণ করেছিল। এবং গল্প শেষ হয় একজন বয়স্ক শিক্ষিত লোকের মন্তব্য দিয়ে (যার সোজা মানে হয়, পুলিশ ধরলে রক্ষা ছিল কিন্তু র‍্যাব যখন ধরেছে তখন বিনা বিচারে মৃত্যুই ইদ্দিসের ভবিতব্য)। ওই

মন্তব্য শুনে কথক ও তার স্ত্রীকে ভীতসন্ত্রস্ত মনে হয়। বাড়ি বদলের কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে তাদের ব্যস্ততার দৃশ্য দেখিয়ে গল্পের ইতি টানা হয়।

গল্পটি চরিত্রপ্রধান গল্প না বক্তব্যপ্রধান– গল্পের এমন ভাগ করা হলে এই গল্পটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাগটাই বোধ করি বড় হয়ে উঠবে। মূল চরিত্রের কথাবার্তাই মূলত তাকে চেনায়, কিন্তু সে আসলে কে, কোনখান থেকে এসেছে এটা রহস্যই (অজানা অর্থে) থেকে যায় (কিন্তু তাতে জীবনরহস্যের কোনো কিছু আমরা পাই না, তবে কোনো গল্প লিখতে হলে এটা আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হবে তা-ও তো সম্ভব নয়)– এর তেমন কোনো আভাস নেই। কেবল জানা হয়, তার নাম মো. ইদ্রিস আলী। সবাই ইদ্দিস বলে ডাকে। রাস্তা ও ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করা তার নেশা। অশ্লীল গালিগালাজ করা তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এক সময় সে সিরাজ শিকদারের পার্টি করত। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে তার মন্তব্যগুলো আসলে আমাদের জনমানুষের মধ্যে প্রচলিত নানা কথাবার্তারই অংশ। যেমন ইদ্দিস খালেদা জিয়ার ১৫ আগস্টে জন্মদিন পালনটিকে একটি নোংরা মানসিকতার প্রকাশ বলে মনে করে। পাশাপাশি সে শেখ মুজিবরের সমালোচনা করে, সমালোচনা করে মুসলমানদের। এবং তার বাস্তব অবস্থাটি নিয়েও সে কিছু কথা বলে। এতদিন সে একটি এলাকায় থাকল, বিনাপয়সায় মেথরের কাজ করল কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দিলে এ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না, তাকে সাহায্য করতে একটা লোকও এগিয়ে এল না।

এই গল্পটি যে বিষয়ে আমাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছে সেটি হল 'স্বার্থ'। নিজেরটুকু বুঝে পেলেই অন্য কোনো অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। সেটি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক অপরাধ হোক, কি হঠাৎ করে একটি লোককে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক– আমরা এই নিয়ে কোনো কথা বলি না। এমনকি রাষ্ট্র যখন হত্যা করে তখন আমরা এ নিয়ে কোনো কথা বলি না। আইনের প্রয়োগ করবে যারা তারাই হত্যার মতো বড় অপরাধ করে যাচ্ছে। আমরা চুপ করে থাকি। নীরবতাই আমাদের বেঁচে থাকার প্রধানতম অবলম্বন হয়ে থাকে। একমাত্র পাগলাটে কোনো লোক ছাড়া এখানে কেউ সত্য কথা বলার সুযোগ পায় না। মজার ব্যাপার হল, পাগলের বলা কথাগুলো কোনো সুস্থ লোক বললেই তার ওপর নেমে আসত কোনো না কোনো শমন। হুমকিতে কাজ না হলে তারপরে কী হবে কেউ বলতে পারে না।

নিজেকে বিক্রি করা আর অবস্থা বুঝে আপোস করাটা আমাদের সমাজের চলতি মূল্যবোধ। ভাইয়ের হত্যাকারী যদি মোটা অংকের রুজির ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আমরা সেই অন্যায়ের বিচার চাইতে ভুলে যাই। রুটি ও রুজি জুটে গেলে আমরা আর কিছু চাই না। আর বসবাসের সমস্যা হলে আমাদের মধ্যবিত্ত লোকজনের প্রধানতম বিবেচনা হয়ে ওঠে কী করে মনমতো আরেকটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। এই যে

পলায়নবৃত্তি, বাস্তবতার মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা, সমস্যার সমাধান না করে সরে যাওয়ার প্রবণতা এ-ই হয়ে উঠেছে আমাদের নিয়তি। আর বিনাপয়সায় সেবা নিতে আমরা আগ্রহী কিন্তু চারপাশে গু-মুত ভেসে বেড়ালে তা দূর করার চেয়ে জায়গা বদলের উদ্যোগ নেই। 'ইদ্দিস' গল্পটিতে আমাদের অক্ষমতার সেই দিকটি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। 'ইদ্দিস' গল্পটি পরার্থপরতার মূল্যহীনতাটিকেও তুলে ধরেছে। আমাদের পরার্থপরতা এখন ছায়ার সঙ্গে মোরগ লড়াইয়ের মতোই বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা এখন অবনী 'পরে সবাই নিজেকে নিয়ে বিব্রত। কেউ আমরা কারো তরে নই। পলায়ন ছাড়া আর নিরাপত্তার গুহা খোঁজা ছাড়া আমরা আর কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি একটা ভাবিত নই।

গল্পকারের গদ্যটি বেশ স্বচ্ছ। বর্ণনার ধারা ও গল্পের ভারসাম্যও মন্দ নয়। কিন্তু এক জায়গায় নাটকের সংলাপের মতো পরিস্থিতিকে বন্ধনীর ভেতরে উল্লেখ করেছেন–এটা একটু চোখে লেগেছে। বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন '(নিজের গা চুলকাতে চুলকাতে)' এটি নাটকের রীতি। তিনি কিন্তু গল্প লিখছেন। আর এটা যদি আরো বেশ কিছু স্থানে করতেন তাহলে বোঝা যেত এটা তার লেখনশৈলীর অংশ যাতে তিনি নাট্যভঙ্গি আর গল্পের বর্ণনাভঙ্গিকে মিশ্রিত করেছেন। তিনি একজায়গায় লিখেছেন 'লোকটির রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইলাম'– এটা অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল বাক্যাংশ। 'রহস্য সম্পর্কে জানতে' চাওয়ার এই অ্যাপ্রোচটি আসলে তার উপস্থাপনাগত দুর্বলতা। তিনি লিখেছেন 'দ্রুত প্রস্থান নিলাম'– এটিও খুব হাস্যকর প্রয়োগ। এখানে 'কেটে পড়লাম' বা 'আর দেরি না করে সটকে পড়লাম' হলেও হতে পারত। কিন্তু প্রস্থান কথাটা খুবই অপপ্রয়োগের মতো এখানে চোখে পড়েছে। ইদ্দিস টাকা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি লিখেছেন, 'আমি মোটামুটিভাবে বোল্ড হয়ে' এই যে 'বোল্ড' কথাটা ব্যবহার করলেন তার বদলে বাংলায় এটিকে অনেকভাবেই বলা যেতে পারত। তিনি সংযুক্ত, সংলগ্ন– এই ধরনের শব্দের বদলে 'যোগ' বা 'ঘেঁষা' বা 'লাগোয়া' শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন।

এটা আমাদের বেশিরভাগ গল্পকারের একটি সাধারণ দোষ যে আমরা কোন শব্দ প্রবন্ধে ব্যবহার করা যায়, আর কোন শব্দ গল্পে ব্যবহার করা যায়– এ বিষয়টি প্রায়শই ভুলে যাই। গল্প-কবিতা-উপন্যাস যাই হোক না কেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি দুটো শব্দই পুরো সৃষ্টিটাকে বিস্বাদ করে দিতে পারে। এতে করে 'এক বালতি দুধে একটু চোনা পড়া'র মতো ঘটনা ঘটে যায়। বাক্য শব্দকে অনিবার্য করে তোলার জন্য লেখককে ভাস্করের ভূমিকা নিতে হয়। তিনি শব্দকে এমনভাবে খোদাই করে বসাবেন যেন তা পুরো বাক্যটিতে তো বটেই, পুরো রচনার সঙ্গেও যেন এতটুকু বেখাপ্পা না হয়।

মঈন চৌধুরী

মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি

পূর্ব কথা

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে, খুব সঠিকভাবে সংস্কৃতির সব উপাদানকে এক সাথে করে একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানো আসলেও মুশকিল। 'সংস্কৃতি' শব্দটা নিয়েই কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের মাঝে ছিল, এখনো আছে। কেউ কেউ মনে করেন, 'কৃষ্টি' শব্দটি দিয়ে একটি জাতি কিংবা সমাজের মূল্যবোধ, ভাষা, সাহিত্য, আচার, আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদিকে যেভাবে বোঝানো যায়, সংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে ঠিক একই মাত্রার দ্যোতনা আনা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষপাতিত্ব থাকায় ইংরেজি culture শব্দটির বিপরীতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষাতে মোটামুটিভাবে স্থান করে নিয়েছে। তবে এ কথাও সত্য, এখনো আমরা অনেকেই 'সংস্কৃতি' বোঝাতে 'কৃষ্টি' শব্দটিও ব্যবহার করি।

কোলকাতা ও শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি-চর্চা একসময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির মর্মার্থ নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে, সংস্কৃতির বিকাশ বা চর্চার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায় 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানসমূহের আনুষ্ঠানিকতা। এখনো আমাদের সমাজের অনেক শিক্ষিত লোকই 'সংস্কৃতি-চর্চা' বলতে গান-বাজনার আসরকেই বোঝাতে চান। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি যে তাদের জীবন ও চরিত্রের উপাদান হয়ে তাদের মাঝেই অবস্থান করছে, তা উপলব্ধি করাও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' এবং 'কৃষ্টি' নামক দুটি শব্দ আছে, কিন্তু দ্যোতক হিসেবে শব্দ দুটির সঠিক দ্যোতিত রূপ আমাদের চেতনসত্তায় কেন পৌঁছাচ্ছে না, তা বিচার-বিশ্লেষণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন বাঙালি বা বঙ্গাল সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন প্রচুর; বিভিন্ন সত্য, অর্ধসত্য এবং মিথ্যা অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তও তারা উপস্থিত করেছেন যৌক্তিকভাবেই, কিন্তু সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আসল দ্যোতিত অর্থকে বাঙালি/বঙ্গাল চেতনা-চৈতন্যে উপস্থিত করতে পারেনি কখনোই। আমরা Cultured/uncultured যুগ্ম-বৈপরীত্যটিকে যে মাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণ করি,

ঠিক একই মাত্রায় সংস্কৃতি/অপসংস্কৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিচার-বিশ্লেষণে আনি না। কেন আনি না, এই প্রশ্নের উত্তরে যথাযথ যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে আমাদের জ্ঞানীগুণীজন সব সময় ধর্ম, সামাজিক বিভেদ, জাত-পাত কেন্দ্রিক বিভাজন ইত্যাদিকে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতির উৎসমূলে অবস্থানরত মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণে আনেননি।

সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সাথে যে সমাজ-মনস্তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানীগুণীজন যৌক্তিকভাবে কখনই উপলব্ধি করেননি, এবং এর কারণ হল 'সংস্কৃতি' শব্দটিই ছিল বঙ্গাল বা বাঙালিদের কাছে খুবই নতুন। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্যারিস গিয়ে তার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে জানতে পারেন যে, মারাঠি ভাষায় Culture শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃত' শব্দটির প্রচলন আছে। দেশে ফিরে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ে অবহিত করলে রবীন্দ্রনাথ Culture শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় একটি নতুন শব্দ 'সংস্কৃতি' যোগ হল বটে, কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যায় ঘুরে ফিরে ইংরেজি শব্দ Culture-এর উপাদানসমূহই প্রাধান্য পেল। এ সময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে অল্পসল্প ভারতীয় উপাদান যোগ করার তাগিদে আত্মার অধিতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বও নিয়ে আসা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখলেন–

> "শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ।" (ছন্দ : রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা-১৪০৬)।
>
> "...তার [মানুষের] সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"। ('সাহিত্যের পথে' : রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা ১৪০৬)।

রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃতি চিন্তা'কে বিশ্লেষণ করে কিছু মৌলিক এবং যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রশ্নগুলো হল :

ক. আত্মসংস্কৃতি আর শিল্প কিংবা শিল্পবোধ কি একই উপাদান?

খ. পরিবেশ, প্রকৃতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বিচার-বিশ্লেষণে না এনে শুধুমাত্র আত্মার সংস্কারে সাংস্কৃতিক বিকাশ কি আদৌ সম্ভব?

গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' কি একটি অধিতাত্ত্বিক বাণী নয়? যদি এই বাণীতে যুক্তি থেকে থাকে, তবে কি আমাদের সংস্কৃতির সাথে শুধুমাত্র সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে যদি যুক্তিকে টেনে আনি তবে আমাদের অবশ্যই বলতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-চিন্তা আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেনি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তার রচিত 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে আবার 'এগিয়ে চলার' সাথে 'সংস্কৃতি'র সম্পর্ক স্থাপন করে ঐতরেয় মন্ত্র 'চরৈবতি'র প্রসঙ্গ টেনেছেন।

মন্ত্রটি হল :

চরণ বৈ মধু বিপুতি চরণ স্বাদুমুদুম্বরম।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো না তন্দ্রয়তে চরণ॥
চরৈবতি চরৈবতি॥

(চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, দেখো ঐ সূর্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।)

সংস্কৃতিকে (Culture) কেন্দ্র করে একসময় সভ্যতার (Civilization) সৃষ্টি হয়। মানুষ এগিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই একই সংস্কৃতি 'এগিয়ে যাওয়ার' সাথে বিরোধ (Conflict) সৃষ্টি করে মানুষের সভ্যতাকে নষ্টও করে ফেলতে পারে। এ সত্য ঐতরেয় মন্ত্র-জাত ক্ষিতিমোহন সেন-এর বয়ান বা text-এ স্থান পায়নি। সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বিভিন্ন অধিতাত্ত্বিক (metaphysical) উপাদান নিয়ে আসেন এবং তিনি কিছু যুক্তি আর কিছুটা অযুক্তি মিলিয়ে লিখেন :

"পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই, কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি, প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপী ভাষায় Culture (জরমান kultur 'কুলতুর') শব্দ রূপে।... আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তা হচ্ছে Culture।"

"ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি

একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান।"

(সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৬)

সুনীতিকুমার কথিত 'আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা' কিংবা 'ভাবপুঞ্জ' ইত্যাদি কোনোভাবেই সংস্কৃতির আসল রূপ ও স্বরূপকে আমাদের কাছে তুলে ধরে না। এ সময় সংস্কৃতির কিছুটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন :

"রবীন্দ্রনাথ Culture বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি; একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি, তাকে তিনি Culture বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।"

"সুনীতিবাবুর সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় রচনাদি থেকে মনে হয়, তিনিও এই ধরনের মতই পোষণ করতেন।"

"মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মানবশিশুর সঙ্গে একটি পশুশাবকের কোনও পার্থক্য বড় একটা থাকে না। কিন্তু তার পর থেকেই মা-এর ও পরিবারের কোলে সে যখন বাড়তে থাকে, তখন খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শোয়া, বসা, চলা থেকে পদে পদে স্তরে স্তরে তার সংস্কার সাধন চলতেই থাকে; বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও সেই সংস্কারক্রিয়ারই অন্তর্গত। শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পসাহিত্যচর্চা, গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আদান-প্রদানক্রিয়া ইত্যাদিও তার নিজকে ক্রমশ উন্নততর, ক্রমশ বেশি সংস্কৃত করবার অবিরাম প্রয়াস। যে-জীবন ছিল প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মশাসিত মাত্র তাকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্রকর্মের বিচিত্রতর নিয়ম-সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলা। তাছাড়া, জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারের দৈনন্দিন কর্মের রথচক্রে নানা মালিন্য, নানা আবর্জনা জমতেই থাকে। মালিন্য ও আবর্জনা শুধু ধুলোবালি-কালি নয়, শুধু মৃত খড়কুটো নয়, অভ্যাসের মালিন্য আছে, অর্থবোধহীন আবৃত্তিরও আবর্জনা আছে, ব্যবহারে-ব্যবহারেও ক্ষয় আছে। সেজন্য প্রতিনিয়তই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা রাখতে হয়, জীবনকে ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখবার জন্যে, এই সচেতন সজ্ঞান ক্রিয়াও সংস্কার-ক্রিয়া, এবং এই ক্রিয়ার যে ফললাভ ঘটে তাকেই তো আমরা বলি সংস্কৃতি।"

(কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৯)।

নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করেন, এবং জীবনের ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখার সজ্ঞান সংস্কার

ক্রিয়াসমূহের ফলকেই 'সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। নীহাররঞ্জন রায় কথিত ক্ষয়, মালিন্য এবং আবর্জনা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিলেও, শ্রী রায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। পবিত্র সরকার তার দেয়া 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যায় বলেন–

> "মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল– এই দু'য়ের তফাতই হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবনপ্রতিবেশে মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই 'সংস্কৃতি', বাকিটা হল 'প্রকৃতি'।" (লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯১)

পবিত্র সরকারের দেয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা আসলে 'সভ্যতার' সংজ্ঞা। পবিত্র সরকারের কাছে Culture এবং Civilization হয়তো-বা একই মাত্রার দ্যোতনা নিয়ে এসেছিল এবং এর ফলে 'সভ্যতার তফাত'কে তিনি 'সংস্কৃতির তফাত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক গোপাল হালদার সংস্কৃতি-কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

> "মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি;"... "জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনই পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তার পরিবর্তন চলে।"
>
> "সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। ...সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়– চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবই বুঝায়,– তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি–মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।" (সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, ১৯৬৫)

গোপাল হালদার-এর ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির বিবর্তন বা metamorphosis-কে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা 'সৃষ্টি' ও মানুষের জীবন-সংগ্রামের সমগ্র প্রচেষ্টা।

সংস্কৃতির সর্বশেষ বিচার, বিশ্লেষণ ও ইতিহাস আমরা পাই গোলাম মুরশিদ রচিত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি লিখেন :

> "উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এডওয়ার্ড টেইলর সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সংজ্ঞা বলে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষের বিশ্বাস, আচার, আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্নকে বলা যায় সংস্কৃতি। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস; রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন; উৎসব ও পার্বণ;

শিল্পকর্ম; এবং প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন হাতিয়ার ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে– তাও সংস্কৃতির অঙ্গ।"

"জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই। কিন্তু সংস্কৃতিই আমাদের মানুষে পরিণত করে। পরিণত করে সামাজিক জীবে। সংস্কৃতি দিয়েই একটা মূল্যবোধ, মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণার অধিকারী হই। বিদগ্ধ রুচির সুশীল মানুষে পরিণত হই। আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।" (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০৬)

গোলাম মুরশিদ কর্তৃক উদ্ধৃত এডওয়ার্ড টেইলর-এর সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞা ধ্রুপদী হলেও, সংস্কৃতির সাথে সমাজ-মনস্তত্ত্বের সম্পর্ককে উপস্থাপন করে না। লেখকের মতে সমাজ-মনস্তত্ত্ব কিংবা যৌথ-অচেতনের (Collective unconscious) কার্য-কলাপহীন সংস্কৃতি অবস্থান করাই অসম্ভব। গোলাম মুরশিদ-এর বক্তব্য– 'জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই' (নীহাররঞ্জন রায়ও এমন বলেছিলেন) কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেনেটিক কারণে একটি মানুষ মানুষ হিসেবে, একটি বাঘ বাঘ হিসেবে কিংবা একটি গরু গরু হিসেবেই জন্মায়। বাঘ আর গরুর যেহেতু সংস্কৃতি নেই, সেহেতু বাঘ আর গরুর পক্ষে 'মানুষ' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু মানুষের সংস্কৃতি থাকার কারণেই 'অমানুষ' হয়ে যেতে পারে। গোলাম মুরশিদ এই সত্যটি স্বীকার করে লিখেছেন– 'আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।' আমরা 'যা হই, তা হই' কেন, এ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না দিয়েই মুরশিদ রচনা করেছেন তার প্রথাগত হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস। (হাজার বছর আগে বঙ্গদেশে আদি-অস্ত্রাল-দ্রাবিড়-আলপীয়-ইউরোপয়েড মিশ্র জনগোষ্ঠীর বঙ্গালরা বসবাস করতো। তাদের ভাষা হয়তো বাংলা ছিল না। কিন্তু ঐ আদি বঙ্গালদের ভাষার উপাদান এবং যৌথ-অচেতনের প্রত্নলেখ যে এখনো আমাদের মাঝে নেই, তা হলফ করে বলা যাবে না। সব কিছু বিবেচনা করে বঙ্গাল বা বাঙালির সব ধরনের ইতিহাসে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ আনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।) বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাতের কাছে না পেলেও কবি ও প্রাবন্ধিক পুস্কর দাশগুপ্তের একটি লেখা আমাদের সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে কিছুটা হলেও তুলে ধরেছে বলে মনে হল। ভারতীয়ত্বের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে পুস্কর লিখেছেন :

"অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, ভাষা, ধর্ম, আচার-বিচার ইত্যাদির ব্যবধান পেরিয়ে সারা ভারতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তাহলে তা হল ভণ্ডামি। ভারতীয় (বাঙালি বলে আলাদা না করে) সমাজের সর্বস্তরে ভণ্ডামির অবাধ রাজত্ব আর ভণ্ডামি এই সনাতন দেশে সর্বধর্মসম্মত, সমস্ত স্মৃতি এবং নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। ধর্মবাক্য, নীতিবাক্যের আড়ালে চুরি, চামারি, ফেরেব্বাজি করে যাও, ভেজাল দাও, কালো পয়সার পাহাড় বানাও– আড়াল থাকলেই হল। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, ব্যক্তিগত সুবিধা বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, খুন-জখম, জাল জুয়োচুরি, কালো-বাজারি সব করে যেতে পার, তবে তারপর তুমি যদি ঘটা করে তেত্রিশ দেবতার পুজো দাও, হজ করে আস, মন্দির, মসজিদ কি গির্জা বানাও তাহলে সমাজ, জাতি, ধর্ম তোমাকে বাহবা দেবে, মাথায় তুলে নাচবে। ইদানীংকালে আরো নতুন পথ হয়েছে, যে করে হোক নিজের ধান্দা দেখ, অত্যাচার-অনাচার যা পার কর, আখের গুছোও তবে মুখে জনসেবার, গণতন্ত্রের বকুনি কপচাতে হবে, পার তো সমাজতন্ত্র, গরিব হটাও ইত্যাদি হুংকার দিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত জীবনে যত পার দুর্নীতি করে যাও, লাম্পট্য কি হরেক রকমের বদমাইসিও করে যেতে পার, শুধু নীতির মালাজপটা যেন ঠিক থাকে, সৎ সংসারীর ভেকটাও পরিপাটি রাখতে হবে– ডুবে ডুবে জল খেলে ভারতীয় সমাজ নামক শিব ঠাকুরের বাপও তা দেখতে পায় না, অতএব কোনো ঝামেলা নেই।" (দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫)

পুস্কর দাশগুপ্ত যে চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন, তাই হল বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতির মাঝে অবস্থানরত অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, এবং লেখক মনে করে যে, বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত যৌথ-অচেতনের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংস্কৃতি বিষয়ক আসল মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব। সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করে ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতি। সংস্কৃতির অংশ হয়ে মানুষের যে আচার, ব্যবহার, ভদ্রতা-নম্রতা, পূজা-পার্বণ, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্যকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মতো উপাদানসমূহের উপস্থিতি থাকে, তার মূলেও অবস্থান করে মানুষের ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কার্যরত ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষের মনোজগতকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং মনস্তত্ত্বের উপাদান 'যৌথ-অচেতন'-ই সংস্কৃতির সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হয়ে ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, নিয়মকানুন, উৎসব ও পার্বণ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি অবস্থান করলেও, সর্বকর্মেই অবস্থান করছে আমাদের 'যৌথ-অচেতনের' ক্রিয়া-বিক্রিয়া, এবং এই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াই আমাদের সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, ভণ্ডামি এবং বিভিন্ন অস্তিত্বকেন্দ্রিক সঙ্কট। বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের তাই ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতিকেও বিচার-বিশ্লেষণে আনতে হবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

বাংলা ভাষাই হল বঙ্গাল বা বাঙালি, অস্তিত্বের একক উপাদান, যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আগামীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ক্ষণজন্মা মনীষা এ সত্যটি বুঝে লিখেছিলেন–

> "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিলো না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।"

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'অন্তরের ভাগ' আসলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং ভাষার উপাদান হয়েই এই 'অন্তরের ভাগ' বা 'মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব' আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করে রেখেছে। ভাষার সাথে মানবিক সত্তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন দার্শনিক হাইডেগার। হাইডেগার-এর মতে, মানবজীবনের অর্থই হল ভাষার মাধ্যমে সত্তার মর্মার্থ, সম্ভাবনা আর গুরুত্বকে প্রকাশ করা এবং তিনি তার দর্শনে বেশ জোর দিয়েই ঘোষণা করেন Language is the house of Being, man dwells in this house। ভাষার সাথে মানব-সত্তা ও মানব-মনস্তত্ত্বের প্রতক্ষ সংযোগ ঘটান ভাষা-দার্শনিক জাক লাকাঁ। ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্বের মূল কাঠামোসমূহ গ্রাহ্য করেই জাক লাকাঁ তার দর্শনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং তিনি প্রয়োজনমতো ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, জাক দেরিদা আর মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনকেও মূল্যায়ন করেছেন তার দর্শনচিন্তায়। লাকাঁর দর্শন অনুযায়ী মানুষের অচেতন হল ভাষা-শৃঙ্খলে তৈরি, এবং এ কারণে একটি মানুষ সবসময় ভাষার রূপক ও প্রতীক সৃষ্টি করে তার অবদমিত অচেতনকে প্রকাশ করতে চায়। জন্মের পর একটি মানুষ তার প্রয়োজন (Need) ও চাহিদা (Demand) কেন্দ্রিক অকৃত্রিম (Real) এবং কল্পিত (Imaginary) পর্ব পেরিয়ে যখন ভাষা সৃষ্ট প্রতীকী (Symbolic) বিশ্বের সদস্য হয়ে যায়, তখন তার অবদমিত কামনা-বাসনা-জাত ভাষা প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপক আর প্রতীক-কেন্দ্রিক দ্যোতক (Signifier) সৃষ্টি করেই এগুতে থাকে। একজন অবদমিত মানুষ কিংবা অবদমিত সমাজ-সংগঠনের ভাষায় সবসময় তাই

অবদমনসহ বিভিন্ন মানসিক অবস্থার চিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইয়ুং কথিত যৌথ-অচেতন বা Collective unconseious-এর ক্রিয়া-কলাপ। ফ্রয়েড-এর অহং (Ego), অদ (Id) ও অতি-অহং (Super Ego) ঘটিত Displacement, Repression, Intellectualization, Compensation, Rationalization এবং Sublimation-এর বিষয়গুলোও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা ও সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনের সৃষ্টিশীল কামনা-বাসনা সবসময় কাজ করেছে এ কথা সত্য এবং আমরা এ সত্যও জানি যে, অবদমিত অচেতনই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। কিন্তু, অবদমিত সৃষ্টিশীল বঙ্গাল কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মে ও কথায় আমরা অনেক সময় স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ভণ্ডামী, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদির মতো অসামাজিক উপাদান খুঁজে পাই, যা ঐতিহাসিক ভাবেই আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই আমি চর্যাগীতি ও চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর দু'চারটি পদ তুলে দিলাম-

ক.
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী
(ভুসুকু নিজে বাঙালি হয়ে গেল,
নিজের স্ত্রী চণ্ডালে গ্রহণ করলো)

খ.
নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহসো বামহন নাড়িআ।।
(ডোম্বী, নগরের বাইরে তোর কুড়েঘর, তুই ব্রাহ্মণ ও নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস।)

গ.
মেহলি চণ্ডালী গরবি বাম্হণ
জন বিটালন্তি তে দুই লাম্বল।
হল সহি কা মঞি অচাভুঅ দিট্ঠা
বাম্হণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুটঠা ॥
(গৃহিণী চণ্ডালী, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ, এই দুই
মিলে জগৎ নষ্ট করেছে। ওলো সখি;
আমি কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, ব্রাহ্মণ
মানুষ চণ্ডালীতে তুষ্ট)
(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)

উপরিউক্ত পদগুলোতে যে জাত-পাত-কেন্দ্রিক পরশ্রীকাতরতা দেখা গেল, তা ইতিহাস বেয়ে বেয়ে আমাদের বর্তমানেও উপস্থিত আছে। বাঙলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীজনের লেখার কিছু অংশ পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য তুলে দেয়া যেতে পারে।

ক.

"নতুন নতুন জাতি ও শ্রেণীগুলির উদ্ভব নির্দেশ করে যে, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে একটি বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল। নিচু জাতিগুলিকে হয়তো কলঙ্ককর অবস্থায় থাকতে হত। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদেরও উপরে ওঠার ও নিজের অবস্থান উন্নয়ন এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ ছিল। অতএব লক্ষ করা যেতে পারে যে উচ্চাভিলাষী দলগুলোর গতিশীলতার আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হচ্ছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। উচ্চাভিলাষীদের চাওয়ার মধ্যে ছিল জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগে নীচের তলা থেকে উপরের তলায় উন্নতি ও জাতি-ব্যবস্থার শর্ত অনুযায়ী অধিকতর মর্যাদা। তারা কখনই জাতি-ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র নষ্ট করতে চায়নি, বা যে মূল সূত্রগুলির উপরে ওই গঠনতন্ত্র স্থাপিত তাতে আপত্তি তোলেনি। বস্তুত উঁচু জাতিগুলির মতোই নিচু জাতিগুলিও জাতিব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় উৎসাহী ছিল। জাতি-সমাজের ভেতরে পরিবর্তনগুলি সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন দলগুলির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সেই সম্পর্ক নির্দেশকারী নিয়মগুলি অপরিবর্তিতই রয়ে গেল।"

(হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

খ.

"কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত হইলেন– প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়; তৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গৌণ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কালক্রমে, কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণিতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণকুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলীন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

গ.

"যদি কোনো স্থানে আর্যে অনার্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য অনার্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙালিরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙালিজাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫)

ঘ.

"ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শপত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা, মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।"

(স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

ঙ.

"বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশের লোকের প্রতি একটা অন্যায়-অমূলক-তীব্র ঘৃণা এদেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের একটা বিভেদরেখা টেনে রেখেছিল। এ দেশের লোকদের তারা দস্যু (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ), পক্ষীকল্প (ঐতরেয় আরণ্যক), ম্লেচ্ছ (মহাভারত), পাপাশয় (ভাগবৎ পুরাণ) বলে উপহাস অপমান করেছে। স্বল্পকালের জন্যও এদের দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিয়েছে (বৌধায়ন ধর্মসূত্র)। এ দেশের লোকেরা যাতে জ্বরে ভুগে মরে তার জন্য দেবতার

কাছে প্রার্থনা করেছে (অথর্ব বেদ)। এ দেশের লোকের প্রতি তাদের ঘৃণা এতই তীব্র ছিল। সেন-বর্মণ-দেব আমলে সেই ঘৃণাকারীরাই যখন এ দেশের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হল তখন তাদের প্রতি এ দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আর সাধারণ লোকের প্রতি সেই সমাজ বিধাতাদের অত্যাচার-অবিচারের মাত্রাও অনুমানযোগ্য।"

(নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির (?) উন্নয়নের আদর্শ ও দর্শন নিয়ে আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন যা লিখেছিলেন, তাতে শ্রেণীস্বার্থের বুলি, জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন, পরশ্রীকাতরতা এবং সীতা-রূপ পতিব্রতা রমণী সৃষ্টির উপাদান ছিল যথেষ্ট এবং সেই গ্রন্থিত/মুদ্রিত বাণীসমূহ বিভিন্ন সময় নির্মিত/বিনির্মিত হয়ে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদমিত অচেতনের প্রত্নলেখ এখনও 'ভাষা' হিসেবেই অবস্থান করছে বঙ্গাল কিংবা বাঙালির 'যৌথ-অচেতনে'। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি, ২০০৬ সালের 'বর্তমানে' বসবাস করেও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান করে অযথাই নিজেদের হীনম্মন্যতার প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'গণমুক্তি'র সপ্তম প্রকাশনা 'নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান সংখ্যা' সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। গণমুক্তিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হল, নমস্ ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার গ্রাহ্য করে এখনো বাংলাদেশের নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণত্ব দাবি করেন। (ব্রাহ্মণত্বের মাঝে কী এমন গুণ আছে যা লাভ না করলে জীবন বৃথা হয়ে যায়? ব্রাহ্মণত্বের এই গুণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি গণমুক্তির লেখকবৃন্দ)। ব্রাহ্মণত্বের গুণ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা না হলেও, ব্রাহ্মণত্বের দোষ নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, এবং প্রতিটি লেখাই যৌক্তিকভাবে 'বাঙালি সংস্কৃতির' বিপক্ষে অবস্থান নেয়। শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মমতে নমঃশূদ্ররা চণ্ডাল (?) হিসেবে পরিচিত এবং এ বিষয়ে 'গণমুক্তি'তে গ্রন্থিত প্রবন্ধের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি–

ক.

"কর্ম-সূত্রে কারা চণ্ডাল এবারে সে কথা বলা যাক। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ৫১-৫৬ শ্লোকে চণ্ডাল জাতির নিম্নরূপ কর্ম বা অনুশাসন বর্ণিত আছে : "চণ্ডাল ও শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামের বহির্ভাগে হইবে এবং ইহাদিগকে জলপাত্র রহিত করিবে; কুকুর ও গর্দভ মাত্র ইহাদের সম্পত্তি হইবে। (৫১) উহারা পরের বস্ত্র পরিধান করিবে, লৌহের অলংকার ধারণ করিবে এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ করিবে। (৫২) সাধুরা যখন বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ; ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া স্বজাতির

মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং ঋণ-দানাদি ব্যবহারও ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া স্বজাতির সহিত সম্পন্ন হইবে। (৫৩) ইহাদিগকে অন্ন দিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা অন্যের দ্বারা ভগ্নপাত্রে ইহাদিগকে অন্ন দেওয়াইবেন এবং ইহারা রাত্রিকালে গ্রামে বা নগরে বিচরণ করিতে পারিবে না। (৫৪) রাজ-শাসন অনুসারে ধ্বজ কুঠার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্তত বিচরণ করিবে এবং অনাথ শব গ্রামের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিবে। (৫৫) রাজদণ্ডে যাহারা বধ্য বলিয়া স্থির হইবে, ইহারা তাহাদিগের বধ সাধন করিবে, এবং ঐ সকল বধ্য ব্যক্তির বস্ত্রালংকার ও শয্যা ইহারা গ্রহণ করিবে। (৫৬)"

"জন্মের বিচার ও কর্মের বিচার, এর কোনো বিচারেই যে নমরা ঐরূপ নয়, তা সকলেই জানেন। চণ্ডালের উৎপত্তি শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, অন্যদিকে নমদের উৎপত্তি ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা মাতার গর্ভে। চণ্ডালের পেশা রাজাদেশে বধ্য ব্যক্তির বধ-সাধন ও শবদাহ করণ, অন্যদিকে নমদের পেশা কৃষিকাজ, যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সর্বোত্তম জীবিকারূপে সর্বজন-স্বীকৃত। অথচ বল্লালের আক্রোশে এই নমদের উপর অহেতুক চণ্ডাল খেতাব আরোপিত হয় দ্বাদশ শতকে। তখন থেকে সামাজিক কাজকর্মে নমদেরকে 'চণ্ডাল' (>চাঁড়াল) বলে গণ্য করা হতো এবং রাষ্ট্রীয় আদমশুমারিতে যে জাতি-ভিত্তিক লোকসংখ্যা দেখানো হতো, তাতে নমদের 'চণ্ডাল' বলে চিহ্নিত করা হতো। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো গ্রন্থেও 'চণ্ডাল' অর্থে 'নমঃশূদ্র' লেখা হয়েছে।"

(গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা ২০০৬)

খ.

"শূদ্রেরা কি হিন্দু? যদি তারা হিন্দু হয়ে থাকেন, তাহলে কতটা হিন্দু? হিন্দুধর্ম শূদ্রদেরকে অহিন্দু বলেনি, কিন্তু মানুষ হিসেবে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছে? শূদ্রদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করলে তাদের সেবাগ্রহণে ধর্মীয় আপত্তি তৈরি হতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্ম অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের 'অস্পৃশ্য' এবং 'অধম' হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারলে অল্পকিছু শ্রমবিমুখ লোকের জীবনে আরাম অবাধ এবং নিশ্চিত হতে পারে। কালোদের প্রতি সাদাদের মনোভাবে অস্পৃশ্যতা ও দাসত্ব ক্রিয়াশীল থাকলেও তাতে ধর্মীয় অনুমোদন নেই। বরং কালো মানুষেরা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে পশ্চিমা ধনবাদী সমাজে 'মানুষ' হিসেবে ধর্মীয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় বিধিবিধান

রচয়িতা–মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর, বাৎসায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি প্রমুখ ব্যক্তি সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বর্ণ-প্রথার যেভাবে ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছেন তাতে হিন্দুধর্মে শূদ্রদের কতটা অধিকার স্বীকৃত হয়েছে? শূদ্রদের বেদপাঠ নিষেধ, 'ভগবান' রাম বেদ পাঠের অপরাধে শূদ্রের জিহ্বা কেটে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের মন্দিরে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নেই, তাদের উপস্থিতি অপবিত্র, স্পর্শ অশুচি, তাদের ধনসম্পদ সঞ্চয় অনভিপ্রেত। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী শূদ্রের ধন নেই, মান নেই, শিক্ষা নেই, শিক্ষিত হবার চেষ্টা থাকতে নেই, সমাজে স্থান নেই, রাজনীতিতে অধিকার নেই, জীবনের অধিকার পর্যন্ত নেই। ভালো জামাকাপড় তাদের জন্য অনুমোদিত নয়, শূদ্রহত্যা পাখি হত্যার নামান্তর। শূদ্র স্ত্রীর গর্ভের ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে না– হবে এক-দশমাংশের অধিকারী। দাসত্ব শূদ্রের চিরন্তন নিয়তি। শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না, কারণ দাস্য তার স্বভাবজাত। মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্র স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ স্বর্গে যাবে না। এই যখন শূদ্রের অবস্থা তখন শূদ্র কতটা হিন্দু?"

(গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬)

২০০৬ সালে বাংলা ভাষায় লেখা বঙ্গাল বা বাঙালি হিন্দুর নমঃশূদ্র- বিষয়ক চিন্তা-চেতনা কি 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র পক্ষে যায়? আর নমঃশূদ্র চিন্তার সাথে যদি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের 'মালাউন/মুসলমান' দর্শন যোগ হয় তবে বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থা কী দাঁড়ায়? আমি তারপরও বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি আছে, কিন্তু এই সংস্কৃতিতে অবস্থান করছে যৌথ-অচেতন-সৃষ্ট কিছু ভাষা-দোষ। আমাদের ভাষায় আর কী কী সমস্যা আছে, তা আরো গভীরে গিয়ে দেখা যাক।

বাংলা ভাষায় যে প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা জাত-পাত-কেন্দ্রিক হীনম্মন্যতা, অন্ধ বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ, বড়লোক বা ধনী লোকদের প্রশংসা, গুরু-পীর-মুর্শিদ তন্ত্রের প্রত্নছায়া ইত্যাদির মতো নাস্তিবাচক (negetive) উপাদানসমূহকে শনাক্ত করতে পারব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় অবস্থানকারী সব বচন-প্রবচনই নাস্তিবাচক নয়, ভাষায় অবস্থানরত সব ধরনের পজেটিভ/নেগেটিভ উপাদানই ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ভাষার সম্পদ, কিন্তু বচন-প্রবচনসহ সব উপাদানই আমাদের 'যৌথ অচেতন'কে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। বাংলা ভাষায় অবস্থানরত বচন-প্রবচনের বিচার-বিশ্লেষণ আমি আমার প্রবন্ধ 'নিজেকে নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ'তে করেছি এবং যে অল্পসংখ্যক বচন-প্রবচন বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. হুজ্জতে বাঙ্গাল/হুজুগে বাঙ্গাল
২. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ
৩. গোবরের পদ্মফুল
৪. ভাত নাই যার জাত নাই তার
৫. বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভালো
৬. শূয়োরের পাল
৭. সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না
৮. অভাবে স্বভাব নষ্ট
৯. টাকার গরম
১০. ইতর বিশেষ
১১. বামুন-শূদ্র তফাত
১২. দেবতা বুঝে নৈবেদ্য
১৩. বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর
১৪. হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না
১৫. জোর যার মুল্লুক তার/মগের মুল্লুক
১৬. চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা
১৭. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
১৮. নানা মুনীর নানা মত

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বচন-প্রবচনগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল হঠাৎ, কোনো-এক অবদমিত সৃষ্টিশীল সত্তার মৌখিক ভাষ্য থেকে। অচেতনের যে সত্য বচন-প্রবচন হিসেবে আমাদের ভাষায় অবস্থান নিয়েছে, আবশ্যিকভাবে সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং আমাদের বর্তমানে এসে এইসব বচন-প্রবচনই আবার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপাদান হয়ে তুলে ধরতে পারে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে।

আমাদের গুরু-পীর, মুর্শিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ আসলে একই সমাজভুক্ত শোষকের দল (সবাই খারাপ, আমি তা বলব না, কিন্তু আধুনিক পরিসংখ্যানতত্ত্ব মানলে 'ভালো'-র সংখ্যা অতি-অল্প বা Insignificant)। পীর, মুর্শিদ, গুরু, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ সমাজভুক্ত শোষকের দল ব্যবহার করেন গণ-সম্মোহন বা Mass Hypnotism-এর ভাষা। এই শোষকদের ভাষা, বিবৃতি, বাণী ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে, তাদের কথায় প্রাণ দিতেও পারে সাধারণ মানুষ (পাঠক, আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে পথে-ঘাটে রাম, রহিম, যদু, মধু, মতি, শফি ইত্যাদি নামের লাশ পাওয়া গেছে, কিন্তু মিছিলে-ময়দানে শোষক নেতা/গুরুদের লাশ কখনোই পাওয়া যায় না)। ভাষার এই সম্মোহনী গুণকে ব্যবহার করেছে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ।

বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও উপাদান অনেক সময় 'একক বাঙালি সংস্কৃতি' বিকাশের বিপক্ষেই কাজ করেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ড. নজরুল ইসলামের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–

> "দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং লেখকরা যদি এই চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন তাহলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গল হত। কিন্তু তা হয়নি। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-মনমোহন-গিরিশচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু লেখকরা যেমন তাঁদের সৃষ্টিতে সাহিত্যরসের সঙ্গে মুসলমান বিদ্বেষের বিষ মেশালেন, মুসলমান লেখকরাও তেমনি তার প্রতিবাদ করে তীব্র প্রত্যাঘাত হানলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে সৈয়দ নওসার আলি চৌধুরী 'বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' প্রবন্ধে হিন্দুদের লেখায় মুসলমান বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি লেখকদের যেসব রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অধিকাংশই বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এগুলি পাঠে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ছাত্রদের মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মে।
>
> 'নবনূর'-এর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলি তাঁর 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' (১৩১০) প্রবন্ধে দাবি করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সমাজের দেহে যেমন অস্ত্রাঘাত করেছেন, তেমনি অনেক কংগ্রেসভক্ত লেখকও করেন। যারা মিটিঙে-মিছিলে মুসলমানকে ভাই বলে সম্বোধন করে তারাও ঘরে ফিরে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে। এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব হ্রাস পেয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হচ্ছে।"
>
> (বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব কখনো বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা বলেছে কি না, এ ব্যাপারেই সন্দেহ পোষণ করেন ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)। আহমদ শরীফ বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে আমরণ চেষ্টা করেছেন এবং এ কারণেই তার বক্তব্য 'বাঙালি সংস্কৃতি'র বিচার-বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> "আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালির যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির গৌরব– তার কোনটাই বাঙালির কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই যে শিলালিপির বাহাদুরী আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যবসা-

বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী– সেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগদি– যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য– তাদের কথা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোন অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালির ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালি বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা– তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা– তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই অভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি।"

(আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙলাত্ব, কোলকাতা-১৯৯২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে উপরে যা উপস্থাপন করা হল তা যদি যুক্তিসহ পাঠক বিশ্লেষণ করেন তবে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি' প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; শ্রেণীস্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদিই প্রাধান্য পাবে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান হিসেবে। কিন্তু তারপরও আমি বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বেশ প্রবলভাবেই আমাদের সমাজে অবস্থান করছে, কিন্তু এই সংস্কৃতির বিরোধীপক্ষ হিসেবে অবস্থান করছে অবদমিত যৌথ অচেতন-সৃষ্ট কিছু বিরোধ ও অস্তিত্ব-সংকট। এই অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত অচেতন গ্রাহ্য করেই হয়তো-বা তাই আমাদের এক বস্তুবাদী কবিও লিখে ফেলেন– 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' কিংবা প্রতিদিন সকালে দুর্নীতিমুক্ত থাকার বাসনা নিয়ে আরেক কবি বলেন, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।'

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মাটি উর্বর ছিল, জলবায়ু ছিল কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত এবং নদী-খাল-বিলে ছিল প্রচুর মাছ। সবকিছু মিলিয়ে অল্পস্বল্প কষ্ট করেই জীবনধারণ করা যেত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু তারপরও বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু খুব একটা সুখকর ছিল না। বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন-জঙ্গল, মশা-মাছি, সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের বদনামই ছিল বেশি। আমরা যদি বিভিন্ন পুরাণের ব্যাখ্যা পড়ি, তবে দেখতে পাব যে আর্যভাষীরা আমাদের কালো চামড়ার পূর্বপুরুষদের এবং বঙ্গদেশকে ঘৃণার চোখেই দেখেছে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের মাটি কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল সত্য; কিন্তু বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত প্রায়ই এবং

এমন দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজে সবসময়ই অবস্থান করত এক ধরনের অস্তিত্বের সংকট। অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল জনগোষ্ঠীর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ পেয়েছিল, এমন ধারণা করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করে ওই সময় আবার আড়তদার, মজুতদার ও মহাজন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। অধিক মুনাফার লোভে আড়তদার, মজুতদার ও মহাজনবৃন্দ স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানুষদের শোষণ করতে থাকে। একদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক অস্তিত্বের সংকট এবং তার সঙ্গে যোগ হওয়া সামাজিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙ্গালিদের অবদমনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই অনেক বাড়িয়ে দেয়। একটি জাতির সামাজিক বাস্তবতা যখন 'বাঁচা-মরার লড়াই' পর্যায়ে চলে যায়, তখন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ কোনো অবস্থাতেই মুখ্য হতে পারে না এবং এমন একটা পরিস্থিতিতেই অবদমিত বঙ্গাল/বাঙালি সত্তায় যৌথ-অচেতনের উপাদান হয়ে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেক বেড়ে যায়। জাত-পাত ও ধর্মকেন্দ্রিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙালিদের অবস্থা 'খারাপ থেকে আরও খারাপের' দিকেই নিয়ে গিয়েছিল এবং এমন অবস্থায় 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র বাস্তবতাও হয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের উপাদান।

'মাছ-ভাতের বাঙালি সংস্কৃতি', 'ধুতি-শাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' কিংবা 'দোচালা/চারচালা বসতবাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত সাংস্কৃতিক উপাদান। বাংলাদেশের নদী, খাল, বিল, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হত, যা ছিল বঙ্গাল/বাঙালির একমাত্র প্রোটিন-উৎস (পরবর্তীকালে ওলন্দাজরা বঙ্গদেশে ডালের চাষ প্রবর্তন করে) এবং এর ফলে 'মাছে-ভাতে' বাঙালি হওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বাংলাদেশে পাওয়া যেত মাটি, বাঁশ, বেত, খড় ও শন। প্রাকৃতিক কারণেই তাই বঙ্গাল/বাঙালির বসতবাটি হয়েছে মাটি, বাঁশ ও শনের তৈরি এবং কালবৈশাখীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের চালকে করা হয়েছে দোচালা কিংবা চারচালা (বাতাসের প্রবাহ যাতে কৌণিক তল বেয়ে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে)। প্রকৃতি বাধ্যতামূলকভাবে মানুষকে দিয়ে যা করায় তা সংস্কৃতির বিষয় কি না তা নিয়েই সন্দেহ আছে এবং এ কারণে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' তত্ত্ব বাঙালি সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য– এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশের প্রকৃতি দেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি মাঝেমধ্যে দুর্দশার কারণ হলেও এই দেশের জনগণকে দিয়েছেও প্রচুর। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর স্বপ্নভরা আগামীকে দেখিয়ে এই দেশের মানুষের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রকৃতি। অবদমিত জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও বিরহের প্রকাশ হয়েছে লোকসঙ্গীতে, যাত্রায়, উৎসবে ও পার্বণে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি এখনও ইতিহাসের নিয়ম মেনেই ক্রিয়াশীল। এখনও আমাদের দেশের মানুষ ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে; খরা, বন্যা, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলে সুযোগ নিচ্ছে মজুতদার, আড়তদার আর মহাজনবৃন্দ। গ্রামের চাষি আর ভোক্তার মাঝে অবস্থান করছে বিভিন্ন শ্রেণীর দালাল ও মস্তান, আর দালাল-মস্তানদের 'গডফাদার' হিসেবে দেহের চর্বি বাড়াচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত আমলা ও রাজনীতিবিদরা। এদিকে বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ এখন আর 'মাছে-ভাতে বাঙালি' নেই, তারা 'ডালে-ভাতে বাঙালি' আছে কি না তাতেও সন্দেহ আছে; তবে দেশের দুর্নীতিবাজদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ভালোই হয়েছে, তারা 'পোলাও-কোর্মায় বাঙালি' কথাটা চালু করা যায় কি না ভাবছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের (বঙ্গদেশের) প্রাচীন জনগোষ্ঠী 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের ছিল অস্তিত্বের সংকটহীন এক ধরনের কৌম সমাজ। প্রাচীন এই সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়েছিল কৌম-ভিত্তিক লোকধর্মের প্রভাবে। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে দেখা দেয় জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজন এবং এই জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজনই সমাজে নিয়ে আসে অস্তিত্বের সংকট। সমাজে বর্ণভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিভিন্ন মাত্রা অবস্থান করার কারণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকাঠামো (Paradigm) বিবর্তিত হতে থাকে শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে। সমাজে যেহেতু অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অবস্থান করছিল, সেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদ-পরবর্তী বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ কখনোই আর কোনো-এক একক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো নিয়ে এগুতে পারেনি। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকট ও বিভাজন নিয়ে, শুধুমাত্র 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কিংবা 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র মতো ভাষাভিত্তিক কিছু বুলি নিয়েই এগুতে থাকে আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ পরবর্তী মোগল, পাঠান এবং ইংরেজ যুগ বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়েছিল আশরাফ-আফতাব শ্রেণীতে; চিশ্‌তিয়া-সরোওয়ার্দিয়া-নক্‌শবন্দিয়া ইত্যাদি নামের তরিকাও বিভক্ত করেছিল মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন পীর-মুর্শিদের বাণী ও চিন্তাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-বৈপরীত্য ও বিনির্মিত (deconstruction) হয়ে যায় 'মুচলমান-বাঙালি', 'হিন্দু-যবন', 'মুসলমান-মালাউন' কিংবা 'মুসলমান-কাফের'। সমাজের এই ভাঙনের মুখে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কোনো একক সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ বঙাল বা বাঙালি সমাজে হয়নি, বরং এই মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনকে কেন্দ্র করে সমাজের মানুষ হয়ে ওঠে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পরশ্রীকাতর। ইংরেজ শাসন Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করার ফলে হিন্দু-

মুসলমান সংঘাত আরও বেড়ে যায় এবং ইংরেজদের রাজনীতি বাংলাদেশে সৃষ্টি করে 'জমিদার-প্রজা', 'আড়তদার-কৃষক', 'বাবু-রায়ত' ইত্যাদির মতো শোষণের যুগ্ম-বৈপরীত্য।

ইংরেজ শাসন আমলে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন বাঙালি সুবিধাবাদী সমাজ (মুসলমান সমাজ বাঙালি হিসেবে গণ্য হত না এবং এ কারণে রেনেসাঁস আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না)। বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের চেতনা-চৈতন্য কেমন ছিল, তা জানার জন্য প্রবীর ঘোষ রচিত 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' থেকে কিছু অংশ তুলে দেয়া যাক :

> "রেনেসাঁসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁস যুগের পুরোধা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, ডিরোজিও প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতাদের যে মূল্যায়ন হয়ে আসছে তার মধ্যে যুক্তিবিচার বাস্তবিকই স্থান পায়নি। ব্যক্তিপূজার ফলে এঁরা অনেকেই আজ এমনই এক কিংবদন্তি জগতের মহানায়কের রূপ পেয়েছেন যে এঁদের সীমাবদ্ধতা, নেতিবাচক দিক, ভ্রান্ত-চিন্তা, এমনকি দেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো দিকগুলোর প্রতিও বর্তমানের মূল্যায়নকারীরা কিছু বলতে ভয় পান। ফলে জনসমর্থন সচেতন এইসব সমালোচকের কৃপায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এসব নায়ক চরিত্রগুলোর মূল্যায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রেনেসাঁস যুগের নায়কেরা কেউই তাঁদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে বাস্তবিকই 'মহান' হয়ে উঠতে পারেননি। বাস্তবপক্ষে তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁদের অসাধারণ গুণাবলি ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাঁদের এই রেনেসাঁস নামক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল স্পষ্টতই সংখ্যালঘু কিছু মানুষের জন্য তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ এক খণ্ডিত ও আধুনিকতার প্রহসনে আবদ্ধ আন্দোলন।"
>
> (সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা)

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে পুস্কর দাশগুপ্তের মূল্যায়নও উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখেন :

> "এদেশের এই ভণ্ডামির জাতীয় চরিত্র সনাতন। সন্ন্যাসীবেশী রাবণ, ধনা-মনা কি ভাঁড়ু দত্তের অভাব এদেশে কখনো ছিল না, অভাব ছিল না 'বিড়ালতপস্বী', 'বকধার্মিক' বা 'তুলসী বনের বাঘ'-এর। তারপর জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক ইংরেজি

শিক্ষা দ্বিধা-বিভক্ত স্কিজোফ্রেনিক জীবনচর্যার মাধ্যমে এই ভণ্ডামিকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক স্বীকৃতি দিল। উনিশ শতকের মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের মতো দুয়েকজনের বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণের অনেকের জীবনে এই দ্বিচারিতা ভণ্ডামির আখ্যা পেতে পারে। বাঙালির নবজাগরণের, 'আধুনিক' ভারতের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবন এর উদাহরণ। একদিকে কালেক্টর ডিগবির সহকারী হিসেবে উৎকোচ গ্রহণ এবং বিবিধ কূট উপায়ে বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন, অন্যদিকে ধর্ম-সংস্কার ও বিপ্লবের সমর্থন এই দ্বৈত অস্তিত্বের নিদর্শন।

ভারতীয় সমাজ এই ভণ্ডামিকে প্রায়শ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে এই ভণ্ডামি প্রত্যাশা করে। সাহিত্য-স্রষ্টা, যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যাত হন একদিকে 'ঋষি' অন্যদিকে 'সাহিত্য-সম্রাট' বলে। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলা হাস্যকর ভণ্ডামি এবং একজন আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি মোটেই সম্মানজনক নয় একথা কারও মনে হয়নি। তাছাড়া 'সাহিত্য-সম্রাট'– সেক্সপীয়ার, মিল্টন, গ্যাটে, ডিকেন্স, স্তাঁদাল এঁদের কারো নামের আগে কি এ জাতীয় বিশেষণ কল্পনা করা যায়? এই বিশেষণ যে কতটা হাস্যকর তা প্রমাণ হয় যখন শোনা যায় যে 'সাহিত্য-সম্রাট'-এর অনুকরণে তৈরি পরবর্তীকালের বিশেষণগুলি নাট্য-সম্রাট, নাট্য-সম্রাজ্ঞী, যাত্রা-সম্রাট, জ্যোতিষ-সম্রাট, জাদু-সম্রাট, বাউল-সম্রাট ইত্যাদি।

ধনী জমিদার, ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের আগে বিশেষণ বসে 'মহর্ষি', সাংবাদিক ও খবরের কাগজের মালিক শিশির কুমার ঘোষের নামের আগে 'মহাত্মা'। জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অরবিন্দ ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে মানিকতলার বোমার মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে তিনি বন্দি হন। এই মামলার ধৃত প্রায় সবারই কয়েক বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এক ধরনের মানসিক সংকটে বাস্তব থেকে পলায়নের মানসিকতায় কারাগারে অরবিন্দের মরমিয়া উপলব্ধি হয়। তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে গিয়ে সাধনাশ্রম খোলেন। লোকজন তাঁর নামের আগেও 'ঋষি' বসিয়ে দেয়।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৬)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমরা যদি উল্লিখিত কবি ও সাহিত্যিকদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাই, তবে আমরা এক ধরনের মুখোশপরা অস্তিত্বকেই আবিষ্কার করতে পারব। রামমোহন রায়কে দেখব ঘুষখোর আমলা হিসেবে, যিনি নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজ-বন্দনা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করব এক সাম্প্রদায়িক সত্তা হিসেবে, যিনি মুখোশ চাপিয়ে নিজস্ব আসল ও নকলকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক জনগণ-বিচ্ছিন্ন সত্তার, যার ফলে তার সৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের কথা খুব একটা নেই। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনায় বেদ, উপনিষদ ও পশ্চিমের দর্শনই প্রাধান্য পেত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে তিনি হয়তো-বা ছিলেন প্রচণ্ডভাবে গুরুতন্ত্রে বিশ্বাসী। লালন ফকিরের সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল শিলাইদহে এবং লালনের মাধ্যমেই লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, এমন চিন্তা আমরা করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন জানতে পারি যে লালন রচিত দুইটি গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ পড়ার জন্য নিয়ে আর কখনো ফেরত দেননি (সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলিকাতা ২০০৭), তখন ব্যাপারটিকে রবীন্দ্র-চরিত্রের সাথে মেলাতে কষ্ট হয়। যাহোক, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রবীর ঘোষ ও পুস্কর দাশগুপ্তের কিছু মূল্যায়ন পাঠকের অবগতির জন্য তুলে দেয়া হল।

ক.

"রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই–

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য কর।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা কর। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এস।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান কর। ইংরেজদের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ কর।

(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত কর।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন কর।"

(সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা ১৯৯৩)

খ.

"বাঙালি/ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বিধাবিভক্ত জীবনচর্যা, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের প্রতীকী নিদর্শন হিসেবে বাঙলা ভাষার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বিশেষ অর্থবহ। কাঁঠালপাড়ার নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঘরে' ধুতি ও ফতুয়া পরতেন, অথচ চোগা-চাপকান পরা শামলা মাথায় প্রথম বাঙালি গ্র্যাজুয়েট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'বাইরের' বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বাদ দিয়ে তাঁর আর কোনো ছবি আমাদের চোখে পড়ে না।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

গ.

"কবি রবীন্দ্রনাথ ভূষিত হয়েছেন 'বিশ্বকবি' 'কবিগুরু' ও 'গুরুদেব' পদবিতে। বিশ্ব-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় রোমান্টিক কবিদের একজন। এছাড়া উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান– সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে অনন্য সমৃদ্ধি দান করেছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের প্রথা ও প্রত্যাশার নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পস্রষ্টা প্রাত্যহিক জীবনে আলখাল্লা পরে আর তাবৎ ব্যাপারে বাণী দিয়ে সারাজীবন গুরুদেব-এর ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে তাঁর স্থান উনিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যে ভিক্তর য়ূগোর স্থানের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ভিক্তর য়ূগো কবি, সাহিত্য-স্রষ্টা– 'গুরু' নন, 'ঋষি' নন, 'সন্ত' নন। ভণ্ডামির পীঠস্থান এই দেশ এই সমাজের নিয়ন্ত্রণে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা, স্ববিরোধ, আবেগ-অনুভূতি সব আলখাল্লার আড়ালে গোপন রেখে বাল্মিকী, কালিদাসের মিথিকেল জীবনযাপন করতে বাধ্য হলেন।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো পাঠ শেষে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সামাজিক লোকজনের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে। শুধুমাত্র ভাষা, খাদ্যাভ্যাস কিংবা নাচ-গান দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝানো যায় না, কারণ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লুকানো থাকে মনের গহীন গভীরে। অবদমিত, বিভাজিত এবং অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে ঠিকই এবং ব্রিটিশ শাসন আমলে সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল পেরিয়ে বঙ্গালরা পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বন্দি পশ্চিমবঙ্গ।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হলেও, মূলত এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা যে খুব

একটা সঠিক ছিল না, তা বুঝতে বঙ্গালদের খুব একটা সময় লাগেনি। তবে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বঙ্গাল বা বাঙালিদের মনস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতিবোধ ছিল অসম্পূর্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ কারণে তাদের ইতিহাসকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের সংকটও ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গাল বা বাঙালিরা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায়ই ভাবত,– 'আমরা কি মুসলমান? নাকি মুসলমান বাঙালি? নাকি শুধুই বাঙালি?'। বঙ্গাল বা বাঙালিদের যে আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল, তাকে মনস্তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক সংকট হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। আর এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট বাংলাদেশের বঙ্গালদের মনে জন্ম দিয়েছিল এক ধরনের অপসংস্কৃতির। সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে অহেতুক টেনে এনে বঙ্গালরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বর্জন করতে চেয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন "নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান"-এর 'মহাশ্মশান' শব্দটির জায়গায় যোগ করা হয়েছিল 'গোরস্তান' এবং সাংস্কৃতিক সংকট আরও প্রকট করার জন্য 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' আমদানি করার চেষ্টা করা হয়েছিল অযৌক্তিকভাবে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংকটাপন্ন সংস্কৃতিতে 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' প্রতিষ্ঠা পায়নি, তবে মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক কিছু সাংস্কৃতিক ভুলকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন পুরুলিয়ার (পশ্চিমবঙ্গের) কাজী নজরুল ইসলাম (শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে), অথচ বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হিসেবে বাংলাদেশের অনেক বেশি আপনজন, কারণ তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল শিলাইদহে, শাহজাদপুরে কিংবা পদ্মা আর গড়াই নদীর বুকে বোটে ভ্রমণরত অবস্থায়। আমরা, বঙ্গালরা, এক অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের আওতায় থেকে আমাদের সংস্কৃতির সত্যকে আবিষ্কার করতে পারিনি, বরং অবদমিত মনস্তত্ত্বের কারণেই আমরা সমাজে অবস্থান করছি দুর্নীতিগ্রস্ত, পরশ্রীকাতর আর স্বার্থপর মন নিয়ে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয় এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন প্রাদেশিক পরিষদের মাননীয় স্পিকারকেও রাজনীতিবিদ নামধারী কিছু মস্তানের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

১৯৭১ সালে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও আমাদের অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এর ফলে দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বেশ কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা, মস্তান, আমলা এবং তাদের সহযোগী জনসাধারণ লুটপাটতন্ত্র কায়েম করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসাধারণ নেতা ছিলেন; কিন্তু দেশ পরিচালনায় তিনি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেননি। অবদমিত

সাংস্কৃতিকসত্তার অধিকারী হয়ে তিনিও স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে যেতে পারেননি, যদিও তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিলেন– 'চাটার দল সব খেয়ে ফেলল... । আমার কম্বলটা কই?'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন । এবং এ দুষ্কর্মে সহযোগী ছিল আওয়ামী লীগেরই কতক সুবিধাবাদী নেতা আর সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক প্রাক্তন ও কর্মরত সদস্য । বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর তার দলের অন্যতম প্রধান নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সদস্য নতুন সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাদের এই অপকর্ম খুব বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেননি । তবে ক্ষমতায় অবস্থান করে খোন্দকার সাহেব বঙ্গাল ও বাঙালিদের উপহার (!) দেন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামে এক তত্ত্ব, যার ফলে আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের প্রাচীনতম (!) উপাদান হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার ঘটনা, আমরা ভুলে যাই আমাদের বঙ্গাল সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক প্রাচীন ইতিহাসকে । 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' যেহেতু সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকেও বদলে বিদেশি ভাষাযুক্ত করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করা হয় । খোন্দকার মোশতাক আহমদ খুব বেশি দিন বাংলাদেশের মসনদের দখল রাখতে পারেননি, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফের এক ব্যর্থ ক্যুয়ের পরিণতিতে, সিপাহী-জনতার বিদ্রোহের মাধ্যমে, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে নেন (ব্যাপারটিকে 'দখল' বলা যায় এ কারণে যে, ১৯৭১-পরবর্তী সব রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল সুবিধাবাদী চরিত্রের । বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লাল বাহিনী, মুজিব বাহিনী ইত্যাদির সংগঠন, খোন্দকার মোশতাকের মসনদ দখল, জিয়াউর রহমানের আগমন ইত্যাদি কোনোটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিল না) । জেনারেল জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর তত্ত্ব গ্রহণ করে, 'money is no problem'-তত্ত্ব যোগ করে সরকার চালাতে সচেষ্ট হন । ব্যক্তিগত জীবনে জিয়াউর রহমান খুবই সৎ থাকলেও, তার দলে লোকজনের দুর্নীতিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন । ১৯৮১ সালে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জিয়াউর রহমান নিহত হন চট্টগ্রামে । তার মৃত্যুর পর জিয়াউর রহমান-সৃষ্ট বিএনপি অল্প কিছুদিন ক্ষমতায় ছিল জাসটিস সাত্তারের নেতৃত্বে । তারপর এক ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ । বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী নেতাদের সাথে নিয়ে একসময় 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি' নামে একটি দলকে সংগঠিত করেন এরশাদ । হু মু এরশাদ ও তার দলের বেশিরভাগ লোকই ছিল সুবিধাবাদী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত এবং এর ফলে ১৯৯০ সালে এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে । এরশাদ সরকারের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে; কিন্তু রাজনীতিবিদ ও তাদের

চেলা-চামুণ্ডার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার কারণে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়। 'হজুগে বাঙাল' কিংবা 'হুজ্জতে বাঙাল' জনগণ সব ধরনের যুক্তি ও বাস্তবতা অগ্রাহ্য করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে থাকে, দেশের জনগোষ্ঠী অযথাই ভাগ হয়ে যায় 'আওয়ামী পন্থী' ও 'বিএনপি পন্থী' হিসেবে। এ সুযোগে সাম্প্রদায়িক শক্তি জামায়াত তাদের কার্যক্রম বেশ ভালোভাবেই চালাতে সমর্থ হয়।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক বাহিনীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এই সরকার ক্ষমতায় এসেই বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও অন্যান্য দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা এবং তাদের সহযোগী আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর বঙ্গাল জনগণ জানতে পারে তাদের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ। জনগণের সম্পদ হাজার হাজার কোটি টাকা কীভাবে যে লোপাট করা হয়েছে, তা জানতে পারে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অধিকারী বঙ্গাল জনগণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায় (কিন্তু এ কথাও সত্য যে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই বিভিন্ন মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত)। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে অনেক চিহ্নিত নেতা বিএনপি আর আওয়ামী লীগ ভেঙে নতুন সংগঠন তৈরি করতে সচেষ্ট হন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের টক-শোতে 'পবিত্র আত্মা' হিসেবে উপস্থিত হন অনেক চেনা-অচেনা দুর্নীতিগ্রস্ত মহাপুরুষ (!)। সুশীল সমাজের মুখোশ এঁটে অনেক সুবিধাবাদী লোকজনও খুব ঘন ঘন বিবৃতি দিতে থাকে তাদের পাপকে লুকিয়ে রাখতে।

যে ঘটনাসমূহ ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হল, তার মাঝেই লুকিয়ে আছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংস্কৃতির উপাদান। জাতীয় কিংবা ব্যক্তিগত সংস্কৃতি যে শুধুমাত্র নাচ-গান, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, পূজা-পার্বণ, ভাষা ইত্যাদি নয় তা বুঝা যাবে ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলেই। হাজার বছরের অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কারণেই বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে দুর্নীতি করার সমস্ত উপাদান। এ প্রসঙ্গটি আরও একটু খোলাসা করার জন্য সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

সুন্দর জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন এমন এক ভারসাম্যের অর্থনীতি, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার বাঁচার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাবে। যখন মানুষ এমন সুবিধা পায় না, ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'– এই প্রবচনটি গ্রাহ্য করে একজন হতদরিদ্র মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদেই হয়ে উঠবে দুর্নীতিগ্রস্ত। আমাদের দেশের ইতিহাসে যে জাত-পাত কেন্দ্রিক শ্রেণী-বৈষম্য

ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই অস্তিত্বের সংকট শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই জন্ম নেয় সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং এই সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রবহমান বর্তমানই হল আমাদের দেশের নেতা, নেত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান, শ্রেণীসংগ্রামরত মানুষ এবং সমগ্র জনসাধারণ। আসলে আমাদের যৌথ মনস্তত্ত্বে অবস্থান করছে এমন এক অপসংস্কৃতির উপাদান, যার ফলে আমরা আর আমাদের সঠিক মানবিক উপাদানসমূহকে উদ্ধার করতে পারছি না।

একজন হতদরিদ্র মানুষ দুর্নীতি করে কোনো-একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আরও সুবিধা নিয়ে, দুর্নীতি করে হয়ে ওঠে উচ্চ-বিত্তের মানুষ। একজন মানুষ যখন 'টাকার কুমির' হয়, তখনও তার 'অস্তিত্বের সংকট' কমে না, বরং বেড়ে যায়। দুর্নীতি করে জমানো সম্পদ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করেই তার 'অস্তিত্বের সংকট' তৈরি হয় এবং এমন অবস্থায় সম্পদ রক্ষার কারণেই সে মূল ক্ষমতা-কাঠামো বা Power Structure-এর অংশ হতে চায় (Power Structure সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক মিশেল ফুকোর দর্শন পড়ে দেখতে পারেন)। আমাদের দেশেও যারা 'টাকার কুমির' হয়েছেন দুর্নীতি করে, তারা ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য সংসদ সদস্য হয়েছেন নমিনেশন ক্রয় করে, হয়েছেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী কিংবা রাজনৈতিক দলের মহা-মস্তান। সম্পদ রক্ষার জন্য তারা লালন-পালন করেছেন বন্দুক-পিস্তলওয়ালা মস্তান বাহিনী। অনেক সময় ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য তারা প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্র কিংবা মালিক হয়েছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের। জানুয়ারি ১১, ২০০৭-পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করলে পাঠক উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাবেন।

অর্থনীতি যে মানুষের মনস্তত্ত্ব সংগঠিত করে এবং 'পাওয়া-না-পাওয়া'-কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় 'অবদমন', এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই অবদমন যখন 'যৌথ মনস্তত্ত্বের' অংশ হয়ে যায় সংস্কৃতির উপাদান, তখনই সমাজ সংগঠন ভেঙে পড়ে। আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বেলায় অস্তিত্বের সংকট আর অবদমন-ঘটিত পতন ঘটেছে এবং এমন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপাদান হল দীর্ঘকাল ধরে সমাজকে Social Psychotherapy দেয়া। ব্যাপারটি কীভাবে করা যাবে, তা নির্ধারণ করবেন আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তবে লেখকের মতে, আমাদের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, অন্যান্য মাস-মিডিয়া এবং সত্যিকার সুশীল সমাজ এ ব্যাপারে কাজ করতে পারেন এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য যথাযথ পাঠ-কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচিন্তন

সব শেষে, উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে পারি।

১. সংস্কৃতি শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য, নাচ-গান, জীবন ধারণ প্রণালী, ধর্ম, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নয়, সংস্কৃতির মূলে অবস্থান করে সামাজিক মানুষের যৌথ মনস্তত্ত্ব।

২. বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অনেক উপাদান ঢুকে গেছে জাত-পাত-কেন্দ্রিক শোষণের ফলে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা নষ্ট হওয়ার কারণে এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে।

৩. আমরা যাদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করি, আমরা যাদের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ভাবি, তাদের মনস্তত্ত্ব ও কার্যক্রমও বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র বুঝে নিজেদের শুধরাতে হবে।

৪. আমাদের সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির উপাদানসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজন Social Psychotherapy-র। এ ব্যাপারে দেশের মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাদের কাজ হবে যৌথ মনস্তত্ত্বের অবদমন দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

৫. আমাদের দেশের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও ও অন্যান্য মাস-মিডিয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রচারের মাধ্যমে Social Psychotherapy কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

সংযোজন

'বাঙালি' বা 'বাংলাদেশী' শব্দযুগল দিয়ে আমাদের জাতিসত্তাকে প্রকাশ না করে কেন 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহার করা হল, এ নিয়ে অনেক পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রবন্ধের লেখক হিসেবে ব্যাপারটি যুক্তি এবং ইতিহাসের সত্য-বচনসহ উপস্থাপন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ছিল সুপ্ত 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' প্রত্ন-ছায়া, যা ১৯৭৫ সালের পর ঐতিহাসিক মিথ্যা হিসেবে হঠাৎ উপস্থিত হয়। এ তত্ত্বের মূলে রয়েছে এক সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, যা কখনোই বাঙালি বা বঙ্গালদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্যকে উপস্থাপন করে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের ইতিহাসকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত করলেও, আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে।

'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-ও 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' মতো সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ পায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, যখন বঙ্গদেশে 'হিন্দু-মেলা' কিংবা 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস' নামে কিছু সাম্প্রদায়িক

আন্দোলনের বিকাশ লাভ করেছিল। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বঙ্গীয় জনসাধারণকে 'বাঙালি' ও 'মুচলমান' নামক দুটি সাম্প্রদায়িক সত্তায় বিভক্ত করে ফেলেছিল, যার ফলে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতির' সাথে যুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসাধারণ।

যে কোনো জাতির সঠিক আত্মপরিচয়, নৃতাত্ত্বিক উৎসমূল এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আবশ্যিকভাবে শিকড়-সন্ধানী হতে হয়। আমরা যদি জাতি হিসেবে আমাদের উৎস বা মূল বিচারে আনি, তবে ১৯৭৫ সালের সাম্প্রদায়িক চিন্তার ফসল 'বাংলাদেশী জাতি'র অন্তর্ভুক্ত আমরা নই, কিংবা অষ্টাদশ শতকের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' আমাদের সঠিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয় না। বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশের হাজার বছরের ইতিহাস বিবেচনায় আনলে আমরা দেখতে পাব যে প্রাচীন বঙ্গদেশের সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্তি, সূক্ষ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের আদিম জনপদ সমন্বয়ে সংগঠিত বৃহৎ-বঙ্গের বঙ্গাল সম্প্রদায় বা জাতি-ই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ এবং এ সত্যকে মেনে নিয়ে এবং নৃতাত্ত্বিক ও জেনেটিক বিশ্লেষণের যৌক্তিক উপাদানসমূহ গ্রাহ্য করে, বঙ্গাল জাতির উত্তরসূরি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে 'বঙ্গাল জাতি' হিসেবেই বিবেচনা করব। কোনো জাতির ইতিহাস তিরিশ, পঁয়ত্রিশ কিংবা দুইশত বছরের পুরনো হয় না, একটি জাতির সঠিক উৎসমূলের ইতিহাস হয় হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে। আমরা যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হই, তবে আমাদের চিন্তা-চেতনাও হবে অসাম্প্রদায়িক আর আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে নিয়ে যেতে পারব হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসে।

আমার এই জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব হয়তো-বা বঙ্গীয়-গৌর, গাঢ়-শ্যাম বা উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা আর্যদের (!?) পছন্দ হবে না; কিংবা যারা নিজেদের মোগল, পাঠান কিংবা আরব বংশের উত্তরসূরি মনে করেন, তারাও আমার এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু আমি ঐ সব আর্য, পাঠান, মোগল ও আরবদের জেনেটিক ল্যাবরেটরিতে যেতে বলব এবং তারা জিন-বিশ্লেষণেই দেখতে পাবেন যে তারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে এসে 'বঙ্গাল' জিন-এর সংকর বা জাতি-মিশ্রণ-জাত ফসল।

সব শেষে একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধের অনেক স্থানে 'বঙ্গাল' শব্দের পাশাপাশি 'বাঙালি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন লেখক সমকালকে গ্রাহ্য করে। যদি কেউ দু'শত বছরের পুরাতন 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-কে পরিহার করতে রাজি না হন (যদি সঠিক যুক্তি থাকে), তবে তা লেখকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রবক্তাকে হতে হবে নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক এবং তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রেক্ষাপটে শিকড় বা উৎসমূল হিসেবে অবস্থান করছে 'বঙ্গাল জাতীয়তাবাদী' উপাদান ও ঐতিহ্য।

[পাঠক যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তবে লেখক রচিত এই 'ইহা শব্দ' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ' পড়ে দেখতে পারেন ।]

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙালিত্ব, কলিকাতা ১৯৯২

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলিন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫

৩. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা ১৯৬৫

৪. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা ২০০৬

৫. গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, গণমুক্তি, ঢাকা ২০০৬

৬. গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা ২০০৬

৭. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা ১৪০১

৮. নীহাররঞ্জন রায়, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৭৯

৯. পবিত্র সরকার, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৯১

১০. পুস্কর দাশগুপ্ত, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫

১১. প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা ১৯৯৩

১২. বাংলা একাডেমী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৭

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলকাতা ২০০৫

১৪. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, ঢাকা ২০০৬

১৫. মঈন চৌধুরী, শব্দের সম্ভাবনা, ঢাকা ২০০৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জয় বুকস, ঢাকা ১৪০৬

১৭. সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলকাতা ২০০৭

১৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষাচার্য), সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা ১৯৭৬

১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫

২০. হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫

২১. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৯৭৯

রু শো তা হে র

.....

বিশ্বাস নাকি অপবিশ্বাস

If we do discover a complete theory, it should in time be under standable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall, all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason- for then we would know the mind of God.
-Stephen W. Hawking

জনপ্রিয় একজন লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই। অবশ্য জনপ্রিয়তা বৌদ্ধিক অবস্থান থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অদক্ষতা দেখাননি পৃথিবীর প্রায় জনপ্রিয় সব ব্যক্তিত্ব। আবার দু' একজন জ্ঞানসাধক যে জনপ্রিয় হননি, তা কিন্তু বলছি না। সেক্ষেত্রেও জনপ্রিয়তার ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ জ্ঞানের মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে তৎকালীন মার্কিন রমণীদের অতিউচ্ছ্বাসকে তিনি নিজেই (আইনস্টাইন) ফ্যাশন বলে অভিহিত করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, খেলাধুলা, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মতো লেখনী সংস্কৃতি জনপ্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কোনো জ্ঞানতত্ত্ব জনগণের প্রিয় এমনকি অতিপ্রিয় হওয়া দোষের নয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা যখন কোনো জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচিতির মূল্য হয়, তখনই তা প্রশ্নবিদ্ধ। যা হোক বাংলাদেশের জনৈক জনপ্রিয় লেখকের মন্তব্য "মানুষের ক্ষমতার উৎস কোথায়? মানুষের ক্ষমতার উৎস তার মস্তিষ্ক। আমি তো নাস্তিক নই। বহু চেষ্টা করেছি নাস্তিক হওয়ার জন্য। নাস্তিক হতে চেষ্টা লাগে। কঠিন চেষ্টা। কঠিন চেষ্টা ছাড়া কেউ নাস্তিক হতে পারে না। আমি আমার যৌবনে এবং এই বেলাতেও অনেক পরিশ্রম করেছি নাস্তিক হওয়ার জন্য। চিন্তা-ভাবনা করেছি নাস্তিকের মতো। যতই চিন্তা করেছি, ঘুরে ফিরে একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতে হয় যে, না এটা তো এভাবে সম্ভব নয়। কিছু একটা থাকতে হবে। অবশ্যই কিছু একটা থাকতেই হবে। যে মানুষ ঈশ্বর আছে কি নাই সেটা নিয়ে চিন্তা করতে পারে, আস্তিকতা নিয়ে চিন্তা করতে পারে, নাস্তিকতা

নিয়ে চিন্তা করতে পারে, এই মানুষ আপনা-আপনি তৈরি হয়ে গেছে ইলেকট্রন-প্রোটনের ধাক্কাধাক্কিতে, এই থিওরি আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।" দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি লেখার ব্যাখ্যা হল প্রত্যক্ষভাবে অলৌকিক কোনো মহাগ্রন্থের অনুসারী না-হয়েও কীভাবে মানবমস্তিষ্ক বন্দি হয়ে আছে চিন্তার আলো-আঁধারীতে তা দেখানো। এ মস্তিষ্ক আবার চেষ্টায় করছে, কঠিন চেষ্টা চিন্তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে সেই সঙ্গে অবিশ্বাসী হতে। কিন্তু পারছে না, তাকে ঘুরেফিরে একই জায়গায় ফিরে আসতে হচ্ছে। এবং সে স্বীকার করছে এভাবে চিন্তা করা সঙ্গত নয়। কিছু একটা থাকতেই হবে। মানে কী দাঁড়ায়, এভাবে বিশ্বাসের বন্দিদশা অতিক্রম করে অবিশ্বাসী হতে গিয়ে বিশ্বাসের জায়গাই শেষপর্যন্ত পাকাপোক্ত হল। এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপাত ব্যাখ্যায় মনে হবে, এই শ্রেণীর বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসকে পরখ করে নেয় অবিশ্বাসের নিক্তিতে। আসলে পুরো প্রক্রিয়াটিই ভ্রান্তিযুক্ত। তারপরও বিশ্বাসের অমানিশায় অবিশ্বাসী হওয়ার প্রবণতাকে সত্যিকারার্থে সাহসিকতা বলতে হবে। এবং এর মধ্য দিয়ে বিরলপ্রজ মানব-মানবীর অসংখ্য দৃষ্টান্তও দেখা যায়। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এমন আশাবাদও ভিত্তিহীন নয়। আর এদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধও প্রশ্নাতীত। কিন্তু বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাসের যে বিতর্ক, তার মধ্য দিয়ে মৌলিক একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর সেটি হল, আমি কী বিশ্বাস করি অথবা কী করি না? উল্লেখ্য, এখানে কেন বিশ্বাস করি কিংবা করি না সেই প্রসঙ্গ কিন্তু আগে আসার নয়। যদিও এতদিন দার্শনিকরা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে 'কেন'-কে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন 'কী'-কে বাদ দিয়ে। নেতিবাদে ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাসের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, অস্তিত্বশীল কিছু একটাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল আমরা যতই অবিশ্বাসী অবস্থানে আপসহীন থাকব ততোই বিশ্বাসবাদ সুদৃঢ় হবে। অর্থাৎ অবিশ্বাসী হতে গিয়ে প্রকান্তরে আমরা বিশ্বাসবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছি। এর একটি ভৌত দৃষ্টান্ত দিতে চাই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হল রোগ নির্ণয় বা ডায়াগনোসিস-পরবর্তী ওষুধ প্রদান। কিন্তু ডায়াগনোসিসে ভুল হতে পারে। এই ভুল যতটা না যান্ত্রিক ত্রুটির, তার চেয়ে বেশি যন্ত্র ব্যবহারকারীর অদক্ষতাজনিত। সেক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস ভুল হবে। ফলে রোগীকে ভুল চিকিৎসা প্রধান করা হবে এবং এর পরিণতি কী হবে তা আমরা জানি। তবে বিরল ঘটনা হিসেবে ভুল চিকিৎসার পরও কেউ আরোগ্য লাভ করতে পারে। সেটি কেন ঘটে, তা-ও ব্যাখ্যাযোগ্য। তবে গতানুগতিক পদ্ধতিতে সেই রহস্যোদ্‌ঘাটন সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে ভুল চিকিৎসার পরিণতিতে শুধু দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্তরা নয়, সাধারণ ও নিরাময়যোগ্য ব্যাধিও দুরারোগ্য ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়ে কারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে মৃতপ্রায় রোগীর চিকিৎসক যদি দাবি করেন, চিকিৎসায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি, তারপরও রোগীকে বাঁচানো গেল না। কারণ, মৃত্যু কখন হবে, তা পূর্বনির্ধারিত। আর রোগব্যাধি উছিলামাত্র। কিন্তু চিকিৎসকের উপদেশবাণী গৃহীত হবে না। কারণ, তিনি

ভুল চিকিৎসা করেছেন এবং রোগীর মৃত্যু রোগ নির্ণয়ে তার অযোগ্যতার অনিবার্য পরিণতি। আসলে মৃত্যু কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ঘটনাই নয়। ফলে ঘটনা সংঘটনের আড়ালে যে রহস্য, তা কার্যকারণ-ঊর্ধ্ব নয়। এর পেছনে কোনো সুপার পাওয়ারের কারসাজিও নেই। তারপরও দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত অনেক ঘটনা তাৎক্ষণিকতা ও আকস্মিকতায় এত রহস্যময় যে সেগুলোকে আমরা অলৌকিক বলে থাকি। যেমন কোনো দুর্ঘটনায় কিংবা লঞ্চডুবে মা-বাবা দু'জনই মারা গেল। কিন্তু মাত্র ৪ মাস বয়সী শিশুকে জীবিত অবস্থায় দুর্ঘটনার ৩ দিন এমনকি ৭ দিন পর পাওয়াকে আমরা কী বলব! কারণ শিশুটির বেঁচে থাকার সব শর্তই কিন্তু এখানে কার্যকারিতা হারায়। ফলে পত্রিকার শিরোনাম হয় দুর্ঘনার ৭ দিন পর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া ৪ মাসের শিশু উদ্ধার। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনাকে অলৌকিকতার প্রলেপ দিয়ে লৌকিক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ রুদ্ধ করা হয়। একার্থে আমরা একটি মীমাংসায় পৌঁছে যাই। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিষয়টি অমীমাংসিত কিংবা আমরা যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছি তা এক পর্যায়ে আর কাজ করছে না। উল্লেখ্য, মানুষের আচরণ তার সৃষ্ট জ্ঞানের অপেক্ষক। কথিত অলৌকিক ঘটনার পেছনে অধিকাংশ ফ্যাক্টরকে হয়তো আমাদের জ্ঞানের স্তর ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা কোনো সমস্যা নয়। এমনকি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এটি কোনো ব্যর্থতা নয়। আসলে ঘটনার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটনে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রায়শ ভাসা-ভাসা প্রকৃতির হয়ে থাকে। আমি কিন্তু দাবি করছি না অধিকতর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সংঘটিত সব ঘটনার রহস্যবিযুক্ত হয়ে যাবে। কারণ মানুষের জ্ঞানের স্তর এখনও সেই দশায় উন্নীত হয়নি। তবে মানবমস্তিষ্ক যেভাবে ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, তার ভিত্তিতে আমরা আশা করতে পারি নিকট ভবিষ্যতে অনেক ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা সক্ষম। এমনকি সেইসব ঘটনার নিয়ন্ত্রণসাধ্যতাও মানুষের আয়ত্তে আসবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়ে অব্যাখ্যাত সব ঘটনাকে আমরা কীভাবে চিহ্নিত করব? এবং কেন করব? বিশ্বাসের উৎস কোথায়– এ প্রশ্নের জবাব আমাদের পূর্বপুরুষ নিয়ান্ডার্থাল মানবের কাছে পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিয়ান্ডার্থাল মানবরা সীমিত পরিসরে জগৎ-জীবন নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল এবং সেটি ছিল জৈব বিবর্তনের অন্ধ গলিপথ অতিক্রম করে বুদ্ধিগত আলোয় উত্তরণের অনিবার্যতা। কিন্তু নিয়ান্ডার্থাল কার্যকারণের পরিবর্তে সব ঘটনার স্রষ্টা কল্পনা করে। এই তথ্যের সূক্ষ্মতা যাচাইয়ে কিংবা তত্ত্বকে ঢেলে সাজাতে প্রত্নতত্ত্বের অগ্রগতি জরুরি। হয়তো এর ফলে নিয়ান্ডার্থালদের স্রষ্টাতত্ত্বে অনেক সংশোধন করতে হবে। যা হোক, আজকে যে বিশ্বাস নিয়ে মাতামাতি চলছে এমনকি রক্তের বন্যা বইয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে, তার উৎস আসলে নিয়ান্ডার্থালদের অজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধিগত দৈন্যদশা। এটি স্রেফ অসঙ্গতি, অপবিশ্বাস। লোকাতীত মহাগ্রন্থ বলে যা দেখা যায়, তা মূলত নিয়ান্ডার্থালদের অপবিশ্বাসকে ঘিরে দীর্ঘ সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মোটাতাজা হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে মস্তিষ্ক গবেষণার সর্বশেষ অগ্রগতিতে দেখা যায়,

মানবমস্তিষ্কের অলেখা অংশে অন্যসব সামাজিক আচরণের সঙ্গে বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাস লেখা হয়ে যায়। এমনকি অপবিশ্বাস অগ্রাধিকার পায়। পরন্তু, অপবিশ্বাসের দীর্ঘ বিস্তারে কিংবা বংশ পরম্পরায় অপবিশ্বাস লালন করতে গিয়ে বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস বিতর্ক তীব্র হয়েছে। অপবিশ্বাসের বিপরীতে যে কোনো ভাবনাই অবিশ্বাস বলে প্রত্যাখ্যাত এমনকি ঘৃণিত-নিন্দিত হয়। বস্তুত, এর ফলে মূল প্রসঙ্গই ফোকাসে আসে না। বরং অর্থহীন সব বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে মানুষ। আচ্ছা, আমরা একটি পরীক্ষার আয়োজন করতে পারি। একদল শিশুকে গতানুগতিক সমাজের বিপরীত পরিবেশে পরিচর্যার প্রকল্প। যদিও সেই পরিবেশ বিপরীত বা অস্বাভাবিক নয় বরং স্বাভাবিক ও সহজাত মানব জাতির বিকাশে। স্রষ্টা প্রসঙ্গ যাতে সেই শিশুদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করে তা এই প্রকল্পের প্রধান শর্ত। আবার তারা যেন বুঝতে না পারে ভিন্ন একটি পরিবেশে তাদের পরিচর্যা চলছে কিংবা তাদের কাছে কিছু একটা গোপন রাখা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ সময় অতিক্রমের পর আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারব কী বিস্ময়কর সব প্রশ্ন রাখছে প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ভিন্ন আবহে বেগে ওঠা শিশুরা। কী অমিত সম্ভাবনাকে গলা টিপে আমরা হত্যা করছি প্রতিনিয়ত কখনও পিতামাতা, অভিভাবক কখনও-বা শিক্ষকের আসন থেকে, তা খানিকটা আঁচ করতে পারব। প্রকৃতি ও বিশ্বজগতকে কেন কাউকে বানাতে হয়েছে কিংবা হয়নি– এ ধরনের দার্শনিক প্রহেলিকা থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিগত বিনির্মাণে অংশ নিত মানবশিশু। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের পরিবেশের আয়োজন হয়তো সম্ভব নয়, কিংবা সব শর্ত পূরণ করা যাবে না যথাযথভাবে। তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমনকি পারিবারিক শিক্ষায় শিশুকে স্রষ্টানিরপেক্ষ রাখা চাই। শিশুর অন্তহীন বিকাশমানতায় কিংবা প্রশ্ন উত্থাপনে বিশ্বাসের মোড়কে অপবিশ্বাসের মাদকতা ছড়িয়ে দেবে না– এই নিশ্চয়তাই যথেষ্ট। সে জিজ্ঞাসার উত্তর জিজ্ঞাসা এই ধারায় বড় হলে সমস্যা হবে না। হয়তো-বা প্রয়োজনমতো সে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সহায়তা নেবে। এক্ষেত্রে শিশুর ইচ্ছাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে তাদের পথরোধ করতে পারি না। অথচ আমরা রীতিমতো জবরদস্তি করছি। কাদামাটি সদৃশ তাদের মস্তিষ্কের অলেখা অংশে অপবিশ্বাস গেঁথে যায় এবং তা পরবর্তী সময়ে ঘষামাজার পরও দূরীভূত হতে চায় না। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত খোদ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই দেখা যায়, যেমন প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেও অনেক বিজ্ঞানী একেকভাবে কথিত সুপারপাওয়ারের অন্ধকার অতিক্রম করতে পারেন না। লেখক, সাহিত্যিক ও মানব শাখায় বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা আরও বেশি সত্য। সভ্যতা যখন অপবিশ্বাসের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তখন সুপারপাওয়ারে বিশ্বাসীরা এগিয়ে আসছে নতুন ব্যবস্থাপত্র নিয়ে। তারা বলছে, বিশ্বাসের উগ্রতা না থাকলে, তা তো সমস্যা নয়। কিছু একটা অবশ্যই থাকা চাই। নচেৎ মানুষ অবলম্বনহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু বিশ্বাসের মোড়কে অপবিশ্বাসের যে রমরমা অবস্থা কিংবা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে অপবিশ্বাস যে সুদৃঢ় হচ্ছে, তার বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কিছু একটা থাকা চাই। এ তত্ত্বের প্রবক্তারা উদাসীন। ভাবখানা এমন যে, অজ্ঞতাকে সযতনে রাখিব ঢেকে। যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার, এটি নিঃসন্দেহে জৈবিক উক্তি। বিকাশমান প্রজাতি হিসেবে মানুষের সঙ্গে এ ধারণার বিরোধ স্পষ্ট। কারণ, মানুষ যতটা জৈবিক তার চেয়েও অধিক বুদ্ধিনির্ভর। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কিছু মানুষ বৌদ্ধিক আর জৈবিককে একাকার করে ফেলে। তারা যৌবনে বিপ্লবী ও অবিশ্বাসী। কিন্তু বার্ধক্যে নিথর ও বিশ্বাসী। অপবিশ্বাসী। তাদের অবস্থা বানরের উঠানামা করে তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে উঠার পরিবর্তে এক লাফে বাঁশের চূড়ায় উঠতে গিয়ে বাঁশের পাদদেশে পতিত হওয়ার সঙ্গে তুল্য। তাদের অধঃপতন নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে পরবর্তী প্রজন্মে। রুদ্ধ করে অন্তহীনভাবে বিকাশের পথ। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত এক সময়ের তুখোড় অনেক কমিউনিস্টের অতিধার্মিক বনে যাওয়া।

নভেম্বর ২০০৫ লন্ডনে অনুষ্ঠিতব্য, সোসাইটির ফর নিউরোসায়েন্স-এর সম্মেলনে আয়োজকরা বৌদ্ধধর্মগুরু দালাইলামাকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানান। আয়োজকরা বলেছেন, বৌদ্ধদের ধ্যান-কৌশল কীভাবে মস্তিষ্কের ওপর ক্রিয়া করে, তা আলোকপাত করবেন দালাইলামা। কিন্তু নিউরোসায়েন্সের ব্যাখ্যানুযায়ী ধ্যান ও মেডিটেশনের ইতিবাচক কোনো ভূমিকা নেই মানব-মস্তিষ্কের ওপর। অধিকন্তু এটি এক ধরনের ব্যাধি। আমরা জানি মানবাত্মার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ আত্মা বলতে কিছুই নেই। সুতরাং আত্মা দেহবিযুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে পারে– এটি এক ধরনের গাঁজাখুরি তত্ত্ব। আর এই ধ্যানের মাধ্যমে কেউ কেউ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত তত্ত্বও পেয়েছেন ওপরওয়ালার থেকে এমনটি দাবি করা হয়। যদিও ওপর বলতে কিছুই নেই। অতএব ধ্যান বা মেডিটেশন বিজ্ঞানসম্মত নয়, তা তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু না, বলতে হচ্ছে। এমনকি নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ, ধ্যান বা মেডিটেশনকে এখন বিজ্ঞান বলে দাবি করা হচ্ছে। আসলে বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের প্রলেপ লাগিয়ে ধ্যান বা মেডিটেশনের এটি এক প্রয়াস। বস্তুত, ধ্যান বা মেডিটেশন অপবিশ্বাসের বিস্তার ঘটিয়েছে, তার প্রমাণ সোসাইটি ফর নিউরোসায়েন্সের বার্ষিক সম্মেলনে দালাইলামাকে আমন্ত্রণ। আসলে চোখ বুজে ধ্যান বা মেডিটেশনের মাধ্যমে বিকাশমান ও বৈচিত্র্যময় মানুষ চিন্তা করার ন্যূনতম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারপরও মেকানাইজড সোসাইটিতে মেডিটেশন দারুণ জনপ্রিয়। প্রাচ্যের ধ্যান-ব্যবসায়ীরা এখন পাশ্চাত্যে পাড়ি জমাচ্ছেন। এর কারণ, যে সমাজ যত বেশি মেকানাইজড সেই সমাজ ততো বেশি

অসৃজনশীল এবং বুদ্ধিগত বিনির্মাণে পশ্চাৎপদ। অর্থাৎ সৃজনশীলতার মূল্যে কোনো সমাজের অত্যধিক এমনকি অপ্রয়োজনীয় মেকানাইজড হওয়া। কিন্তু বিকাশমান প্রজাতি মানুষ কতখানি মেকানাইজড হতে পারবে তারও মাত্রা আছে। আর এ মাত্রা অতিক্রম করলে দেখা দেয় বিপত্তি। আধুনিক মেকানাইজড সোসাইটিকে সেই ধরনের বলতে চাই। বিকাশমান মস্তিষ্কের প্রজাতি মানুষ মেকানাইজড সোসাইটিতে বসবাসের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে অসুস্থ হয়ে যায়। আর অসুস্থ এসব মানুষকে মোহমুগ্ধ করে এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ ধ্যান বা মেডিটেশনের নামে। আসলে গভীরভাবে চিন্তা করা কিংবা একাগ্রচিত্তে কোনো বিষয়ে মগ্ন হওয়ার সঙ্গে ধ্যানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। আমরা প্রায়শ এই পার্থক্যকে আমলে নিই না। আসলে ধ্যানের আড়ালে প্রশ্নহীনতাকে বহাল তবিয়তে রাখা হয়। পেরেক মেরে দেয়া হয় অন্তহীনভাবে বিকাশে। বস্তুত, মস্তিষ্কের ওপর ধ্যানের প্রভাব নেতিবাচক। অপবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলে যেমন অসঙ্গতি চর্চা চলছে দীর্ঘদিন ধরে, তেমনি আরেক ব্যাধির বিস্তার ঘটেছে ধ্যান বা মেডিটেশনের মাধ্যমে। বিশ্বাসবাদের আড়ালে অপবিশ্বাসের যে অমানিশা, তা দূরীকরণে অবিশ্বাসী বনে যাওয়া টেম্পোরারি সলিউশন। অনেকটা সামাজিক বৈষম্য অবসানে সমস্যার গভীরে না গিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের মতো। এবং তা সশস্ত্র হলেও। কিন্তু এর ফলে বিশ্বাসের লেভেলে অপবিশ্বাসের যে ব্যাধি তার মূলোৎপাটিত হয় না। ফোকাসে আসে না ব্যাধির আসল রূপ। অন্যদিকে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বলে যে নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করে অপবিশ্বাসের ধারক ও বাহকরা তা-ও ভ্রান্তিমূলক। কারণ, একমাত্র স্রষ্টাতত্ত্বকে নাকচ করে দিয়ে কিংবা জগৎ জীবন সৃষ্টি করতে হয়েছে এই আপ্তবাক্য অতিক্রমের ভেতর দিয়েই মানুষ অন্তহীন বিকাশে বিশ্বাসী হতে পারে। হতে পারে পরিণতিমুক্ত ও কথিত পরের কালহীন ভবিষ্যতের স্বাপ্নিক অভিযাত্রী এবং এটাই বুদ্ধিগত বিনির্মাণের অনিবার্যতা অথবা বিকাশমানতার পূর্বশর্ত।

মো. নূ রু ল আ মি ন

‘সমুদ্রবিলাস’-এর ইতিকথা

নৈসর্গিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কক্সবাজার। এখানে রয়েছে সারি সারি ঝাউবনের সবুজ শ্যামলিমা। রয়েছে বালির চাদর দিয়ে আবৃত বিশ্বের সর্বদীর্ঘ ১২০ কিলোমিটারের সমুদ্রসৈকত। কখনো নীল জলরাশির উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বলতায় সৈকত ছুঁয়ে যাওয়া অপরূপ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি। কখনো মৃদুমন্দ সমীরণের অনুপম শিহরণে আন্দোলিত দেহ, মন, প্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিবৈচিত্রের এক অসাধারণ নয়নাভিরাম দৃশ্যপট যা সৃষ্টিকর্তা তার মনের মাধুরী দিয়ে অকৃপণ হস্তে সাজিয়েছেন।

মোগল রাজকুমার শাহ সুজার দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া এই সৌন্দর্যের তীর্থভূমি কালের বিবর্তনে টিপরা, আরাকান, পর্তুগিজ ও সবশেষে বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেভাল বেসের তৎকালীন পরিচালক ক্যাপ্টেন জেমস্ কক্স-এর নাম অনুযায়ী এই স্থানের নামকরণ করা হয় কক্সবাজার যা চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ভ্রমণপিয়াসীদের অবকাশ যাপনের এক অনন্য স্থান।

একদিন কক্সবাজার বেড়াতে যেয়ে গ্রীন ডেল্টা হাউজিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (প্রা.) লিমিটেডের মাননীয় চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা নয়নাভিরাম চমৎকার জায়গা যেটা মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন এবং সমুদ্রের উত্তাল উর্মির মন কেড়ে নেয়া দৃশ্যাবলি যেখান থেকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে অবলোকন করা যায়। তখনই তাঁর মাথায় একটা সুন্দর চিন্তার উদ্ভব হল। তারই ফলশ্রুতিতে পাঁচতারকা মানের স্টুডিও টাইপ সার্ভিস এপার্টমেন্ট ‘সমুদ্রবিলাস’ তৈরির পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না রাজা-বাদশাদের সেই শানশওকত, সেই বিলাসবহুল জীবন। নেই ময়ূরপঙ্খী নাও-এ করে বিলাসী সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে সমুদ্রকে উপভোগের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। কিন্তু রাজা-বাদশার দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্রকে উপভোগের সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। বরঞ্চ সেই সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রকে ঘিরে পৃথিবীর সর্বত্র গড়ে উঠেছে উপভোগের নতুন নতুন উপকরণ ও বিলাসবহুল দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে পৃথিবীব্যাপী। সেই

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমুদ্রবিলাস প্রকল্পের উদ্ভাবন। যেখানে রাজা-বাদশাদের মতো সমস্ত বিলাসীসামগ্রী ও অবকাশ যাপনের অত্যাধুনিক আরামদায়ক ব্যবস্থা নিয়ে সমুদ্রকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার সবধরনের সুবিধা বিদ্যমান। সমুদ্রকে একজন বিলাসীর চোখ দিয়ে উপভোগ করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর নামকরণ করা হয় সমুদ্রবিলাস।

সমুদ্রের কোল ঘেঁষে নোঙর করে থাকা এক বিশাল আকৃতির জাহাজের বিমূর্ত প্রতিকৃতির ধারণা থেকে সৃষ্ট সমুদ্রবিলাস তৈরি হয়েছে আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে, যা অত্যন্ত উন্নতমানের প্রযুক্তিতে নির্মিত ঈষৎ বঙ্কিম সুনিপুন কারুকার্যের সুশোভিত স্থাপনা। ভ্রমণবিলাসীদের জন্য নির্মিত অত্যন্ত আরামদায়ক এর স্যুট থেকে চারপাশে অসীম সমুদ্রের নীল জলরাশি আর অবারিত নীলিমায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিচরণরত গাংচিলের ডানা ঝাপটানি দৃশ্যমান হয়।

দশ মিটার ঘনত্বের গ্লাস দিয়ে তৈরি আঠারোতলা এপার্টমেন্ট থেকে বাইরে চোখ মেললেই সারি সারি ঝাউবনের সবুজ আহবান আপনাকে করবে বিমোহিত। দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে উত্তাল উর্মির উল্লাসে মুখরিত উপকূলের দিকে। আগুন নিভানোর জন্য রয়েছে এই এপার্টমেন্টে তিনটি ফায়ারস্কেপ যা থেকে ছয়/সাত নজলের মাধ্যমে পানির বর্ষণ অগ্নি নির্বাপণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, ফলে অগ্নিভীতির অযাচিত আশংকা থেকে আপনি থাকবেন সর্বদা মুক্ত। মেরিন ড্রাইভ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। মেরিন ড্রাইভ থেকে সমুদ্রবিলাস সাড়ে পাঁচ ফিট উচ্চতায় নির্মিত হয়েছে। যেখানে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাতাসের সর্বোচ্চ চাপ বা ভূমিকম্প হলে তা প্রতিরোধের সর্বোত্তম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কলাম ও ফ্রেমের সাহায্যে নির্মিত সমুদ্রবিলাস প্রকল্পটি সেন্ট্রালকোর পদ্ধতিতে তৈরি যাতে বিল্ডিংটি শক্ত থাকে। এক্সপেনশন জয়েন্টে নির্মিত হওয়ার কারণে এর প্রতিটি জয়েন্টই স্বতন্ত্র। ফলে ভূমিকম্প বা কোনো মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় হলে এই বিল্ডিংটির যেখানে আঘাতপ্রাপ্ত হবে শুধুমাত্র সেটুকুরই ক্ষতিসাধন হবে। পুরো বিল্ডিংটির ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই স্থাপনাটির সম্মুখ দিয়ে রয়েছে একশ ফিট প্রশস্ত রাস্তা যা মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন ও যার পিছন দিক থেকে রয়েছে ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্যে ত্রিশ ফিট প্রশস্ত রাস্তা। সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কারণে এখানে চুরি-ডাকাতির নেই কোনো সম্ভাবনা। প্রশস্ত পার্কিং স্পেসে আপনি খুব সচ্ছন্দে আপনার গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন। গ্রান্ড লবিতে বসে কাটাতে পারবেন আপনার অলস প্রহর। সমুদ্রস্নান করে এসে স্পা কনভেন্সন সেন্টারে যেয়ে স্পা নিয়ে পাবেন অনাবিল তৃপ্তি। যখন সবকিছুতে আসবে একঘেয়েমি তখন সিনে কমপ্লেক্সে যেয়ে সিনেমা দেখে পাওয়া যাবে বৈচিত্রের ছোঁয়া। আপনার ব্যবসায়িক প্রয়োজন আপনি অনায়াসে মিটিয়ে ফেলতে পারবেন বিজনেস সেন্টার থেকে। হঠাৎ মন চাইল তাইতো কিছু কেনাকাটা করা দরকার তখনই অত্যাধুনিক শপিং সেন্টারে পাবেন আপনার চাহিদামতো নিত্য নতুন পণ্যসামগ্রী। শুধু

অলস প্রহর কাটালেই তো চলবে না– শরীরটাকে ফিট রাখা চাই। তাই যারা নিয়মিত ব্যায়ামে অভ্যস্ত তারা জিমনেসিয়াম ও ফিটনেস সেন্টার থেকে শরীরটাকে ফিট করে নিয়ে আসতে পারবেন। আপনার বাচ্চারা তো শুধু সমুদ্র দেখে তৃপ্ত হবে না তাদের চাই খেলাধুলা, চাই খেলাধুলার সামগ্রী। তাইতো ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিডস জোনের, যেখানে আপনার বাচ্চারা সচ্ছন্দে বিচরণ করে খেলতে পারবে রঙ-বেরঙের খেলনা নিয়ে। আবার লিমুজিন সার্ভিস থেকে আপনার প্রয়োজনমতো গাড়ি ভাড়া করে আপনি বেড়াতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণের স্থানগুলোতে। এখানে রয়েছে এটিএম বুথ যেখান থেকে যখন খুশি আপনার প্রয়োজনীয় টাকা আপনি খরচের জন্য তুলতে পারবেন। স্মার্ট ও সৌন্দর্য সচেতন মহিলারা চান সবসময় সুন্দর ও টিপটপ থাকতে, তাইতো রয়েছে বিউটি পার্লার, যেখানে আপনি মনের মতো করে নিজেকে পারবেন সাজাতে। অনেকের আবার আকর্ষণ আছে খেলাধুলার প্রতি সেজন্যে এখানে রাখা হয়েছে টেবিল টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা। অসুস্থ হলে প্রয়োজনমতো ঔষধ কিনতে পারবেন মেডিসিন সেন্টার থেকে। পান বিলাসীদের জন্য রয়েছে বারের ব্যবস্থা।

রয়েছে ডিসকো ও বারবিকিউ উপভোগের সুযোগ। রুফটপ রেস্টুরেন্টে বসে প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে উপভোগ করবেন কক্সবাজারের দৃশ্যাবলি। সুইমিংপুলে গিয়ে সাঁতার কেটে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হবে আপনি যেন সমুদ্রস্নান করছেন। বড় কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্যেও আপনাকে ভাবতে হবে না। সেজন্যে রয়েছে ব্যাঙ্কুয়েট হল যেখানে আপনি যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারবেন। সমুদ্রবিলাস প্রকল্পের নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর তা উক্ত প্রকল্পের এপার্টমেন্ট ক্রেতাদের সমন্বয়ে গঠিত সমুদ্রবিলাস এপার্টমেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের নিকট হস্তান্তর করা হবে। হস্তান্ত রের পর গ্রিন ডেল্টা হাউজিং লিমিটেডের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে কোনো আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমুদ্র বিলাস প্রকল্পটির সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম তীর্থভূমি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত যার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও সূর্যাস্ত দেখার এক অসাধারণ সুযোগ ভ্রমণপিয়াসী বিদেশি পর্যটকদের সবসময়ই আকর্ষিত করে। এখানে যদি আর্কর্ষণীয় বিলাসবহুল অত্যাধুনিক এপার্টমেন্ট বেশি করে তৈরি করা হয় তবে বিদেশি পর্যটকরা বেশি আকৃষ্ট হবে ও ভ্রমণবিলাসীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। দেশের পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সাথে সাথে জাতীয় অর্থনীতিতেও পর্যটকদের বেশি আগমন একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। সমুদ্রে মাছ ধরে অনেকেই জীবিকা অর্জন করে, তাছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ঝিনুকও ভ্রমণবিলাসীদের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। এর ফলে এই সমস্ত পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি

পেলে পরিবহন ব্যবসারও প্রসার ঘটবে। ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে যার অবদান অপরিসীম। এ সমাজ আমাদেরকে দিয়েছে অনেক কিছু তাই সমাজের প্রতিও রয়েছে আমাদের দায়বদ্ধতা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমুদ্রবিলাস প্রকল্পটি ভ্রমণ-অনুরাগীদের যেমন দেবে অনেক অনেক আনন্দ তেমনি অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এই প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়নে।

আ হ মা দ মা য হা র

বাঙালির সমাজচিন্তা: মুসলিম ও বাংলাদেশ পর্ব

বাঙালির সমাজচিন্তা নিয়ে কথা বলতে হলে সমাজ বলতে আমরা কী বুঝি তার একটা ধারণা নিয়ে নেয়া দরকার। বুঝে নেয়া প্রয়োজন সমাজ কীভাবে গড়ে ওঠে তা-ও। কারণ প্রচল ও নতুনের সংঘাত এবং সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে সমাজ। মানুষের সক্রিয় চিন্তার প্রক্রিয়ায় এই অগ্রসরমানতা ঘটে। সমাজ গড়ে উঠতে একটা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন। সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নানা বাস্তব শর্তের আলোকে। ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বা স্থানীয় নানা প্ররোচনায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা শর্তাবলি গড়ে ওঠে। একটা পুরো জনগোষ্ঠীর অংশভুক্ত মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত অবস্থায় থেকে সমাজ গড়ে তোলে। অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠীসমূহে এইসব শর্তাবলির বদল ঘটে। এ-ছাড়াও এইসব শর্ত পরিবর্তিত হয় সমাজে আগত নানা নতুন ধারণার অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। বাংলা ভাষাভাষী পুরো জনগোষ্ঠীকে যদি একটি অখণ্ড সমাজ ধরে নেয়া হয় তাহলেও আমরা লক্ষ করব যে, এরই মধ্যে রয়েছে আরও অনেক ছোট ছোট সমাজ। ছোট এই সমাজগুলো সুতরাং বৃহত্তর অখণ্ড সমাজের মধ্যে নানা অনুষঙ্গ হাজির করে চলেছে। এইসব অনুষঙ্গ সমাজের মধ্যেকার ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে

সৃষ্টি করে বিচিত্র জটিলতা। এর থেকে মুক্তির জন্য সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত চেতনাগত বদল ঘটাবার প্রয়োজন পড়ে। বদলের প্রকৃতি ও কারণগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে মানুষ। নতুন এইসব চিন্তা পরিশ্রুত হয়ে এগিয়ে চলে পারস্পরিক বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে।

বাঙালি সমাজে সুদূর অতীতের নারীতান্ত্রিক অনেক চিহ্ন আজও বর্তমান; তা-সত্ত্বেও এ-কথা নিশ্চয় করে বলতে হবে যে, সমগ্র বাঙালি সমাজও অন্যান্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতোই প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রভাবে বাঙালি সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবপ্রক্রিয়ার শুরু। মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত নগরবাসী বলে সামগ্রিক নাগরিক জীবনযাত্রায় নারীর ভূমিকা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নারীরা কি কেবল দৈনন্দিন গৃহকর্মই করবে নাকি সামগ্রিক বহির্মুখী জীবনযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি কাজ করবে বেশ বড় হয়ে দেখা দেয় এই প্রশ্ন। উনিশ শতকেই নারীর ভূমিকা নিরূপণ নিয়ে সমাজে নানা চিন্তা চলেছিল। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলন ছিল সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে প্রথম সবচেয়ে বড় সংস্কার প্রচেষ্টা। পরে অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনও বিরাট হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও বিদ্যায়তনিক নারীশিক্ষার গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজ বিষয়ক মননশীল আলোচনায়।

বিশ শতকের প্রথম দিকেই কয়েকজন বাঙালি মুসলিম নারী তাঁদের চিন্তায় মননশীলতার স্বাক্ষর রাখেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ও ভাবুক নারীদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কথা খানিকটা আলোচিত হলেও অন্যদের কথা তেমন আলোচিত হয়নি। তিনি ছাড়াও বেশ কয়েকজন নারী-ভাবুকেরও দেখা মিলেছিল বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার জন্য পুরুষতন্ত্রের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও দায়ী। নারীরা শিক্ষা লাভ করলে তাদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠে বলে পুরুষতন্ত্র এর বিরোধিতা করে– এমন নারীবাদী চিন্তাও বিশ শতকের বাঙালি সমাজে দেখা গিয়েছিল। উনিশ শতকে যে মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের সূচনা তা প্রধানত স্পন্দমান ও বিকাশমান ছিল বাঙালি হিন্দু সমাজে। পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা এগিয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের তুলনায়। সঙ্গত কারণেই উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের নানা তরঙ্গ নিয়ে ভাবনাও হয়েছে বেশি। উল্লেখযোগ্য ভাবে সমাজের মুসলিম অংশের মধ্যবিত্তীয় বিকাশ ঘটতে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম ভাগে এসে। মুসলমান সমাজের সংস্কারচিন্তারও সুস্পষ্ট সূচনা এই সময়ে।

তবে সামগ্রিক অর্থে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি স্পষ্টতা লাভ করতে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে। বিশ শতকের বাঙালি সমাজচিন্তার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সন্ধান। আত্মপরিচয় সন্ধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টিভঙ্গির মূল সুর বর্ণবিভক্ত বাংলার

সমাজজীবনে ইসলামের যে-রূপের প্রভাব ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে তা সাধারণভাবে বিশুদ্ধ ইসলাম নয়, আহমদ শরীফের ভাষায় তা 'মুসলমানধর্ম'[১] । এতে রয়েছে যুগপৎ শরিয়ত ও মারফত, কোরআন ও হাদিসের পাশাপাশি পীর-দরগাহ-মন্ত্র-মাদুলি-তাবিজ-দোয়া-ঝাড়ফুঁক-তুক-তাক । ইসলামের প্রভাব ও প্রসার মোঘল-তুর্ক-আফগান রাজত্বের প্রভাবেই শুধু ঘটেনি, ঘটেছিল গ্রামীণ লোকায়ত সমাজে দীর্ঘ চর্চিত সহজিয়া সুফি, বৈষ্ণব ও বাউল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে পটভূমি গড়ে উঠেছিল তার ওপর ভিত্তি করে । অন্য দৃষ্টিভঙ্গির মর্মকথা এই যে, কোরআন বা হাদিস নির্দেশিত ইসলামের অভাব সামাজিক সংকটের ও সামাজিক অনগ্রসরতার কারণ । বাঙালির মানসে চেতনাকে ধর্মের– সে ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম, যে ধর্মই হোক না কেন তার সনাতন আচার-বিচারের চেয়ে তার আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ ও অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বেশি আকৃষ্ট করেছে এবং সমগ্র বাংলাভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে । বাংলাদেশের ভাবুকদের সমাজচিন্তায় প্রধানত এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে ।

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক রূপানুষঙ্গ স্পষ্টতা অর্জন করতে শুরু করে । দীর্ঘকালের পরাধীন সমাজ অন্বেষণ করতে থাকে আত্মপরিচয়কে । আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষাই তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে জাতীয়তাবাদী চেতনায় । বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আবার দুটি প্রধান ধারায় উজ্জীবিত । একটি লোকায়ত হিন্দু প্রভাবিত ধারা, অন্যটি ইসলাম প্রভাবিত ধারা । এই দুই ধারার সমন্বয়েই অখণ্ড অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে থাকে বাংলাদেশে । উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুরা পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে সমকালীন বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে । মুসলমান সমাজ পূর্ববর্তী সমাজকাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগে এগিয়ে আসে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে খানিকটা দেরি করে । পাশ্চাত্যে বাংলাদেশের পাটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পাটের ব্যবসার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পুঁজির প্রসার ঘটতে থাকে । এরই প্রভাবে পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে গড়ে উঠতে শুরু করে মধ্যবিত্ত সমাজ । বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর ডিভাইড এন্ড রুল নীতির সূত্রে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । খণ্ডিত বাংলার রাজধানী করা হয় ঢাকাকে । ঢাকা রাজধানী হওয়ায় নগর হিসাবে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে । এখানকার গঠমান মধ্যবিত্ত মনে করতে শুরু করে বাংলার মুসলমান সমাজকে আত্মানুসন্ধানে সচেষ্ট ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে । বাংলার মুসলমান সমাজকে কর্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শক্তিমানের সমস্তরে উত্তীর্ণ হয়ে সাম্যে উপনীত হতে হবে । এর মধ্য দিয়েই বাঙালি হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের অনুরূপ বাঙালি মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য দূরীভূত হবে বলে অনুভব করেছেন ।

এমন একটা চিন্তাও প্রবল হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য নিজেরা স্বাধীনভাবে ভূমিকা রাখতে পারেনি। কোনও না কোনও ভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে তাদের। বাম চিন্তাধারা প্রভাবিত ভাবুকেরা মনে করেছেন এর থেকে মধ্যবিত্তই পারে আবেগমুক্ত হয়ে সঠিক তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের বিপ্লবী কর্মধারা পরিচালনা করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে।

বিশ শতকের শেষ ভাগে বামধারার ভাবুকেরা এ-ও মনে করেছেন যে, সমন্বিত সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলিম উভয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। তবে এর দুর্বলতা হল প্রেম ও ভক্তিবাদ। এই দুইয়ের সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারার একটি দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এই ধারার গুরু ও পীরগণ ভক্তদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যে তাঁরা ইহলোকে অর্থবিত্ত এবং পরলোকে বেহেশতের দ্বার খুলে দিতে পারেন। ফলে গণশক্তির চেয়ে ব্যক্তিক শক্তির ওপর মানুষের আস্থা জন্মেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এর ফলে ব্যক্তিক নেতৃত্বের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। সমাজে এলিট শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য থেকে। এ ছাড়াও তাদের চেতনায় বহুকালের দাসত্ব বিদ্যমান। নিপীড়িত জনগণের শ্রেণীচেতনা এখনও দুর্বল। তাছাড়া শ্রেণীত্যাগী বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব ঘটেনি বলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে বলেও মনে করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে বাঙালির সামাজিক বিকাশ একটু গতিমুখ খুঁজে পায়। বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিকাশমানতার প্রথম পর্বে বৃটিশ কোম্পানির শাসনামল থেকেই গড়ে উঠেছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ। পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্য থেকেও চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের অংশগ্রহণের সুযোগ দানের উদ্যোগ নেয় বৃটিশ সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বিকাশের গতি ছিল ধীর। কিন্তু ইংল্যান্ডের ডান্ডি এবং কলকাতায় পাটশিল্প গড়ে ওঠায় মুসলমানদের মধ্যে একটা ব্যবসায়িক অংশ গড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে পাট উৎপাদন, সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণে মুসলমান কৃষক, ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়িয়াদের ভূমিকা ছিল প্রধান। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন[২] যে শিল্প বাণিজ্য নির্ভরশীলতার দিক থেকে মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি ছিল খুবই কম। বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা প্রধান ভূমিকা রেখেছেন তাদের অধিকাংশই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে আসা। পরবর্তীকালে পাটশিল্পের বিকাশ মুসলমান সমাজের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষের অর্থনৈতিক পটভূমিকাও সমাজচিন্তায় প্রভাব রেখেছে।[৩]

সমাজচিন্তায় এই ধারণার প্রকাশ দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের সমাজে বিশ শতকে মধ্যবিত্তই নানা নতুন চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং সমাজের প্রভাবক হয়ে

উঠেছে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই মূলত জাতীয় অবস্থা বদলের আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তবে তারা বিশ শতকে ভাসমান, অপরিণত ও শৌখিন রয়ে গেছে বলে মানবজীবনের জটিলতা, গহন-গভীরতা, নানা অন্ধিসন্ধি বোঝার অভিজ্ঞতার তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনবোধের গভীরতা না বাড়ালে বাংলাদেশের যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশের সমাজে আমলাতন্ত্রও একটি প্রভাবশালী শক্তি। এই আমলাতন্ত্র নিয়েও চিন্তা হয়েছে। অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে বাঙালিদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের স্বভাবকেও। বিশ শতক জুড়ে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ও ঔপনিবেশিক নিগড়মুক্তির প্রচেষ্টা যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্র যুক্তিনির্ভর পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রাচ্যের আমলাতন্ত্র অতীতে ছিল রাষ্ট্রের প্রতিভূ এবং মূলত কর আহরণকারী। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের স্থানীয় শাসন কাঠামোতে হাত দেয়নি বলে আমলাতন্ত্রের ভূমিকায় কোনও বদল ঘটেনি। বৃটিশ শাসনের অবসানেও এই আমলাতন্ত্রই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে ঐতিহ্যগত দিক থেকে। আমলাতন্ত্রের ওপর থেকে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা সরাতে হলে তা করতে হবে সমাজ-পরিবর্তনের পথে, উপরিকাঠামো সংস্কারের মধ্য দিয়ে নয়। এইরকম চিন্তাও বিশ শতকে বাঙালির ভাবুকদের[৪] মধ্যে দেখা গিয়েছে।

বিশ শতকে রুশ বিপ্লবের প্রভাব বাংলার মুসলমান সমাজেও বেশ গভীর হয়ে উঠেছিল। সে সময় বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশের মধ্যে জেগে উঠেছিল চিন্তাশীলতার জাগরণ। ইসলামের সাম্যবাদী চেতনাও রুশ বিপ্লবের প্রভাবে জেগে উঠেছিল। 'সাম্যবাদী' নামে মুসলিম এমন চিন্তাও জেগেছিল যে, আল্লাহর দেয়া বিধান হিসেবে মানুষ ইসলামকে স্বীকার করলেও সকল যুগে ও সকল সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ইসলাম দ্বারা উপকৃত হওয়ার কৌশল বৃদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার ও অবলোকন করতে উদ্যোগী হয়নি। পাপ সমাজের অঙ্গ থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রশ্নটা শুধু নৈতিক বিধান ও বিধান-লঙ্ঘনকারীদের আদেশ দণ্ড-দান ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়। জগতে অন্যায় ও অপবাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো কোনো ব্যাপার বা পরিস্থিতির সন্ধান মেলে, যেখানে সেই অপরাধ বা অন্যায়ের মূলীভূত কারণ বা কারণসমূহের নিরসন ঘটানোর চেষ্টা না করে বাইরে থেকে শুধু বিধান বা দণ্ড-দানের ব্যবস্থা সমাজের ওপর চাপিয়ে দিলে তা প্রায়ই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই রকম মানবতন্ত্রী চিন্তার[৫] বলিষ্ঠতাও মুসলমান সমাজের বিশশতকের প্রথম দিককার ভাবুকদের মধ্যে দেখা গেছে।

মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণে তিনজন মনীষীর ভূমিকা রয়েছে। এঁরা হলেন নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি এবং দেলোয়ার হোসেন আহমদ[৬]। এঁদের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্ধান করা হয়েছে

উত্তরণের সূত্রগুলোকে। অতীত পর্বে বাংলার মুসলমান সমাজ মুসলিম রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেই রাজশক্তির পতনের ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো তার ওপর নির্ভরশীল ছিল তাতেও ভাঙন দেখা দিয়েছিল। এই ভাঙনে থেকে উত্তরণে উপর্যুক্ত তিন মনীষীর বিশেষ অবদান রয়েছে। উনিশ শতকে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যেকার বিরোধের সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে– ইংরেজরা সম্পূর্ণত হিন্দু-মুসলিম বিরোধের স্রষ্টা না হলেও বিরোধকে ব্যবহার করার ফায়দা নিয়েছে। এই বিরোধের মূলে ছিল প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে আর কৃষি ছিল মুসলমানদের হাতে। সরকারব্যবস্থার সঙ্গে যে সব মুসলমান যুক্ত ছিলেন তারা বেশিরভাগই ছিলেন বহিরাগত। ফলে বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের নেতা তাঁরা হতে পারেননি। আর্থসামাজিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষের ঝোঁক পড়ে ধর্মের দিকে। বাংলাদেশে সে কারণেই ধর্মীয় আন্দোলনের প্রাধান্য পেয়েছিল। সেই ধর্মীয় আন্দোলন কখনও কখনও অত্যাচারিতের আন্দোলন হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করলেও ধর্মীয় পরিচয়ই সবসময় তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে যে সমন্বয়ধর্মী অবস্থা চলছিল তাতে ধর্মভিত্তিক শ্রেণীগত জাগরণই[৭] ভেদরেখা সৃষ্টিতে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। ধর্মভিত্তিক জাগরণ তাদের বাস্তবতাবোধকে লুপ্ত করে ফেলায়ও সমাজে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বাড়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়। বাংলার সমাজচিন্তায় এই দিকটিও বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলার সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবের[৮] ঔপনিবেশিক সূত্রসমূহও সমাজচিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছে। ইংরেজরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এসে যখন এই উপমহাদেশ অধিকার করল তখন লক্ষ করলে যে হিন্দুরা তাদের বেশি সহযোগিতা করছে। কারণ তখন মুসলমানেরা মনে করত যে ইংরেজরা তাদের হাত থেকেই রাষ্ট্রব্যবস্থা কেড়ে নিয়েছে। ইংরেজদের প্রভাবেই আমাদের সমাজে মূল্যবোধের নানা বদল ঘটতে থাকে। এরই প্রভাবে পাশ্চাত্যের চেতনা আবির্ভূত হয় আমাদের সমাজে। বাংলার সমাজে ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় দুটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদল চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের অনুসরণ, অন্য দলের অভিপ্রায় ছিল স্বাজাত্য ও স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে। পাশ্চাত্য অনুসারীগণ সমাজে বড় রকমের সংস্কার করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন রায় এবং ডিরোজিও। আর স্বাজাত্যপন্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রাধাকান্ত দে। এই দুইয়ের টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে ।

কলকাতা নগরীতে গড়ে ওঠা নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত অংশের মনোভাবের প্রতিফলন বাংলা ও ফারসি[৯] পত্রিকায় ফুটে উঠেছে। জমিদার, ব্যবসায়ী,

নাগরিক, শিক্ষিত সমাজ– সবাই যার যার মত প্রকাশ করতে লাগলেন ঐসব কাগজে। বাঙালিদের সমাজে একটি মননশীল অংশ গড়ে উঠেছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার দখল করার পর বাংলার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণের ওপর হস্তক্ষেপ করবার নীতি গ্রহণ করে। তাদের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি করে। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যেও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গে মতামত গড়ে উঠতে শুরু হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের বিকাশের আগে যে ক্ষীণ স্বাজাত্যবোধ দেখা গিয়েছিল বাংলার সমাজে তার সূচনা ঘটেছিল এখানেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে। এদিকে সরকারও বঞ্চিত হচ্ছে রাজস্ব থেকে– এই অনুভব থেকে ইংরেজ সরকার যে রেগুলেশন জারি করেছিল তার বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারদের মিলিত প্রতিবাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল পূর্বোক্ত স্বকীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্‌গম। গোটা সমাজব্যবস্থা যে প্রশ্নের মুখে পড়েছে এই বোধ সকলের মধ্যে জেগে উঠেছিল এই সময়েই।

বিশশতকের প্রথম দিক থেকেই বাংলাদেশে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন শুরু হয়েছিল। এর পেছনে বৃটিশ শাসকদের চাকরিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আবার মুসলিম সামন্তদের পতন ঘটতে থাকে, ভাঙন ধরে তাদের অভিজাততন্ত্রের। আগে মুসলিম অভিজাত পরিবারগুলো অনভিজাত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইত না। ধীরে ধীরে চাকরিজীবীদের মর্যাদা বাড়তে থাকলে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবধান কমতে থাকে। এরই পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও জেগে উঠতে থাকে আত্মবোধ। তারাও রাষ্ট্রক্ষমতার চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে ব্যবসায়ী শ্রেণী। তারাও চায় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হতে। রাষ্ট্রক্ষমতায় ব্যবসায়ী শ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধিকে ভালো চোখে দেখা হয়নি। এই ভাবনাও হয়েছিল যে 'ব্যবসায়ী' শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ আর্থিক বৈষম্যবাদের প্রশ্রয় দেওয়া।'[১০]

বিশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশের কোনও কোনও বাম চিন্তক উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের সকল জায়গাকেই 'গণশত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের সৃষ্টিশীলতা, মননশক্তি, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার অবশ্যস্বীকার্য হলেও তাঁদের দানে অবদানে গণমানব ক্বচিৎ প্রত্যক্ষে ও সাধারণভাবে পরোক্ষে উপকৃত হলেও তা তাদের শোষণ-পীড়নের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। রেনেসাঁসের জন্য গৌরববোধ করা, সগর্বে রেনেসাঁসের মহিমা কীর্তন করা, রেনেসাঁসওয়ালাদের প্রশংসা করা অকারান্তরে গণমানবের দুর্ভোগ-দুর্দশাকে অস্বীকার করার এবং মুৎসুদ্দি-কমপ্রেডরের তারিফ করার সামিল' বলে এই ধারার চিন্তকদের কেউ কেউ মনে করেছেন।

বিশশতকের শেষভাগে বামধারার ভাবুকেরা মনে করেছেন উনিশ শতকের বাঙালির জাগরণের নায়কদের দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক ভাগকে পুনর্জাগরণবাদী (revivalist) এবং অন্য ভাগকে চিহ্নিত করা যায় সংস্কারক (reformist) নামে। তাঁদের মতে সংস্কারকদের গ্রহণে-বর্জনে উদার মনে হলেও আসলে সমাজে তাঁরাও রক্ষণশীলই। আসলে তাঁরা মেরামতের মাধ্যমে পুরনোকেই রেখে দিতে চান। তাঁদের মতে জাগরণের নায়কেরা ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ঘটালেও সমাজ-প্রতিপার্শ্বের উৎকর্ষ ঘটাতে পারেননি। 'রেনেসাঁস কোনো জাতিগত গুণ নয়, নিতান্ত ব্যক্তির উদ্যম-উদ্যোগ-মনন-মেধা-মনীষার ফল।' এর প্রভাবে অজ্ঞ-নিরক্ষর-নিঃস্ব, দরিদ্র তুচ্ছ বৃত্তিজীবীর, মজুরের, ভূমিদাসের কোনো আর্থিক-শারীরিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক-আচারিক উন্নতি হয়নি– য়ুরোপে কিংবা বাঙলায় বা ভারতে।'[১১] বাংলাদেশের সমাজভাবনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের অস্তিত্বও বেশ প্রবল মনে হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক বিবর্তনে সমাজের প্রকৃত বৃহত্তর জনসংখ্যা, যারা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে তাদের শ্রমশক্তি দিয়ে, উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুভার কাঁধে বহন করে, তাদের ভূমিকা, কর্মকাণ্ড এবং অবস্থান রয়ে যায় অনুল্লেখিত, অজ্ঞাত।' কারণ লেখাপড়া-জানা যে শ্রেণীটি ইতিহাস লেখে তারা আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটি বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থবাহী। এর কারণ 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী ঔপনিবেশিক প্রভুর নিরাপদ ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠার ফলে স্বনির্ভর, স্বাধীনচিত্ত ও উদ্যমী হতে পারেনি। এই কারণে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থবাহী হিসেবেই বেঁচে থাকে।'[১২] ফলে এদের হাতে জনগণের মুক্তি নেই– বামপন্থী ভাবুকদের চিন্তায় এই ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা বাংলাদেশের সমাজে শুধুমাত্র লুণ্ঠনের। তাদের অবস্থা এমনকি বিদেশিদের চেয়েও খারাপ। তাদের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সামাজিক বিপ্লব। তবে প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে নয়, প্রয়োজন নতুন স্বভাবের, নতুন ধরনের বিপ্লব।[১৩]

স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলাদেশের সমাজ নিয়েও গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সমাজ কৃষিভিত্তিক বলে এবং তারা প্রধানত অভাবগ্রস্ত বলে অভাবের তাড়না আমাদের সমাজ থেকে সব স্বপ্ন-আদর্শকে বিচ্যুত করবার সুযোগ করে দেয়। এর সুযোগ নেয় স্টাবলিশমেন্টের নায়কেরা। তারা সূক্ষ্ম কৌশলে টাকা ছড়ায়, টাকা দিয়ে কিনে নিতে থাকে মানুষ, মানুষদের বানিয়ে তোলে ল্যাম্পুন, বকবাজ, ছিনতাইকারীতে। এই পরিবেশে সমাজে ব্যক্তির পক্ষে সৃষ্টিশীল হওয়া কঠিন। এই পরিবেশে বিরোধী মত উৎপন্ন হয় না, মানুষ বেঁচে থাকার রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

বাংলাদেশের সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়েও উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ-স্বভাবে দেখা যায় যে বাংলাদেশের উন্নয়নকে 'সামাজিক

সমগ্র' হিসেবে না ধরে খণ্ড খণ্ড হিসেবে বিচার করা হয় বলে ঐ বিচারে অর্থনৈতিক সুবিধা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। ব্যক্তি হারিয়ে যায়, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কৃষক বা শ্রমিক পায় না। এমন খণ্ডিত উন্নয়ন যে মূল্যবোধের জন্ম দেয় তা সুবিধাবাদী সমাজই গড়ে তোলে। তারপরও সমাজে যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যে সমাজে শান্তভাবে সক্রিয় থাকে– সে সাধারণ মানুষ। সে মাঠে-কারখানায় কাজ করে। আমাদের সমাজে ব্যক্তি হিসেবে বুদ্ধিজীবীরাই তাদের দায়িত্ব পালন করে না, চতুরালির দ্বারা নিজেদের সঙ্গে আত্মপ্রতারণা করে থাকে।[১৪]

সূত্র :

১. 'বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান', *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, আহমদ শরীফ, আগামী
প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯।

২. *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ১৯৯৩, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩. *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, আবুল মোমেন, ১৯৯৬, সন্দেশ, ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ অর্থনীতির স্বরূপ, অনুপম সেন, ১৯৯৮, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

৫. *মুসলিম সমাজচিত্র : সাম্যবাদী সাময়িক পত্রে*, সুনীলকান্তি দে, ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. বাংলাদেশ : জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, সালাহউদ্দীন আহমদ, ১৯৯৩, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৭. বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সালাহউদ্দীন আহমদ, ১৯৯২, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

৮. উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিন্তা ও সমাজ বিবর্তন, সালাহউদ্দীন আহমদ, ২০০০, আইসিবিএস,
ঢাকা।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. 'অভিজাত ও মধ্যবিত্ত', এ কে নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ, ১৯৮৮, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের স্বরূপ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ, ১৯৯৯, আগামী প্রকাশনী,
ঢাকা।

১২. বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস ও মধ্যশ্রেণী, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, আসহাবুর
রহমান, মুক্তধারা, ঢাকা।
১৩. আনুপূর্বিক তসলিমা ও অন্যান্য, আহমদ ছফা।
১৪. নিস্তব্ধতার সংস্কৃতি, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৮৩, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

আ ন্ত র্জা তি ক / প্র ব ন্ধ

আ শ রা ফু ল আ জা দ

.....

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত এবং চীন ফ্যাক্টর

যথাক্রমে প্রায় ১৩৩ কোটি এবং ১১৮ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে চীন এবং ভারত বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দুটি রাষ্ট্র। দু'দেশই পারমানবিক শক্তিধর এবং দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সেক্যুলার ভারত পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মতে বিশ্বের বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক মডেল'। অপরদিকে বছরের পর বছর ধরে দশ শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা বাজার-সমাজতান্ত্রিক চীন বিশ্বের বৃহত্তম 'অর্থনৈতিক মডেল'। আঞ্চলিক নেতৃত্বের গণ্ডি পেরিয়ে দু'দেশই এখন মহাসাগর এবং মহাকাশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। আগামী দিনের বহুমেরু বিশ্বে এই দুই রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দুই GEO-STRATEGIC player-এর দ্বন্দ্বের সুযোগে Geopolitical pivot হিসেবে বাংলাদেশ নিজের জাতীয় স্বার্থ আদায় করতে পারবে নাকি রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার মতো পদদলিত হবে তা নির্ভর করবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতা এবং পররাষ্ট্রসম্পর্ক অনুশীলনকারীদের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং দেশপ্রেমের ওপর। এ অবস্থায় ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ আদায়ের জন্য আমরা যদি বিদেশি শক্তির লেজুরবৃত্তি করে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি অব্যাহত

রাখি তাহলে ভবিষ্যতে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কোথায় থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার পুরোপুরি সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ফেলে ভারত এবং চীনের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবেই, এ দুটি দেশের সাথে সম্পর্ক বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং দু'দেশের সাথে একই সময়ে সুসম্পর্ক রক্ষা করা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরপর যথাক্রমে ভারত ও চীন সফরের প্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ-চীন ত্রিমুখী রাজনীতির বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। এখানে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচিত হবে। তবে 'জাতীয় স্বার্থ' একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং ব্যক্তিবিশেষে এর সংজ্ঞা ভিন্ন হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কেউ কাউকে বিনা স্বার্থে সাহায্য করে না। ভারতও করেনি। চিরশত্রু পাকিস্তানের একটি ডানা ভেঙে দেয়া তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কদের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের সেই তুমুল সময়ে ব্যাপারটি অত সহজও ছিল না কারণ কিসিঞ্জারের 'শাটল কূটনীতি'র দূতিয়ালি করে পাকিস্তান তখন চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় সরকার সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিল, তবে ভারতীয় জনগণ এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

স্বাধীনতার পর দু'দেশের মধ্যে যে চিরন্তন বন্ধুত্বের কল্পনা করা হয়েছিল তা স্বার্থচিন্তার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হতে বেশিদিন লাগেনি। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-মেশিনারি ভারতে পাচার হয়ে যাওয়া, ফারাক্কা বাঁধ, যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় উদ্যোগে গঠিত মুজিব বাহিনীর উত্তরাধিকার, বাংলাদেশের ও আই সি সম্মেলনে যোগদান, শেখ মুজিবের স্বাধীনচেতা পররাষ্ট্র সম্পর্ক প্রভৃতি কারণে দুদেশের সম্পর্কে দ্রুত চিড় ধরে। ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র–মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে মজার ব্যাপার হল ফারাক্কা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে প্রথম ৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭৭ সালে। এতে ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের আঞ্চলিক বন্ধুত্বের প্রতি মনোযোগ ছিল উল্লেখযোগ্য কারণ। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল– পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের ভারত কর্তৃক অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় এবং রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান। ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বিষয়টির আপাত-সমাধান হলেও পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে ভারতীয় প্রভাব অনুশীলনের সম্ভাবনা পুরোপুরি বিদ্যমান। ফারাক্কা নিয়েও একই কথা বলা যায়। ১৯৯৬ সালের ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি অনুযায়ী পানির প্রাপ্য অংশ থেকে বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে বঞ্চিত হয়ে

আসছে। শুষ্ক মৌসুমে খরা এবং বর্ষায় বন্যা দেশের উত্তরাঞ্চলের এখন স্বাভাবিক দৃশ্য। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বেয়াদবির প্রেক্ষিতে ফারাক্কার পানি ভারতের হাতে সবচেয়ে সুবিধাজনক ভৌগোলিক অস্ত্র। তাছাড়া বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর ৫৪টিই এসেছে ভারত থেকে। ফারাক্কার মতো তিস্তা নদীর উজানেও ভারত বাঁধ তৈরি করেছে। যদিও বিষয়টি তেমন আলোচিত হয়নি। সম্প্রতি টিপাইমুখে ভারতের বাঁধ নির্মাণ নিয়ে অনেক মাতামাতি হল। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় মনমোহন সিং আশ্বাস দিয়েছেন, টিপাইমুখে এমন কিছু করা হবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফারাক্কার ব্যাপারেও জওহরলাল নেহরু একই ধরনের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে দক্ষিণ বেরুবাড়ী হস্তান্তর করলেও ভারত এখনো তিন বিঘা করিডর লিজ দেয়নি। তাছাড়া অনির্ধারিত রয়েছে ৬.৫ কি.মি. সীমানা, ১৮০ কি. মি. নদী সীমানা এবং ছিটমহল সমস্যা। অর্থনৈতিকভাবে অতিগুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রসীমা নিয়েও একই কথা প্রযোজ্য। এর সাথে যোগ হয়েছে সীমান্তে নিয়মিতভাবে বি.এস.এফ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশী হত্যা, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে এসব গুরত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এমনকি যেদিন ৫০ দফা যৌথ ঘোষণা দেয়া হয় সেদিনও দুজন বাংলাদেশী বিএসএফ-এর হাতে নিহত হয়।

বাংলাদেশকে ঘিরে রয়েছে ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' নামে খ্যাত বিরোধপূর্ণ সাতটি রাজ্য। এখানে প্রায় ১৭৫টি সশস্ত্র গ্রুপ ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। ভারত বরাবর অভিযোগ করে আসছে এরা বাংলাদেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় পাচ্ছে, অরক্ষিত সীমানার সুযোগ নিয়ে এসব বিদ্রোহীদের বাংলাদেশে প্রবেশ এবং অবস্থান অস্বাভাবিক নয়। তবে ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে উলফার যে দশ ট্রাক অস্ত্র আটক হয় তাতে কিছু সরকারি কর্মকর্তার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হয়তো এ ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অর্জন করতে ভারত সফরের আগে উলফার নেতা অরবিন্দ রাজখোয়াকে 'উপঢৌকন' হিসেবে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী দেশ হওয়ার দু'দেশের অপরাধীদের পরস্পরের ভূমিতে আশ্রয় নেয়া স্বাভাবিক। তবে সাধারণ অপরাধী এবং রাজনৈতিক যোদ্ধাদের একই কাতারে ফেলা উচিত নয়। বাংলাদেশের উচিত ভারতের এসব অভ্যন্তরীণ সমস্যার ব্যাপারে নিরপেক্ষ আচরণ করা। ভারতীয় সরকার কিংবা বিদ্রোহীদের পক্ষে কোনো উদ্যোগ নিলে সেটা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বন্দি বিনিময়, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও মাদক পাচার রোধ এবং ফৌজদারি অপরাধ দমন বিষয়ে যে তিনটি চুক্তি হয়েছে সেগুলো দু'দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধগুলোর কোনোটির সমাধান করে না। এ তিনটি চুক্তিকে সহজেই

একটি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যেত। বিদ্যুৎ আমদানি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে যে দুটি সমঝোতা স্মারক হয়েছে তা নিয়েও একই কথা প্রযোজ্য।

তবে এ সফরের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে দু'দেশের ৫০ দফা যৌথ ইশতেহার। এতে বাংলাদেশ ভারতকে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করতে সম্মতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার, শুধু পণ্য উঠানামার ভাড়া দিয়ে বিষয়টি বিচার করা যাবে না। সম্প্রতি ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা দিতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত হয়েছে। বন্দরে ভারতীয় পণ্যের নিরাপত্তা বিধানে ভবিষ্যতে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। যৌথ ইশতেহারে ঘোষিত আগরতলা-আখাউড়া রেললাইন নির্মাণে ভারতের সাহায্য, রেলখাতের উন্নয়নের ১০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা, রহনপুর– যিঙ্গাবাদ ব্রডগেজ রেল যোগাযোগ চালু ইত্যাদি বিষয় বন্দর ব্যবহার এবং ট্রানজিটের সাথে জড়িত। আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির সূক্ষ্ম বিচার করে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। ইশতেহার অনুযায়ী, ভুটান ও নেপালের পণ্যবাহী ট্রাক জিরো পয়েন্ট থেকে বাংলাবান্ধা-ফুলবাড়ী সীমান্তে ২০০ মিটার ভিতরে আসতে পারবে। এ সুবিধাটি বাংলাদেশী ট্রাকের জন্য দেয়া হলে তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হত।

দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য পুরোপুরি ভারতের অনুকূলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করেছে ২.৯১৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আর রপ্তানি করেছে মাত্র ২৫৭.১২ মিলিয়ন ডলার। অবৈধ আমদানি এর চেয়ে আরো দেড়গুণ বেশি। এ বাণিজ্য-ঘাটতি শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা ভুল হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য ভারতের ওপর অতিনির্ভরশীলতা বাংলাশের জন্য ভয়ংকর নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু দ্বিপক্ষীয় রাজনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। এর সাথে আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা না করলে অনুধাবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারত বর্তমানে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। দ্রুত অগ্রসরমান চীনা ড্রাগনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার সাধারণ স্বার্থ দু'দেশকে একত্রিত করেছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ভারতের সাথে স্বার্থের সংঘাত হলে মার্কিনী এবং তাদের পশ্চিমা মিত্রদের সমর্থন পাবে না।

অবশেষে থাকল চীন। নিজের স্বার্থেই চীন বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। কারণ, শত্রুর শত্রু বন্ধু। চীন এবং ভারত কখনোই বন্ধু হবে না। ভারতবেষ্টিত হওয়া তেমন বাংলাদেশের জন্য ভৌগোলিক দুর্ভাগ্য তেমনি ভারতের প্রায় অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ চীনের জন্য সৌভাগ্য। মূল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিভক্ত করেছে ২০০ কি. মি. দীর্ঘ এবং মাত্র ৪০ কি. মি. প্রশস্ত শিলিগুড়ি করিডোর। একে বলা হয় ভারতের 'chicken neck'। এ করিডোর হাতছাড়া হয়ে গেলে বিশাল

উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে পুরো ভারত বিচ্ছিন্ন। এ সংকীর্ণ এলাকাটিতে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা তৎপর। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী অরুণাচল প্রদেশ চীন নিজেদের ভূ-খণ্ড বলে দাবি করে। এজন্যই, কলকাতা-আগরতলা ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশের ভূমি ভারতের আকাঙ্ক্ষিত। এ ট্রানজিট হলে ১৮৮০ কি. মি. দূরত্ব ৭৪০ কি.মি.-তে নেমে আসবে। এ ট্রানজিট যেমন দরকার পণ্য পরিবহনের জন্য তেমনি দরকার স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের দমনে দ্রুত সামরিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে। অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের উচিত হবে না উলফাসহ বিদ্রোহী দলগুলোর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া।

চীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন অংশীদার এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত বেশিরভাগ ট্যাঙ্ক (T-59, T-62, T-69, T-79), সামরিক যান, ফ্রিগেট (বিএনএস, ওসমান, দেশের বৃহত্তম ফ্রিগেট), যুদ্ধবিমান (F 7, Q 5, PT 6, F-7BG), মিসাইল নিক্ষেপ প্যাড (২০০৮-এ চট্রগ্রামে স্থাপিত), ক্ষুদ্র অস্ত্র ইত্যাদি চীনের তৈরি। চীন ৬টি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণে অর্থ সহায়তা দিয়েছে। গত ১৭-২১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরে সপ্তম মৈত্রী সেতু নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশে চীনা কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য। চীন-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। তবে এর বেশিরভাগ চীনের অনুকূলে।

চীন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে পারমানবিক প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। গ্যাস এবং কয়লা দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে চীনের এ প্রস্তাব বিবেচনা করা যৌক্তিক হবে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলে সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় পণ্যের একচ্ছত্র বাজার এবং অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের পশ্চাৎভূমিতে পরিণত হওয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় চীন বাংলাদেশের অংশীদার হতে পারে এবং ভৌগোলিক নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলায় বাড়িয়ে দিতে পারে বিশ্বস্ত হাত। তবে বাংলাদেশের এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয় যা ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের ইন্ধন দেয়।

সা জে দু ল আ উ য়া ল

দীনেন গুপ্ত: ‘অযান্ত্রিক’ ও ‘মেঘে ঢাকা তারা’র চিত্রধারক

[২৮ জুলাই ২০০২। কথা বলছিলাম দীনেন গুপ্তের (১৯৩২–) সঙ্গে। তিনি কলকাতায় ঋত্বিকের ‘নাগরিক’-এ রামানন্দ সেনগুপ্তের সহকারী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঋত্বিকের ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ এবং ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এই তিনটি চলচ্চিত্রের প্রধান চিত্রধারক ছিলেন। এছাড়া রাজেন তরফদারের ‘গঙ্গা’-র (১৯৬০) চিত্রধারকও ছিলেন। ২০০২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম স্টাডিস’-এ ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রসমগ্রের ওপর পি-এইচ.ডি. পর্যায়ের গবেষণাকর্মের জন্য আমাকে কিছুকাল অধ্যয়ন করতে হয়। ঋত্বিক ঘটক কীভাবে দীনেন গুপ্তের চিত্রধারণ কর্মটি সম্পাদন করতেন সে-বিষয়ে ওই সময়ই তাঁর সঙ্গে কথা হয়। দীনেন গুপ্ত একইসঙ্গে চিত্রধারক ও চলচ্চিত্রকার প্রায় সত্তরটির মতো চলচ্চিত্রে চিত্রধারকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রায় ত্রিশটির মতো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। তাঁর মামা ধীরেন গাঙ্গুলী কলকাতা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির প্রভাবশালী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মামার হাত ধরেই চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। জড়িত ছিলেন আইপিটিএ, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনের সাঙ্গে। –সাজেদুল আউয়াল]

সাজেদুল আউয়াল
প্রথমেই আমি জানতে চাইব, আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে। আপনি কীভাবে ক্যামেরাম্যান হলেন।

দীনেন গুপ্ত
প্রথমে ক্যামেরার এ্যাসিসট্যান্ট হই। আমার বাড়িতে সবাই ফিল্মের সাথে জড়িত। যেমন ধীরেন গাঙ্গুলী...।

সাজেদুল আউয়াল
জ্বি, জ্বি। নাম শুনেছি ওনার।

দীনেন গুপ্ত
উনি আমার মেসোমশাই। তো উনি আমাকে একদিন স্টুডিও-তে এনে বললেন, তোর কোন্ কাজটা ভালো লাগে ফিল্মের ?

সাজেদুল আউয়াল
এটা কোন্ সময়?

দীনেন গুপ্ত
এটা বোধ হয় '৪৮ সাল হবে। তারপরে আমি ভাবলাম যে কী করা যায়। এটা দেখি, ওটা দেখি। তো স্টুডিওতে সারাদিন থাকলাম। রাত্রিবেলা ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলন, কোন্টা পছন্দ হল? ক্যামেরাম্যানের কাজটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু আমার একটা অসুবিধা হচ্ছিল যে, ক্যামেরাম্যানরা লাইট বয়দের বলছেন দশ নাম্বার লাইটটা দাও, পাঁচ নাম্বার লাইটটা কাটো। তো লাইটের কোনো নম্বর নেই অথচ দশ নাম্বার বলছে, পাঁচ নাম্বার বলছে, এটা কী করে হচ্ছে! খুব ইন্টেরেস্টিং তো–এসব কিছু ভেবেটেবে ঠিক করলাম, না, ক্যামেরার কাজটাই শিখব।

সাজেদুল আউয়াল
আচ্ছা।

দীনেন গুপ্ত
তখন তো ক্যামেরা আমাদের ধরতে দিত না। ক্যামেরা থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দু'বছর ঐরকম দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে কাছে যাচ্ছি, ট্রলিটা ধরছি। এই করতে করতে ক্যামেরা এ্যাসিসট্যান্ট হলাম। সেখান থেকে আমি রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে আসি। রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে রামানন্দ সেনগুপ্তের সাথে কাজ শুরু করি 'মধুরাতি' বলে একটা ছবিতে। এই ছবির মাধ্যমেই সুপ্রিয়া চৌধুরীর প্রথম চলচ্চিত্রে আসা।

সাজেদুল আউয়াল
এটা কোন্ সন হবে?

দীনেন গুপ্ত
এটা '৫১ সাল হবে। এখন টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিও বলতে যেটা সেটার নাম আগে ছিল কালী স্টুডিও। টেকনিশিয়ানস স্টুডিওটা চালু হয় রামানন্দ সেনগুপ্ত, সত্যেন

চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহঠাকুরতা, দুর্গা মিত্র এদের সবার সহযোগিতায় । ১৯৫২ সালেই এই স্টুডিওটা আমাদের হাতে আসে ।

সাজেদুল আউয়াল
এবং '৫২-তেই ঋত্বিকের 'নাগরিক' হচ্ছে এবং আপনি কাজ করছেন রামানন্দ বাবুর সাথে ।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ, হ্যাঁ ।

সাজেদুল আউয়াল
এবার আমরা ঋত্বিক প্রসঙ্গে আসি । ঋত্বিকের ক্যামেরা সেন্স সম্পর্কে আপনি সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন ।

দীনেন গুপ্ত
ঋত্বিক বাবুর ক্যামেরা সেন্সটা ভালোই ছিল । কারণটা কী, উনি তো বিমল রায়ের সাথে সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন । বিমল রায় তখন বাঘের মতন ক্যামেরাম্যান । সেই ক্যামেরাম্যানের সহযোগিতায় নিউ থিয়েটার্স-এ ঋত্বিকের বেসটা তৈরি হয়েছিল, ফলে ক্যামেরা, লেন্স এই সবগুলোর ব্যাপারেই উনি খানিকটা দখল নিয়ে নিয়েছিলেন । এবং ঋত্বিক বাবুর সেই দখলটা থাকার দরুন তিনি এক্সপেরিমেন্ট করতে সাহস পেতেন । যেমন ৭৫ লেন্সে ক্লোজআপ ছাড়া তখন খুব একটা কাজ হত না । কিন্তু ৭৫ লেন্সে উনি লং-শট নিচ্ছেন ।

সাজেদুল আউয়াল
তার মানে ক্যামেরা সেন্স থাকাতে ঋত্বিকের শট টেকিংয়ের একটা দক্ষতা ছিল । আপনি ঋত্বিকের ৪টা ফিল্মে চিত্রধারণের কাজ করেছেন, তো তার শট টেকিংয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

দীনেন গুপ্ত
আমাদের সব সময় মনে হয়েছে যে কোনো জিনিসই স্থির করে খাতায় লিখে সেই খাতার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করা সম্ভব না ।

সাজেদুল আউয়াল
ঋত্বিকের বৈশিষ্ট্যও বোধহয় এটা ছিল না ।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ, ছিল না। শট টেকিংয়ের ভাবনাটা ছিল ওর মাথায় এবং সেটার চিত্রধারণ হতে পারে কি না, একবার সেটা ক্যামেরা বসিয়ে দেখাটা ওর অভ্যাস ছিল।

সাজেদুল আউয়াল
আচ্ছা।

দীনেন গুপ্ত
এবং সেটা যদি হতো তাহলে তিনি খুব খুশি হতেন। যেমন 'নাগরিক'-এ একটা শট আছে যে, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শোভা সেনের সাথে কথা বলে ছাদ থেকে নেমে যাচ্ছে এবং যেই ও একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অমনি কেষ্ট মুখার্জি ঢুকছে আরেকটা দরজা দিয়ে। এখন ওর বেরিয়ে যাওয়া আর কেষ্ট মুখার্জির ঢোকাটা সাইমালটেনিয়াসলি হবে কিন্তু ডাইমেনশনটা মোটামুটি এক থাকতে হবে। তো সেইজন্যে ও বললো ৭৫ লেন্সে যান। ৭৫ লেন্সে যে সতীন্দ্র বেরিয়ে যাবে, তারপরে যে ফোকাস চেঞ্জ করতে হবে, সেই ফোকাসটা চেঞ্জ করতে গেলে পরে অন্তত লেন্সটাকে ৫ বার ঘোরাতে হবে। তখন ঋত্বিক আমাকে বলে যে কেটে নিলে ভালো লাগবে না শটটা, সাইমালটেনিয়াসলি শটটা হলে ভালো হয়। তখন আমি করলাম কী, আমার গলায় ঝোলানো যে monochrome ছিল, সেটাকে দিয়ে আমি তিনটে-চারটে প্যাঁচ মারলাম লেন্সটাতে যেই সতীন্দ্র চলে গেল চট করে লেন্সটা টেনে দিলাম ও আউট হল, কেষ্টদা ইন করলেন। তো দুটোই তখন শার্প ফোকাসে, উনি দারুণ খুশি।

সাজেদুল আউয়াল
তার মানে পুরো সিকোয়েন্সটা আপনাকে ঋত্বিক বুঝিয়ে দিতেন।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। প্রতিটা শট, প্রতিটা শট উনি নিজে লুক থ্রু করে, ক্যামেরা অপারেট করে পাঁচবার, ছয়বার করে...।

সাজেদুল আউয়াল
উনি দেখতেন?

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ আমি ঠিক করছি কিনা সেটা দেখতেন। তারপরে শটটা টেক হত। এবং আমাদের ভেতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। আসলে ক্যামেরাম্যান, আর্ট ডাইরেক্টার এবং

ডাইরেক্টার এই তিনজনের মধ্যে ভীষণভাবে একটা টিউন থাকা দরকার। সেই টিউনটা আমাদের মধ্যে বেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যেমন রামানন্দ সেনগুপ্তের সাথে ঋত্বিক এবং আমি যখন কাজ করেছি, তখন আমি রামানন্দ বাবুকে লাইটিং করে দিতাম। উনি আমার ওপর ছেড়েও দিতেন এবং তার ফলে আমার কিছু শেখারও সুযোগ হয়ে গিয়েছিল। সব লাইটিং হয়ে যাবার পর একটা-দুটো ক্ষেত্রে উনি কিছু চেঞ্জ করতেন। কিন্তু মোর অর লেস উনি লাইটিংটাকে মেনে নিতেন।

সাজেদুল আউয়াল
আর কোথায় ক্যামেরা বসবে এটা নির্ধারণ করতেন আপনারা কীভাবে?

দীনেন গুপ্ত
ঋত্বিক বাবু একটা শট নেয়ার পরেই বলতেন, আচ্ছা এখানে যদি ক্যামেরাটা নেই আর এই যদি প্যান করে ধরি তাহলে পরে এই জায়গায় এলে আবার সেই ডাইমেনশনে শেষ করতে পারছি কি? যেমন ধরুন, একটা আউটডোর শট ছিল 'নাগরিক'-এ। আউটডোর থেকে বেরিয়ে চরিত্রটা ইনডোরে একটা চালার মধ্যে ঢুকবে।

সাজেদুল আউয়াল
আচ্ছা।

দীনেন গুপ্ত
তখন আমি কী করি, সামনে একটা বাঁশ রেখে বাঁশটাতে আমি এক্সপোজারটাকে কায়দা করে চেঞ্জ করে দিলাম। তখন মিচেল ক্যামেরায় কাজ হত বলে আমাদের এক্সপোোজার চেঞ্জ করার ফ্যাসিলিটি ছিল। এখনকার ক্যামেরাম্যান, তারা বলে– না-না ওর ভিতরে আরো আলো দিতে হবে। আলো দিলে পরে হচ্ছে কী, বোঝা যায় যে, আলো দিয়ে আউটডোর আর ইনডোরকে এডজাস্ট করেছি এবং তাতে ইনডোরে চরিত্রের একটা বিরাট ছায়া পড়ে। তো সেই ছায়াটা আমি চাইতাম না। এবং সেটা উনি এ্যাপ্রিশিয়েটও করতেন।

সাজেদুল আউয়াল
আমরা অনেক ফিল্মে দেখি যে উনি খুব একটা স্বাভাবিক উচ্চতায় ক্যামেরা বসানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। হয় একটু উঁচুতে না হয় একটু নিচুতে। এটা কেন করতেন?

দীনেন গুপ্ত
এক-এক জনের এক-এক রকম চিন্তা থাকে তো। এই চিন্তাটা ঋত্বিকের...।

সাজেদুল আউয়াল
এক্ষেত্রে কারো কোনো ফিল্মের প্রভাব পড়েছে বলে কি আপনার মনে হয়?

দীনেন গুপ্ত
না, না। উনি ছবির জন্যে যেটা দরকার সেটা করতেন। উনি কাউকে নকল করতেন না।

সাজেদুল আউয়াল
রুশ ফিল্মের প্রভাব পড়েছিল কি কিছু তার ওপর?

দীনেন গুপ্ত
না, না। সেরকম কিছু আমার মনে হয়নি। তার শট টেকিংয়ের ভিতরে একেকটা জায়গায় একেকটা গাইডেন্স নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা কারো অনুকরণ নয়।

সাজেদুল আউয়াল
এবার ফ্রেমিং-এর প্রসঙ্গে আসি। ফ্রেমিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি উনি প্রচলিত বাংলা চলচ্চিত্র থেকে ভিন্ন ধরনের ফ্রেমিং করেছেন, এটাও কি তার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য?

দীনেন গুপ্ত
ছবির হিরো বা হিরোইন যদি ডান দিকে তাকাত তবে ঋত্বিক ডান দিকের ফ্রেমটা একটু ওয়াইড রাখতেন। ফ্রেমটা খুব কাটা, মুখটা ছেলেটির বা মেয়েটির একদম ঘাড়

থেকে কাটা কিন্তু সামনে অনেকটা স্পেস আছে। উনি নিজস্ব একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছিলেন, একেকটা ছবির জন্য একেক রকম প্যাটার্ন। যেটা আপনি 'অযান্ত্রিক'-এ পাবেন, সেটা কিন্তু আপনি 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'-তে পাবেন না।

সাজেদুল আউয়াল
ঋত্বিককে আমরা উইদিন দি ফ্রেম কম্পোজিশন করতে দেখি আবার আউট অব দি ফ্রেম কম্পোজিশন করতেও দেখি। যেমন একটা উদাহরণ 'মেঘে ঢাকা তারা' থেকে দিতে পারি : একেবারে শেষে যখন নীতা বলছে, 'দাদা আমি বাঁচতে চাই' সেই দৃশ্যে দাদার হাতটাই শুধু ফ্রেমে, নীতা সম্পূর্ণভাবে ফ্রেমের ভিতর। এরপর নীতা হাতটা বাড়িয়ে দেয় দাদার হাতের দিকে। শট কম্পোজিশনটা পাল্টে যায়। তো এ ধরনের যে কম্পোজিশন এটা কি লোকেশনে করতেন না আগে থেকেই স্ক্রিপ্টে লেখা থাকত?

দীনেন গুপ্ত

না। কিছু লেখা থাকত না। এটা উনি লোকেশনে করতেন। সেরকম ভাবে ক্যামেরার পাশে দাদাকে দাঁড় করিয়ে হাতটা ফ্রেমে ইন করানো হয়েছে, কেননা নীতা যদি বাঁচতে পারে তাহলে একমাত্র দাদার হাত ধরেই বাঁচবে, সেখানে দাদার হাতের ক্লোজটা লাগছে। যখন দাদা বলল যে বাড়িতে গীতার ছেলেটা বড় হয়ে গেছে, টুকটুক করে উপর-নিচ করছে। বাড়িটা দোতলা হয়ে গেছে, নীতা যা যা ভেবেছিল, সেই স্বপ্নগুলো সব সত্য হয়েছে। তখন তো নীতার মধ্যে বাঁচার আকুতি জাগবেই।

সাজেদুল আউয়াল

'মেঘে ঢাকা তারা'-র আরেকটা দৃশ্যে আমরা দেখছি ব্যাক টু দ্যা ক্যামেরা সনৎ বসে আছে আর নীতার বাবা ফ্রেমের মাঝে। তো প্রায় চলচ্চিত্রেই দেখি যে ঋত্বিকের কিছু কিছু চরিত্র ব্যাক টু দ্যা ক্যামেরায় থাকেন। এটা কি তার কম্পোজিশনের একটা বিশেষ ধরন বলে মনে হয়?

দীনেন গুপ্ত

ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সনৎ কিন্তু এই প্রথম নীতার বাবাকে দেখছে এবং সনৎকে আগে দর্শকরা কিন্তু দেখেছে...।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা, আচ্ছা। সনৎ এই দৃশ্যে ইমপরটেন্ট না।

দীনেন গুপ্ত

না, সনৎ এখানে ইমপরটেন্ট না। সনৎকে ওয়াচ করছেন বাবা এবং সনৎও বাবাকে দেখছে। দর্শকের কাছে সনৎ তো আগে থেকেই এস্টাবলিশড্। সুতরাং ওকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সে জন্যই তাকে ব্যাক টু দি ক্যামেরা রাখা হয়েছে।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র আরেকটা দৃশ্য যেখানে গীতা সনৎ-এর জন্য চা নিয়ে আসছে, তখন সনৎ একেবারে বাঁ কোণে ফ্রেমের তলায়। বরাবরই ফ্রেমের তলায় আমরা তার চরিত্রদের রাখতে দেখি। এটাও কি তাঁর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য; কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে?

দীনেন গুপ্ত

আমরা যেখানে সনৎকে দেখাচ্ছি এবং গীতা যেখানে চা নিয়ে আসছে, আপনি দেখবেন যে, গীতার কিন্তু অনেকটা পোরশন সনৎ দেখছে। সনৎ কিন্তু ভাবছে যে, নীতা আর গীতার মধ্যে ডিফারেন্সটা কী। গীতা চুলটুল এলিয়ে দিয়ে নানানরকম একটুখানি চমক...।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা, আচ্ছা। তার মানে গীতাকে এস্টাবলিশ করার জন্য সনৎকে ঐভাবে রাখা হয়েছে।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ।

সাজেদুল আউয়াল

ফ্রেম মানে হচ্ছে একটা স্পেস এবং স্পেসটার ব্যবহার ঋত্বিক এভাবেই করতেন। তাঁর কম্পোজিশনের ধরন ছিল এটা।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ, নিজস্ব একটা প্যাটার্ন বলা যায়।

সাজেদুল আউয়াল

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' বা 'কোমল গান্ধার'-এর কম্পোজিশনে দেখছি যে অনেক সময় ফ্রেমের মধ্যে একটা এম্পটি স্পেস রাখা হয়েছে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম। এই শূন্য স্পেসটা তিনি আবার ভরেও দিতেন। মানে ফ্রেমের যে শূন্য পরিসরটা, এটাকে ভরে দিতেন কখনো চরিত্রের আগমনে, আবার কখনো দেখছি আকাশ-মেঘ, গাছ, পাহাড় এগুলো দিয়েও তিনি কম্পোজিশনটা করছেন মানে এম্পটি স্পেসটা ভরে দিচ্ছেন। তো, এ ব্যাপারে মানে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে ঋত্বিক লেন্সকে কতটা প্রাধান্য দিতেন?

দীনেন গুপ্ত

দেখুন, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'-তে ছেলেটা যতক্ষণ বাড়িতে ছিল ততক্ষণ আমরা নরমাল লেন্স ইউজ করেছিলাম। ছেলেটা যেই বাড়ির বাইরে চলে গেল মানে কলকাতায় চলে এল তখনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে। হরিদাস বুলবুল ভাজা বিক্রি করছে, ওটা ওয়াইড এ্যাঙ্গেলে নেয়া শট। ওয়াইডে আছে মানে আমি দেখছি যে ছেলেটা

ফোরগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার ক্লোজও আছে। কিন্তু ছেলেটা একটা বিরাট জায়গা দেখছে তার ভিউ পয়েন্ট থেকে তালাটা বড় তার ভিউ পয়েন্ট থেকে আউটরাম ঘাটটা বিরাট। তার ভিউ পয়েন্ট থেকে... ।

সাজেদুল আউয়াল
বিল্ডিংগুলোও খুব বড়।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। তার ভিউ পয়েন্ট থেকে আউটরাম ঘাটের লোকগুলো দেখা যাচ্ছে। বস্তুত ছেলেটা মানে কাঞ্চনের ভিউ পয়েন্ট থেকে সবকিছু দেখানোর জন্যই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহৃত হয়েছে।

সাজেদুল আউয়াল
এখন আরেকটা প্রশ্নে আসি, যেটা হচ্ছে চেঞ্জ ওভারটা মানে দৃশ্যান্তরটা কীভাবে হবে মানে কাট্ হবে, নাকি ডিজলভ্ হবে নাকি ফেডআউট হবে এগুলো কি শুটিংয়ের সময়ই ঋত্বিক ভাবতেন নাকি এডিটিং টেবিলে বসে ডিসিশন নিতেন? না কি এটা স্ক্রিপ্টে থাকত।

দীনেন গুপ্ত
এটা মোটামুটি স্ক্রিপ্টে থাকত।

সাজেদুল আউয়াল
স্যিন শিফটের ব্যাপারটা... ।

দীনেন গুপ্ত
স্যিন যে শিফট হবে, সে শিফটিংয়ের ব্যাপারটা মোটামুটি কী প্রসেসে হবে, সেটা হয়তো উনি ডিসাইড করতেন এডিটিং টেবিলে। কিন্তু স্যিন মিক্সিংয়ে প্রবলেম হত বলে কোনো জায়গায় হয় ফেড আউট করেছেন নয় ফেড ইন করেছেন। আমাদের ফেড আউট ফেড ইনটা শেষের দিকে খুব ভালো হচ্ছিল। কিন্তু আগের দিকে খুব একটা ভালো হত না একটুখানি জ্বল জ্বল করে যেত।

সাজেদুল আউয়াল
লেন্সের কথা আপনি বলছিলেন লেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার বিশেষভাবে কোনো ধরনের লেন্সের প্রতি দুর্বলতা ছিল? একটা তো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল তথা আঠারো লেন্সের কথা বললেন।

দীনেন গুপ্ত
না, সেটা পারটিকুলারলি একটা ছবির জন্য। নট নেসাস্যারিলি সব ছবিতেই উনি ঐ একই লেন্স ইউজ করেছেন। তবে একটা জিনিস হচ্ছে উনি ছবির মধ্যে শার্পনেস চাইতেন।

সাজেদুল আউয়াল
সেই জন্যই কি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের প্রতি দুর্বলতা ছিল?

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। 'নাগরিক'-এও আছে একটা ২৫ লেন্সের শট ছাদের শট ফোরগ্রাউন্ডে ঘুড়িটা বাঁধা রয়েছে, ঘুড়িটা উড়ছে; নিচে ভায়োলিন বাজাতে বাজাতে একটা চরিত্র আসছে। এটা একটা ক্রেন শট ছিল। ক্যামেরা সেটআপ করার পর উনি জানতে চাইতেন কী কী লেন্স আছে। বলতাম ৪০ আছে। ঋত্বিক বলতেন ৩৫ টা দিয়ে একটু কেমন লাগে দেখি। আবার ৩৫ দেয়ার পর বলেন, না ৫০ দে, আবার ৫০ দেয়া হল। তখন বলেন না ৪০ই থাক এইভাবে দৃশ্যটাকে ঋত্বিক...।

সাজেদুল আউয়াল
দাঁড় করাতেন।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ।

সাজেদুল আউয়াল
আমরা দেখেছি যে, ফ্রেমের ফোরগ্রাউন্ডে চরিত্রদের রাখার ফলে তাদের একটু বড় বড় দেখাত। এটা কি ঐ লেন্স ব্যবহার করার জন্য?

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। ঐ লেন্স ব্যবহারের জন্য। তারপরে লাইটিংও আছে। আপনি 'অযান্ত্রিক'-এ দেখবেন যে ফোরগ্রাউন্ডে ধানগুলো সব সার্প ফোকাসে আছে আর পেছনে গাড়ি নিয়ে

ঢুকছে বিমল। এরকম একটা শট আছে। তো আমাকে বললেন দুটো ফোকাস চাই। আমি বললাম যে, দুটো ফোকাস তো হবে না। কারণ ধানের শীষটাকে বড় দেখানোর জন্য আমরা ৭৫ ইউজ করেছি আর ঐ দিকে গাড়িটা দূরে রয়েছে। গাড়ি তো আউট অব ফোকাস হবেই। তারপরে বলেন, এটা কী করে করা যাবে? আমি বললাম, একটাই উপায় আছে, এখন আমরা ওয়েট করি, সানটা ব্যাক-এ যাক। সানটা ব্যাক-এ গেলে পরে জগদ্দল যে ছুটছে, সেটাও পাব। আমি তখন ফোকাসটাকে একটু ঐদিকে ঠেলে দেব, তাতে হবে কি দুটোকে এক সঙ্গে পাবো। ঠিক তাই আছে এখন ছবিতে।

সাজেদুল আউয়াল
তার মানে ডিপ ফোকাসের ব্যাপারটা উনি চাইতেন তখন। আউটডোরেই চাইতেন।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। আবার একেক সময় আছে যে এখানে ফোকাস হচ্ছে, কথা বলছে, কথাটা চেঞ্জ হয়ে যাবার পরেই একটু মুখটা ওদিকে ঘোরাতেই সঙ্গে সঙ্গে ফোকাসটা চেঞ্জ হয়ে গেল।

সাজেদুল আউয়াল
তখনও পর্যন্ত আমরা দেখি যে ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে জুম লেন্সের ব্যবহার...।

দীনেন গুপ্ত
জুম লেন্সটা তখনো আসেনি এবং তার ফলেই ছবিগুলো বেঁচে গেছে। কারণ জুমের ব্যবহার পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান ভীষণভাবে টিউনড না হলে ইফেকটিভ্ হতে পারে না।

সাজেদুল আউয়াল
কোন্ ফিল্মটা থেকে ঋত্বিক জুম ব্যবহার শুরু করলেন?

দীনেন গুপ্ত
আমি যে ক'টায় ক্যামেরাম্যান হিসাবে ছিলাম, তাতে জুম ছিল না।

সাজেদুল আউয়াল
লেন্সের ব্যাপারে আরেকটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। রমেশ যোশী-র সাথে কথা বলছিলাম, উনি বললেন যে ঋত্বিক নানা লেন্স দিয়ে স্ক্রিপ্টের গতিময়তাকে ও

নাটকীয়তাকে ব্লেন্ড করতেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, শুটিং করার সময়ই কি উনি লেন্সের কথা ভাবতেন না আগেই ভেবে রাখতেন?

দীনেন গুপ্ত
সেই যে বললাম আপনাকে, একবার এই লেন্সটা দিয়ে, আবার ঐ লেন্সটা দিয়ে... ।

সাজেদুল আউয়াল
মানে ইমপ্রোভাইজ করে করে উনি দৃশ্যটাকে গতিময় করতেন। তখন তো মনিটর বলতে কোনো কিছু ছিল না।

দীনেন গুপ্ত
না-না। ক্যামেরায় লুক থ্রু করেই মনিটর হত।

সাজেদুল আউয়াল
এবার অভিনয় প্রসঙ্গে আসি অভিনয়শিল্পীদের উনি কি আগে থেকে সিকোয়েন্সটা বুঝিয়ে দিতেন?

দীনেন গুপ্ত
বুঝিয়ে দিতেন। নিজে অভিনয় করেও দেখাতেন। পজিশনে বসে দেখাতেন। কীভাবে হাত তুলতে হবে দেখাতেন।

সাজেদুল আউয়াল
এবার লাইটিংয়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি। কী ধরনের লাইটিং উনি করতে চাইতেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে?

দীনেন গুপ্ত
সত্যনারায়ণের পুজো দেখেছেন 'মেঘে ঢাকা তারা'-য়। সবাই বাড়ির ভিতরে ফোরগ্রাউন্ডে চলাফেরা করছে...কিন্তু এখানে কোনো আরটিফিশিয়াল লাইট ইউজ করা হয়নি। করা হয়েছে রিফ্লেকটার।

সাজেদুল আউয়াল
সান লাইট-এ কাজ করেছেন।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ, সান লাইটে কাজ করেছি। ইচ্ছে করে। আরটিফিশিয়াল লাইট চাইলেই ইউজ করা যেত। কিন্তু আরটিফিশিয়াল লাইটের সাথে বাইরের লাইটটা পাঞ্চ হবে না বলে এবং অতখানি ডেনসিটি দিতে গেলে পরে আর্টিস্টদেরও অসুবিধা হত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখে লাগত, গরম লাগত। সেই জন্য আমরা বাইরে থেকে রিফ্লেকটার দিয়ে আলো ফেলে কাজ করেছি।

সাজেদুল আউয়াল

'মেঘে ঢাকা তারা'-র লাইটিংয়ে এই জন্যই কোথাও কোথাও রিয়ালিস্টিক এটিচিউড দেখা যায়।

দীনেন গুপ্ত

ঠিক তাই।

সাজেদুল আউয়াল

কিন্তু এর অপোজিট একটা জিনিস দেখি আমরা 'নাগরিক'-এ। ফিল্মটা দেখে মনে হয় থিয়েটারে লাইট করার অ্যাপ্রোচের একটা প্রভাব আছে। এক্সপ্রেসনিসটিক একটা এফেক্ট দেবার চেষ্টা আছে।

দীনেন গুপ্ত

কয়েকটা দৃশ্যে, আসলে তখন আমাদের ন্যাচারেলিসটিক লাইট করার একটু অসুবিধাও ছিল। কারণ কী, 'নাগরিক'টা হয় টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিও যখন কেবল চালু হয়, তখনই। তখন আমাদের লাইটের সংখ্যা ছিল কম। ১১টা দু'কিলো লাইট আর ৬টা বেবি লাইট। লাইটের সংখ্যা কম থাকায় একটা লাইটকে আরেকটা লাইট দিয়ে কাটা যাচ্ছে না। তাকে সেপারেট করে বের করা যাচ্ছে না। লাইট কম থাকার দরুন কয়েকটা জায়গায় তাই এরকম সরাসরি আলো ফেলতে হয়েছে। ফলে থিয়েটারের ঢংয়ে লাইট করা হয়েছে বলে মনে হয়েছে, কোথাও কোথাও।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা আচ্ছা। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় আমরা যে গানটা শুনি–'যে রাতে মোর দুয়ারগুলো ভাঙল ঝড়ে'–গানটা চিত্রায়ণের সময় অন্ধকারটা সব সময় ফ্রেম জুড়ে। এই অন্ধকারও তো আলো দিয়েই তৈরি করতে হয়েছে। তো এটা আপনারা কীভাবে করেছেন?

দীনেন গুপ্ত

আপনার খেয়াল আছে কিনা জানি না যে, 'মেঘে ঢাকা তারা'-র ঐ গানটির দৃশ্যের মেইন বিউটিটি ছিল ছাঁচের বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ। ছাঁচের বেড়ার ঘরেতে রাত্রিবেলার স্যিনটায় এই যে বিচ্ছুরণ সেটা কিন্তু ছাঁচের বেড়ার পিছনটায় একটা সাদা শিট রেখে করা হয়েছিল। শিটটার ওপর আলো ফেলাতে সেই আলো ছাঁচের বেড়াটার ওপর এসে পড়াতেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

সাজেদুল আউয়াল

আপনারা শিটের উপর যে আলো ফেলেছিলেন সেই আলো রিফ্লেক্ট করেছে...।

দীনেন গুপ্ত

রিফ্লেক্ট করেছে বেড়ার ওপর এবং এখানে খুবই অল্প আলো ব্যবহার করা হয়েছে। খালি এটা যে ছাঁচের বেড়ার ঘর এটাকে এস্টটাবলিশ করার জন্য। সেই আলো যে ড্যাজলিং করে সানের মতন একেবারে ভেতরে ঢুকেছে, তা না। কিন্তু নাইট স্যিন তো...।

সাজেদুল আউয়াল

তাই আলোর বিচ্ছুরণটা অনেকটা তারার মতো...।

দীনেন গুপ্ত

জ্বল জ্বল করেছে। এবং একটা কি দুটো শটেই পুরো গানটি ধারণ করা হয়েছে।

সাজেদুল আউয়াল

বাংলা ছবিতে এই পদ্ধতিতে দৃশ্যধারণ, মানে বাউন্স লাইটে দৃশ্যধারণ প্রথম করেছেন সুব্রত মিত্র 'অপরাজিত' (১৯৫৬)-তে।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ, তা করেছেন। কিন্তু 'মেঘে ঢাকা তারা'-র গানটাকে যেভাবে তিনি ইউজ করেছেন তাতে বোঝা গেছে যে মেয়েটি তার মনের কথাটি গানটির ভিতর দিয়ে বলতে চেয়েছে। গানটা কিন্তু শুধু 'সংগীত' হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। সেই জন্য আলোর বিচ্ছুরণের প্রয়োজন ছিল।

সাজেদুল আউয়াল

নীতার মনের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্যই গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-তেও বালকের স্বপ্ন-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য ঋত্বিক এক ভিন্ন পন্থা নিয়েছিলেন। ওতে দেখি যে কাঞ্চন যখন মা-র কথা ভাবছে তখন সেই দৃশ্যটা আপনারা বাবল্ দিয়ে ভরে দিয়েছেন। এটা কীভাবে করেছিলেন?

দীনেন গুপ্ত

এটা ডাইরেক্ট বাবল্ দিয়েই করা হয়েছে। আপনি দেখবেন ছবিতে যে বাবল্টা, ওটা কিন্তু ওর গালে গিয়ে ফাটছে। এটা ডাবল প্রিন্ট নয়। ডাইরেক্ট বাবল্ ইউজ করেছি। সাবানের ফেনা থেকে বাবল্ তৈরি হয়েছে। পাঁচ-ছয় জনকে আমরা ক্যামেরার উপরে তৈরি একটা ফ্রেমের উপর বসিয়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকেই এরকম বাবল্ নিচে ফ্রেমের মধ্যে ফেলা হয়।

সাজেদুল আউয়াল

আরেকটা বিষয় : আমরা 'মেঘে ঢাকা তারা'-র টাইটেল সিকোয়েন্সে দেখতে পাই যে, তারা জ্বল জ্বল করছে। এটা কি আকাশের....।

দীনেন গুপ্ত

না। এটা হয়েছে কি, আমি 'মেঘে ঢাকা তারা'-র টাইটেল সিকোয়েন্সটা নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। সেটা হচ্ছে ট্রেজারব্যাংক বলে একটা জায়গা আছে যেখানে আমি রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' ছবির শুটিং করতে গিয়েছিলাম, 'মেঘে ঢাকা তারা'-র শুটিংয়ের এক ফাঁকে। তো আমি এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালুকাতটে দেখছি যে যখন নাকি সাগর থেকে জলটা কিনারাতে এসে আবার ফিরে চলে যায় তখন বালির ভেতরে কেমন একটা ড্যাজলিং হয়। এবং প্রতিবারই যে ড্যাজলিং হয় সেটা কিন্তু একই রকম হচ্ছে না। তো আমি করলাম কি আমার কামেরাটাকে বালুকাতটে বসিয়ে রেখে একটুখানি বেশি ডিফিউসন দিয়ে একটু আউট করে ঠিক স্টার ফরম-এ দেখে ঐ একটা জায়গাতে ক্যামেরাটা বসিয়ে রাখলাম। তখন বারবার বালির উপর জলটা আসছে আর জলটা যখন ফেরত চলে যাচ্ছে তখন ঐ ক্যামেরাটা অন করলাম। আমি ফুটেজটা ঋত্বিক বাবুকে দেখাবো বলে শুট করে নিয়ে এলাম।

সাজেদুল আউয়াল

তার আগেই কি ঋত্বিক বাবুর সাথে স্টারের ইফেক্টের ব্যাপারে কোনো কথা হয়েছিল?

দীনেন গুপ্ত

উনি বলেছিলেন যে আমরা ব্ল্যাক পেপারের এগেইন্সটে হোল করে পেছন থেকে আলো দিয়ে স্টার ফর্ম বের করবো। তো আমি বললাম সেটা খুব মেকানিক্যাল হবে। ড্যাজল করবে না। চিকমিক চিকমিক করবে না। তারায় যেটা করে। ঋত্বিক বাবু আমার আনা ফুটেজটা দেখে পছন্দ করেন এবং ছবির টাইটেলে ব্যবহারও করেন।

সাজেদুল আউয়াল

তার মানে গোটা ছবিটা সাজানোর কথা উনি আগে থেকেই ভাবতেন।

দীনেন গুপ্ত

তিনিও ভাবতেন, আমিও ভাবতাম।

সাজেদুল আউয়াল

এডিটিংয়ের কথা মাথায় রেখেই কি তিনি শুটিং করতেন?

দীনেন গুপ্ত

যে কোনো পরিচালকই এডিটিংয়ের কথাটা মাথায় রেখেই শুটিং করেন এবং সেখানে হচ্ছে কি এডিটর, ক্যামেরাম্যান সবারই খানিকটা খানিকটা বলার থাকে, বলতে পারেন। সেই বলার সুযোগটা ওর কাছে আমাদের ছিল। রমেশ দারও ছিল। তিনিও সেভাবেই তার মতন করে সাজাতেন এবং সাজানোর পরে দু'জনে বসে দেখতেন। কখনো কখনো একটা শটকে ঋত্বিক এদিক-ওদিকও করতেন।

সাজেদুল আউয়াল

সংগীতের কথাটাও কি মাথায় রেখে তিনি শুটিং করতেন?

দীনেন গুপ্ত

একদম-একদম। সংগীতের পুরো ব্যাপারটা মাথায় না রাখলে, ঋত্বিক বাবু যেভাবে ছবি করতেন, তাতে একটু অসুবিধা হত। ঋত্বিক বাবু কেন, মানিক বাবুও সংগীতের ব্যাপারটা পুরো মাথায় রেখেই শুটিং করতেন।

সাজেদুল আউয়াল

এখানে একটা সম্পূরক প্রশ্ন করছি আপনি মানিক বাবু মানে সত্যজিৎ রায়ের কথা বললেন এবং রাজেন তরফদারের কথা বললেন, ঋত্বিক প্রসঙ্গে তো বললেনই এই

তিনজনের সাথেই আপনি কাজ করেছেন। আমি জানতে চাইছি যে ঋত্বিক এবং সত্যজিতের শুটিং করার ধরনের মধ্যে তফাৎটা কোথায় ছিল?

দীনেন গুপ্ত
সত্যজিৎ বাবুর শুটিংয়ের মধ্যে একটা জিনিস আমি দেখেছি কাজ করার সময়...।

সাজেদুল আউয়াল
সত্যজিতের কোন্ কোন্ ছবিতে কাজ করেছেন আপনি?

দীনেন গুপ্ত
আমি করেছি 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর'। আমি ক্যামেরায় সুব্রত বাবুর এ্যাসিসট্যান্ট হয়ে কাজ করেছি এবং সেটাতে উনি আমার উপর খুবই ডিপেন্ড করতেন। সুব্রত বাবু লাইটিংয়ের ব্যাপারটা পুরো আমার ওপর ছেড়ে দিতেন।

সাজেদুল আউয়াল
দু'জনের শুটিং করার ধরনের মধ্যে তফাৎ কিরকম ছিল ঋত্বিক এবং সত্যজিতের কথা বলছি আমি।

দীনেন গুপ্ত
মানিকদা মোটামুটি পুরো প্লানটা মাথায় করেই যেতেন...।

সাজেদুল আউয়াল
এবং একটা স্বচ্ছ স্ক্রিপ্ট থাকত।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। এবং 'অপরাজিত'-তে দেখবেন হরিহর যখন মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কাট্ করছে, দেখা যাচ্ছে যে, পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে ভোরবেলায়...।

সাজেদুল আউয়াল
এগুলো সব আগে থেকেই ভেবে রাখা।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ। সব ভেবে রাখা। আর ঋত্বিকের হচ্ছে যে খানিকটা লোকেশন, খানিকটা ইমপ্রোভাইজেশন, খানিকটা লাইট কন্ডিশন সব মিলেটিলে একটা ব্যাপার হয়ে যেত। মানে যখন যা ভাবতেন, সেই ভাবনার নিরিখেই দৃশ্যধারণ করতেন। আর মানিকদার ব্যাপার হচ্ছে যে মানিকদা ভীষণ মেথোডিক্যাল সব সুন্দরভাবে আগে থেকেই চিন্তা করা। ঋত্বিক বাবুরও আগে থেকে কিছু কিছু দৃশ্য চিন্তা করা থাকত।

সাজেদুল আউয়াল

কিন্তু সেটা তিনি মাথায় রাখতেন।

দীনেন গুপ্ত

হ্যাঁ। যেমন সাঁওতালদের একটা ড্যান্স আছে 'অযান্ত্রিক'-এ। সেটার মধ্যে নানারকম ব্যাপার আছে। রাত্রিবেলা তারা নাচছে, সেখানে তো লাইট নেই। ওখানে আমি মশাল জ্বেলে আর গাড়ির হেডলাইট দিয়ে ট্রাই-এক্স ফিল্মে কাজ করলাম। তো ভারি সুন্দর লাগল দেখতে। তবে ন্যাচারাল লাইট কন্ডিশনটাকে, ঋত্বিক বাবু বলুন, মানিক বাবু বলুন, সুন্দরভাবে ব্যবহার করতেন। কারণ নেচারের লাইট মানে সূর্যের আলো, সেটা তো আর কারো কথায় চলবে না। কোন্ সময় কোথায় লাইট থাকবে, কোন্ সময়টা কোন্ স্যিনের জন্য যাবে, কোন্ সময় সানটা আসবে এ জায়গায় এগুলো অনেক বেশি ভাবা হত এবং সেই টাইম ধরে সেখানে যাওয়া হত, যেটা এখন আর হয় না। এখন বলে, দূর মেরে দাও, যা হবার হবে।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা। একটা প্রশ্ন, যেটা খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে, যেমন ঋত্বিক মুভমেন্টের উপর কাট্ করতেন। এডিটিংয়ের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে জানতে চাইছি যে, এটা কি শুটিং করার সময় ভাবতেন যে এখানে কাট্ হবে?

দীনেন গুপ্ত

কখনো কখনো। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাটিং পয়েন্টগুলো এডিটিংয়ের সময়ই ভেবে ভেবে ঠিক করতেন।

সাজেদুল আউয়াল

আচ্ছা। আপনাদের তো দাদা বা বন্ধু মানুষ ছিলেন উনি। এতদিন পরে তাঁর কাজের মূল্যায়ন কীভাবে করবেন আপনি?

দীনেন গুপ্ত

একেক সময় একেক জন কবি আসেন, যে কবির বিরাট জায়গা থেকে যায় আমাদের মনের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য যে আমি ঋত্বিক বাবুর সঙ্গে কাজ করেছি, সত্যজিৎ বাবু, রাজেন তরফদারের সঙ্গে কাজ করেছি, তপন সিনহার সাথে কাজ করেছি, উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করেছি। এখন যখন একলা বসে থাকি সবাইকে নিয়েই ভাবি এবং ভাবি যে কি রকমভাবে ওরা চলে ছিলেন এবং সেই চলাটার গতিটাকে কেন আবার নতুন করে কেউ পাচ্ছে না...।

সাজেদুল আউয়াল

ঠিক এই কথাটাই রমেশ যোশী বলছিলেন, তাঁকে একই প্রশ্ন করেছিলাম যে তাঁর বন্ধুকে উনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন। তখন উনি বলেছিলেন, কই আরেকটা তো 'সুবর্ণরেখা' হল না, আরেকটা তো 'অযান্ত্রিক' হল না। আরেকটা তো ঋত্বিক এল না! আমার মনে হয় এই যে ক'টি বাক্য উনি উচ্চারণ করলেন এতেই কিন্তু ঋত্বিকের প্রকৃত মূল্যায়নটা হয়ে যায়।

দীনেন গুপ্ত

ঠিক তাই। আমাকে ঋত্বিকের কাজের মূল্যায়ন করার কথা বলছিলেন। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এখন যাদের দেখছি তাদের কারোরই সেই রকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করার বাসনা বা ক্ষমতা নেই।

সাজেদুল আউয়াল

আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আপনি তো তার শ্মশানবন্ধু ছিলেন। ঐ শবযাত্রার কথা কিছু কি আমাদের বলবেন?

দীনেন গুপ্ত

উনি তো মারাই গেলেন আমার চোখের সামনে। আমাকে রাত্রিবেলা মৃণাল সেন ফোন করলেন যে ঋত্বিকের শরীরটা খুব খারাপ। ডাক্তার পিজি থেকে ফোন করেছিলেন। আমি যাব ভাবছি, তুই যাবি? আমি বললাম ঠিক আছে আমি আসছি, তারপরে আমি চলে গেলাম ওখানে। ওখানে গিয়ে দেখি অনুপদা, মৃণালদা নিচে দাঁড়িয়ে। আর আমাদের লাইটের তাপস সেন। একটু পরে ডাক্তার নেমে এলেন। এসে বললেন, কী আর হবে, এ তো কিছু হবার নয়। যান আপনারা গিয়ে একবার দেখে আসুন। বলে উনি চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন স্টুডেন্ট ছুটে এসে বলল, স্যার পেশেন্টের একটু অসুবিধা হচ্ছে, আপনি একবার উপরে আসুন।

তো উনি বললেন আপনারাও আসুন। আমরাও গেলাম। গিয়ে দেখলাম একজন ডাক্তার তার বুকে বারবার চাপ দিচ্ছেন। ঋত্বিক বাবুর একটা পা ভাঁজ করা পা-টা হঠাৎ ধপ্ করে পড়ে গেল।

সাজেদুল আউয়াল
উনি...।

দীনেন গুপ্ত
হ্যাঁ। উনি চলে গেলেন...।

পুনর্মুদ্রণ/পূর্বে প্রকাশের পর

বেলাল চৌধুরী – আবদুশ শাকুর

.....

কথোপকথন: গোলাপ নিয়ে একদিন

আবদুশ শাকুর

সেখানে আর কেন, এবার যাওয়া যাক 'বাংলাদেশ রাইফেলস'র স্কোয়ারে। যে-তল্লাটটি এককালে পরিচিত ছিল পিলখানার, মানে হাতিশালার নামে আর একালে পরিচিত গোলাপোদ্যানের সুনামে।

বেলাল চৌধুরী
কিন্তু মামা আমার একটা মন্তব্য আছে। যদিও গোলাপের চর্চাটা ফ্লোরিকালচারিস্টের দ্বারা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, এদেশের আরম্ভটা হয়েছিল ফরেস্টরেঞ্জারের দ্বারা। তবু বনের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক তো অস্পষ্ট নয়। কিন্তু ফুলের সঙ্গে রাইফেলের সম্পর্কটা যে দুর্বোধ্যই বলতে হয়।

আবদুশ শাকুর

আসলে মামা অরণ্যপাল কিংবা উদ্যানবিদ নয়, বাংলাদেশ-বনের তদানীন্তন প্রধান সংরক্ষক ফরেস্টার মতিউর রহমান অথবা বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের তদানীন্তন মহাপরিচালক জেনারেল আতিকুর রহমান নয়, তাঁদের গোলাপপ্রীতিই ছিল সেন্ট্রাল বিল্ডিং ব্লক অফ দ্য প্রজেক্ট নেম্‌ড 'মডার্ন রোজ'। এই দুই জন বিভাগীয় প্রধানের প্রীতি যদি গোলাপের বদলে গোলালুর প্রতি হত, তাহলে মিরপুরে আর আজিমপুরে দেশের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গোলাপোদ্যান-দুটি গড়ে উঠত না। এই প্রীতির রকমফেরের কারণে আরেকজন ফরেস্টার গোলাপের বদলে গোলালুর বিপ্লব ঘটিয়েছেন পাকিস্তানের সোয়াতভ্যালির কালামেরও উচ্চতর অঞ্চল ওত্‌রোরে। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। জেনেও এসেছি যে ওখান থেকে দেশটি এখন আলুবীজ বিদেশে রফতানি করে। হল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি থেকে পাকিস্তানের আলুবীজ আমদানির দীর্ঘ দাসত্ব মোচন করেছে ওই ফরেস্টারের পেশা-বহির্ভূত নেশাটা।

বেলাল চৌধুরী

কেবল বিভাগীয় প্রধানের উৎসাহে তো হাতেকলমে কাজ সম্পন্ন হয় না। এখানেও বিশেষ কেউ সপ্রেমে বাগানটি গড়ে তুলেছিলেন নিশ্চয় ? ওখানকার রেঞ্জঅফিসারটির মতো ?

আবদুশ শাকুর

সে তো বটেই। তদানীন্তন নায়েক-সুবেদার মীর হামিদুর রহমান। আশির দশকের শুরু থেকে বারো-তেরোটি বছর সমানে প্রাণপাত করে প্রকৃতপক্ষে এই গোলাপপ্রেমীই বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের গোলাপবাগানটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে বলা যায় এদেশে গোলাপচর্চার অধ্যায়টি মোটামুটি এই দুই গোলাপপ্রেমীর হাতেই রচিত হয়েছে।

আবদুশ শাকুর

বলা মুশকিল। অন্তত আরো দুজনের অবদান এঁদের চেয়ে কম নয়। কেননা, গোলাপের সঙ্গে গণসংযোগ ঘটানোর সুযোগ বা ক্ষমতা এঁদের কারুরই ছিল না, যা ওঁদের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

বেলাল চৌধুরী
ওঁরা কারা ? তাঁদের অবদান না জেনে তো প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া ঠিক হবে না।

আবদুশ শাকুর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানির প্রফেসর ডক্টর মাহবুবুর রহমান খান আর তাঁর সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী, বদরুন্নিসা সরকারি কলেজের বটানির তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান, মুফ্তি নুরুন্নেছা খাতুন। সদ্য বিলাতফেরত, ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল রোজ সোসাইটির সদস্য, গোলাপপ্রেমী এই দম্পতির একক উদ্যোগেই ১৯৮২ সালে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ জাতীয় গোলাপ সমিতি' এবং ১৯৮৩ সাল থেকেই প্রচলিত হয় সমিতির বাৎসরিক গোলাপ প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। ১৯৮৯ সালে আমি এই সমিতির জাতীয় পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদকে ভূষিত হই বছরের সেরা লনরোজ-গার্ডেনার হিসাবে। জাতীয় সমিতির অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বাৎসরিক এই গোলাপোৎসব গণসম্প্রচার মাধ্যমগুলোকে দারুণ আকর্ষণ করে। গোলাপলালক হিসাবে, গোলাপোদ্যানে ধারণ করা, আমার সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে, বিভিন্ন সময়ে। নানান রূপে আধারিত গোলাপের চোখধাঁধানো জেল্লা যেন বর্ণ-গন্ধসহই দেশের শহরে-নগরে ছড়িয়ে পড়ে বেতার-টিভি আর পত্রপত্রিকার ব্যাপক কাভারেজ মারফত।

বেলাল চৌধুরী
হাঁ মামা। গোটা আশির দশক ধরে গোলাপের উপস্থিতি আমিও লক্ষ করেছি সর্বদা সর্বত্র বিশেষত এই রাজধানী শহরে। কিন্তু ইদানিং গোলাপ যেন পিছু হটছে। এমনকি নার্সারিগুলোতেও।

আবদুশ শাকুর
হাঁ অবস্থাটা একেবারেই পাল্টে গেছে। এদেশের আধুনিক গোলাপের প্রথম বিপণি সাত নম্বর রোডের 'ধানমন্ডি নার্সারি'। আশির দশকের শেষ বছরটিতে প্রতিষ্ঠানটি গোলাপের চারা বিক্রি করেছিল পঁচাত্তর হাজার আর গত বছর বিক্রি করেছে মাত্র এক হাজার।

বেলাল চৌধুরী
কিন্তু কী কারণ ? কে বা কারা দায়ী এমন বেরসিকতার জন্য ?

আবদুশ শাকুর
বাজার। আগে ঢাকা শহরে ফুলের বাজার ছিল দুটি। মাজারের ফুলের জন্য হাইকোর্ট-গেটের ফুটপাত আর মন্দিরের ফুলের জন্য শাঁখারিপট্টির বারান্দা। আজকের মহানগরের মোড়ে মোড়ে ফুলের বাজার, যেখানে সেখানে ফুলের দোকান। গোলাপের

শত্রু হয়ে উঠেছে গোলাপের বাজার-সম্ভাবনা আবিষ্কারের ব্যাপারটি। একশ টাকা দিয়ে লোকে 'ডাবল ডিলাইট' নামের একটি গোলাপ ফুল কিনবে, দুইশত টাকা দিয়ে 'প্রিন্সেস' নামের গোলাপের একটা চারা কিনবে? কোটি টাকার ব্যবসাকে মনে হবে মাত্র কয়েক টাকার। করপরিদর্শকের অচেনা এলাকার এত বড় একটা মুনাফাখুরির সম্ভাবনা দেখামাত্রই পেশাদার-ব্যবসাদারের ভিড় লেগে গিয়েছে গোলাপের ভুবনে। সৌখিন অ্যামেচারের ঘরোয়া বাগানের বদলে গড়ে উঠেছে শত শত বিঘার গোলাপের খেতখামার। ফলে, সাপ্লাই-ডিমান্ডের লীলাখেলায় গোলাপের দাম নেমে এসেছে দু-এক টাকায়।

বেলাল চৌধুরী

এ তো ভালো কথা। উচ্চতম মূল্যমানের ফুলটি নিম্নতম বিত্তবানের নাগালে চলে এসেছে।

আবদুশ শাকুর

কিন্তু কোন্ গোলাপ? যে-গোলাপ বাজারে খায়। যেমন, বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত অত্যুৎকৃষ্ট লালগোলাপ 'অ্যালেক্'স রেড' নয়, অপুরস্কৃত অনুৎকৃষ্ট লালগোলাপ 'মিরান্ডি'। কেন ? বোঁটা লম্বা, পাপড়ি শক্ত, অধিক টেকসই। পেশাদার কেবল বাজারকেই তোয়াজ করে, মুনাফার মুনাজাত ধরে। প্রতিপক্ষে অ্যামেচার করত দর্শনদারির সাধনা, গুণবিচারির ভজনা। সে খুঁজত গোলাপের তাৎপর্য, এ চায় গোলাপের অর্থ। সারকথা, গোলাপের আভিজাত্য-চমৎকারিত্ব এখানে এখন যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। জাতি হিসেবে আমরা তো ডাচদের মতো পুষ্পমনস্ক নই। হল্যান্ডে দু'বছরের প্রবাসজীবনে আমার মনে হয়েছে ওলন্দাজদের এক গুচ্ছ পুষ্প নিয়ে সোশাল কলের আদর্শ পালন করা কিংবা কিচেনকোণে ইন্ডোর প্লান্টের এক চিলতে কিচেনবাগান লালন করা নাগরিকদের ওপর যেন আইনবলে আরোপিত। তার উল্টাটা করা যেন বেআইনি। একটা গোটা দেশের গণসংস্কৃতির এহেন ফুলেল বৈশিষ্ট্য এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার। ইংরেজদের মতো গোলাপমনস্কও তো নই আমরা। অবশ্য গোলাপের উপযোগী আবহাওয়াও নেই এদেশে।

বেলাল চৌধুরী

আমরা কি আমাদের জাতীয় ফুল শাপলামনস্কও ? দেশময় যার উপযোগী আবহাওয়া ?

আবদুশ শাকুর

আহা মামা আপনি আমার অন্তরতম একটি তন্ত্রী স্পর্শ করে ফেললেন। এখন শাপলাকে নিয়ে আমার গভীর শোক আর প্রবল ক্ষোভের প্রকাশ রুখব কীভাবে ?

বেলাল চৌধুরী
রুখবেন কেন ? উজাড় করে দিন ।

আবদুশ শাকুর
কেমন করে ? কথায় কথা বেড়ে যাবে । এ যে গোলাপি বৈঠক ।

বেলাল চৌধুরী
বৈঠকই তো, সেমিনার তো নয় । বৈঠকও আবার ঘরোয়া, আনুষ্ঠানিকও নয় ।

আবদুশ শাকুর
কিন্তু মামা শাপলাকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিও এত যে টপিকটি খুবই দীর্ঘ হয়ে যাবে । এত বড় একটা অপ্রাসঙ্গিক টপিক?

বেলাল চৌধুরী
অপ্রাসঙ্গিক কেন, শাপলাও তো ফুলই । তাছাড়া জাতীয় ফুল সর্বদাই প্রাসঙ্গিক । গুরুতররূপে উপেক্ষিত জনগুরুত্বসম্পন্ন এই ফুলটিকে নিয়ে আমার দুঃখও কম নয় । আরো লজ্জার কথা যে আমার মতো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকও তার জাতীয় ফুলটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না ।

আবদুশ শাকুর
তাতে কী মামা । কৌতূহলবশত একবার আমি এক ভারতীয় নাগরিককে তাঁর জাতীয় ফুল পদ্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে ফুলটি সম্পর্কে তিনি মস্ত অজ্ঞ । আরেকবার এক পাকিস্তানি নাগরিককে তাঁর জাতীয় ফুল জ্যাসমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে তিনিও তাঁর জাতীয় ফুলটি সম্পর্কে মোটেই কম অজ্ঞ নন ।

বেলাল চৌধুরী
কোনো কৌতূহলীর পাল্লায় পড়ে আমিও যেন সমান অজ্ঞ প্রতিপন্ন না হই, সেই ব্যবস্থাটা আপনাকে এক্ষুনি নিতে হবে মামা । আমি কিন্তু আমার জাতীয় ফুলটি সম্পর্কে কিছুই জানি না ।

আবদুশ শাকুর
আমাদের জাতীয় ফুলের রঙটা তো জানেন ।

বেলাল চৌধুরী
ফুলের আবার রঙের নির্দিষ্টতাও থাকে নাকি ?

আবদুশ শাকুর
থাকবে না কেন? পতাকার যখন থাকে। বুঝলাম আপনি আমাকে প্রভোক করে গোলাপের আসরে শাপলা সম্পর্কে বলাতেই চান। জাতির জন্ম উপলক্ষে জাতীয় ফুলটির অনুমোদনকালেই চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল যে ওটা হবে সাদা শাপলা : নিম্‌ফ্যিয়েসি (Nymphaeaceae) ফ্যামিলি কিংবা গোত্রের নিম্‌ফ্যিয়া (Nymphaea) জিনাস কিংবা গণের ন্যুচেলি (nouchali) স্পিশিস কিংবা প্রজাতির অ্যাল্‌বা বা সাদা ভ্যারাইটি কিংবা প্রকারটি।

বেলাল চৌধুরী
কেন, লালটাই তো সুন্দর এবং ওটাই তো বেশি দেখা যায় সর্বত্র।

আবদুশ শাকুর
বেশি দেখা যায়? ওটা বেশি আগ্রাসী বলে। কোথাও কোনো বিভাজক না-থাকলে লালশাপলা অর্থাৎ ওই রুব্রা (rubra)-প্রজাতিটি জলাধারটির শাপলার বাকি সমস্ত প্রজাতি-প্রকারের খাদ্য একা খেয়ে ফেলে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গোটা বাসভূমিটা একাই দখল করে নেয়। তাছাড়া লালশাপলা দূর থেকে দেখাও যায় না সাদা শাপলার মতো।

বেলাল চৌধুরী
সে বিচারে তো হলুদ শাপলাই শ্রেষ্ঠ? সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে, হলুদ বাতির মতো।

আবদুশ শাকুর
বেশি দেখা গেলেও শাপলা-বেশি দেখা যাবে না। কেননা ওটা কিছু কম-শাপলা। সাদাটির মতো প্রাচীন দেশজও নয়, প্রবর্তিত অর্বাচীন ওটি। আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা নাতিশীতোষ্ণ এশিয়া থেকে আগত ওই ফুলটির গোত্র শাপলার হলেও গণ ভিন্ন। নিম্‌ফ্যিয়া নয়, নিউফার (Nuphar)। হলুদ শাপলাটি শাপলার মতো রাতে ফোটে না, ফোটে পদ্মের মতো দিনে। এবং পাতাসহ না-হলেও, পদ্মেরই মতো জলের ওপরে উঠে থাকে। এই 'নিউফার লিউটিয়া' লালশাপলার চেয়েও বেশি আগ্রাসী। কোনো জলাধারে একে অবাধে ছেড়ে দিলে সে লালশাপলাকেও ভাতে মেরে সাফ করে দেবে কয়েক দিনে।

বেলাল চৌধুরী

দেওয়ার কথাও। স্থাবর হোক জঙ্গম হোক, প্রাণিজগত তো? জোর যার মুল্লুক তার।

আবদুশ শাকুর

এমনি কম-শাপলা সাদাও একটা আছে, 'জায়েন্ট্ আমাজন লিলি' নামে পরিচিত। ওটিরও পরিবার শাপলারই, তবে জিনাস ভিন্ন : ভিক্টরিয়া, নিম্ফিয়া নয়। পদ্মসুলভ কণ্টকিত ডাঁটা সংবলিত সেই 'রেজিয়া' প্রজাতিটিকে বর্তমানে 'আমাজনিকা' বলে। এই প্রজাতির ফুলটির বাংলা করা হয়েছে 'বড়শাপলা'। তবে 'রাজশাপলা'-ই সম্ভবত ঐতিহ্যসম্মত শোনাত।

বেলাল চৌধুরী

সেকালে অনেকেই বলধা গার্ডেনে যেত শুধু ওই শাপলাটা দেখতেই। এখন আছে কিনা জানি না।

আবদুশ শাকুর

আছে। তবে সুখে নেই। বিশালতম এই শাপলাটির ফুলের ব্যাস ২০ থেকে ৪০ সেমি, পাতার ব্যাস ১৮০ সেমির বেশি। হুবহু কাঁসার থালার মতো এর পাতার কিনার সরল কোণ করে ৩ থেকে ১০ সেমি খাড়া হয়ে থাকে। মাত্র এক হাত জলে সুখী এ-শাপলার পাতা নাকি একটি মানবশিশুকে বক্ষে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। সাদা এই অতিবিশিষ্ট শাপলাটির আভিজাত্য আছে বংশবিস্তারের ব্যাপারেও। এ প্রজাতিটি বংশবৃদ্ধি করে শুধুমাত্র বীজজনিত চারার মাধ্যমে, অন্য সব শাপলার মতো গ্রন্থিকা কিংবা রাইজোম (rhizome) থেকে নয়। এজন্যে বাগানপুকুরে এর চাষ করা বলতে গেলে হয়ই না।

বেলাল চৌধুরী

জলজ পুষ্পের উৎপাদন-পালন এমনিতেই এক ভজকট ব্যাপার। তার ওপর এত তোয়াজ করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কেউ করবে না। তার চেয়ে আগ্রাসীগুলোর কোনো একটিকে জাতীয় ফুল করলে ভালো হত না ? কারো তোয়াজের তোয়াক্কা না-করেই ফুটে থাকত নিজের বাহুবলে।

আবদুশ শাকুর

'যত আগ্রাসী, তত ভালোবাসি'-পলিসিও ভালো শোনায় কি ? সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের জাতীয় ফুল সাদাশাপলাকে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের প্রতীকও ভাবা যায়। অর্থাৎ জাতি হিসাবে বাংলাদেশের মতোই শান্তির প্রবক্তা সে।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে তো শান্তিকামী সাদা-কে অশান্তি সৃষ্টিকারী রাঙার আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে ব্যাপারটা যত ঝামেলারই হোক। আমার ধারণা ছিল, দীর্ঘদিনের সরকারি উদাসীনতার কারণেই সাদাশাপলার পপুলেশন ক্রমাগত কমে চলেছে। অনেকদিন ধরে দেখে আসছি, জাতীয় সংসদের উত্তরপার্শ্বস্থ ক্রেসেন্ট-লেকে কেবল লালশাপলারই চাষ হচ্ছে।

আবদুশ শাকুর

একের পর এক সরকার বদলও তো কম হল না। একের পর এক শাপলার মৌসুম বর্ষা আর শরতও তো কম পেরুল না আড়াইটা দশক ধরে। বিশেষভাবে নির্ভেজাল সাদাশাপলার চাষ হতে কোথাও দেখেছেন আজও ? শুধু জাতীয় ফুলটির? নিমফিয়া ন্যুচেলির? আমি তো বটানিক্যাল গার্ডেনের শাপলা-পুকুরটিতেও কেবল হিজিবিজি শাপলাই দেখি। ডেফিনিট কোনো সুচিন্তিত থিমবিহীন।

বেলাল চৌধুরী

তবে কি উদ্ভিদটির পারিবারিক কোন্দলই এর কারণ ? মানে, রাঙারা সাদাকে টিকতে দিচ্ছে না অথবা কোণঠাসা করে রাখছে ?

আবদুশ শাকুর

তা ঠিক জানি না। তবে কোনো লোকেশনে লাল-হলুদ শাপলা প্রবর্তন করতে হলে, তাদের আগ্রাসন থেকে জাতীয় ফুল সাদাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বলধা-গার্ডেনের তিক্ত অভিজ্ঞতাটা ভুললে চলবে না। তিন-চার বছর আগে 'সিবেলি'র শঙ্খনদ পুকুরে ভ্যারাইটির লোভে হলুদ শাপলা 'লিউটিয়া' লাগালে পরে চোখের সামনেই সে একলা পুরো জলাধারটার দখল নিয়ে নেয়, বাকি সব শাপলাকে বাস্তুহারা করে দিয়ে। বিভ্রান্ত তত্ত্বাবধায়ক দেখল যে ধ্বংস করে দিলেও রাইজোম্ থেকে হলুদই বারবার গজিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগে দস্যুটিকে কেবল দমন নয় ধ্বংসই করতে হল। সেই থেকে সেখানে সাদা-লাল-হলদে-নীল শাপলাগুলোকে আলাদা-আলাদা জলাধারে রাখা হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় ফুল সাদাশাপলার পপুলেশন কি লক্ষণীয় রকম কমে যাচ্ছে বলে মনে করেন আপনি ? ন্যুচেলি অ্যাল্বার ?

বেলাল চৌধুরী

আমার তো তাই মনে হচ্ছে। সরেজমিনে সবখানে একবার দেখে এলে আপনারও তাই মনে হবে বলে আমার ধারণা।

আবদুশ শাকুর

কিন্তু জনগণের এই ফুলটিকে আমার মতো গণশত্রুর চাক্ষুষ দেখাও এক ঝামেলারই ব্যাপার। আমি রাজধানীর নাগরিক। শাপলা একটি গ্রামীণ ফুল। তার হ্যাবিট্যাট কিংবা স্বাভাবিক আবাস ইষ্টক-নির্মিত পাষাণের বুকে নয়, জলসিঞ্চিত মৃত্তিকার কোলে। তবু মনে পড়ল যখন, ফুলটির নাগরিক নিবাসগুলো এখনি একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু শাপলার কৃত্রিম আবাসগুলোও তো বেশ দূরে-দূরেই। ওয়ারির বল্‌ধা, গুলশানের বন্‌কিড্‌, মিরপুরের বটানিক্যাল।

বেলাল চৌধুরী

হাঁ মামা। শাপলা কিন্তু বেশির ভাগ নার্সারিতেই নেই।

আবদুশ শাকুর

বেশির ভাগ ডিকশনারিতেও নেই। জানেন মামা ? সব চেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যাপকব্যবহৃত সংসদ বাংলা অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান এবং হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষ– এসমস্ত প্রামাণ্য লেক্সিকনের শব্দ-তালিকাতে শাপলা-শব্দটির ভুক্তিই নেই। তালিকাভুক্ত অন্য কোনো শব্দের অধীনস্থ কোনো আলোচনার সূত্রেও শাপলা-শব্দটির অস্তিত্ব দ্রষ্টব্য নয় কোথাও। অথচ ছাত্রজীবনে লেক্সিকোগ্রাফি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে পড়েছিলাম যে চল্লিশ শতাংশ ভাষাভাষী কর্তৃক ব্যবহৃত একটি শব্দকে সংশ্লিষ্ট ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে স্থান দিতেই হবে।

বেলাল চৌধুরী

বলেন কী ? বনিয়াদি বঙ্গীয় অভিধানগুলোতে শাপলা-শব্দটার না-থাকা এককথায় স্ক্যান্ডেলাস।

আবদুশ শাকুর

জলজ বলে জীবন্ত পুষ্প হয়ে শাপলা আমাদের শহুরে বাগানে থাকতে পারছে না। তাই বলে সে মৃত শব্দটি হয়ে অভিধানেও থাকতে পারবে না ? এতটা বাড়াবাড়ি তো সহ্য করা যায় না। তাই আমি প্রামাণ্য ডিকশনারি সিরিজটি শেষ করে পুষ্পবিষয়ক পুস্ত কাবলিতে চিরুনিতল্লাশি চালিয়েই আমাদের জাতীয় ফুলের শাপলা-নামটার অস্তিত্ব আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলাম। উদ্যোগটি আমার নেতিয়ে-পড়া মনের জন্যে আরো ক্ষতিকর প্রমাণিত হল।

বেলাল চৌধুরী

তার মানে ?

আবদুশ শাকুর

বলছি। এদেশে ফুলের ওপর প্রামাণ্য বই নেই বললেই চলে। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জাতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যানের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার পারভীন এ. হাশেম-এর সুন্দর হস্তলিপিতে চুম্বক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছাড়া আমাদের জাতীয় ফুলটির ওপর রচিত কোনো পুস্তক তো দূরের কথা, উল্লেখযোগ্য কোনো নিবন্ধও পাইনি সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানে।

বেলাল চৌধুরী

এটা তো ব্লাসফিমাস।

আবদুশ শাকুর

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বহু পুস্তকই আছে বাজারে, আমার পাঠাগারেও। কিন্তু কোনো গ্রন্থেই শাপলা-নামক ফুলটির কোনো উল্লেখ নেই, যেহেতু সেখানকার বিশেষজ্ঞদের কাছে নামটি স্বীকৃত নয়। তাঁদের মতে ফুলটির নাম শালুক। এমনকি শাপলা-শব্দটির অস্তিত্বই নেই কোথাও। মিলিয়ে দেখার জন্য আপনাকে কয়েকটি বইয়ের নাম বলছি : আনন্দ পাবলিশার্সের বিখ্যাত দুটি প্রকাশনা ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত রচিত 'ফুলের বাগান', সন্তোষ পাইন রচিত 'ফুল ফোটার সন্ধানে', ড. বিমলাকিঙ্কর জানা প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিলিফুলের চাষ', মজুমদার, যাদব ও খোন্দকার প্রণীত 'প্রসিদ্ধ ফুলের বৈজ্ঞানিক চাষ-পদ্ধতি' শীর্ষক গ্রন্থে শালুক ফুলেরও উল্লেখ নেই, যেহেতু এসব উদ্যানবিজ্ঞানী ফুলটিকে প্রসিদ্ধ মনে করেন না। তবে মনে করলেও ভুল হত না, বারো কোটি লোকের জাতীয় ফুল হিসেবে। সুবিমলচন্দ্র দে তাঁর 'বিজ্ঞানভিত্তিক পুষ্পচর্চা'-নামক গ্রন্থে একটিমাত্র বাক্য হলেও এই মর্মে উপহার দিয়েছেন যে শালুক ফুলকে শাপলাও বলা হয়। তবে 'জলজ ও অস্থানিক বাগান' অধ্যায়ে 'শালুক, শাপলা বা কুমুদ' নামে একটি সাবহেডিং দিয়ে আমার পতন ও মূর্ছা রোধ করেছেন 'বৈজ্ঞানিক প্রথায় ফুল চাষ' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেলাল চৌধুরী

এসব যে নিতান্তই অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে মামা।

আবদুশ শাকুর

আপাতত বিশ্বাসটা রাখুন 'অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট অফ ফেইথ', নিজে যাচাই করে দেখা পর্যন্ত। শালুক ফুলের পিছু নিয়ে আমি আবার প্রবেশ করলাম অভিধানের বাগানে।

সেখানে প্রথমে ঘটে পদ্যের সঙ্গে মোলাকাত, যেমন হরিচরণে : 'চাঁদে দেখি সোহাগে শালুক ফোটে জলে'। ভাবলাম ভালোই তো। এরপর বিভিন্ন শব্দকোষে যা যা পেলাম সেসব নৈরাজ্যেরই রকমারি ব্যাপার। শালুককে একবার ফুল বলা হচ্ছ তো একবার মূল। অথচ ফুল থাকে পানির উপরে, আর মূল থাকে পানির নিচেও নয় বলা চলে জলতলেরও পঙ্কতলে। কখনো পদ্মের মূল বলা হচ্ছে তো কখনো পদ্মাদির মূল। অর্থাৎ শাপলাও পদ্মবিশেষ। মানে, মর্‌ফলজি-ট্যাক্সনমির তফাৎ সবই অসার। ছুটে গেলাম সব শব্দকোষের ভুক্তি 'কুমুদ'-এর পৃষ্ঠায়। সেখানকার বিভ্রান্তিকে তো এক শব্দে অনাসৃষ্টিই বলতে হয়। কুমুদকে কখনো সঠিকভাবে বলা হচ্ছে নিম্‌ফ্যিয়া অর্থাৎ শাপলা, আবার কখনো অঠিকভাবে বলা হচ্ছে নিলাম্বো, মানে পদ্ম। কুমুদ ফোটে কুমুদবান্ধব চাঁদ ওঠার রাত্রিভাগে। তবু তার অর্থ বলা হচ্ছে শ্বেতপদ্ম-রক্তপদ্ম ইত্যাদি। যদিও পদ্ম ফোটে সূর্য ওঠার দিবাভাগে। উপকথাও তো আছে : পদ্ম রাতে না-ফুটে ঘুমিয়ে থাকে, তাই বিধাতা দিবারাত্রি ফুটে-থাকা গোলাপ সৃষ্টি করেছেন। যে-পুষ্প সূর্য না দেখলে ফোটেই না, সে-পুষ্প চন্দ্রের বান্ধব হয় কী করে ?

বেলাল চৌধুরী

তাহলে চন্দ্রকে কুমুদনাথ-কুমাদানন্দ-কুমদপ্রিয়-কুমুদপতি ইত্যাদি বলা হয় কেন ?

আবদুশ শাকুর

ঠিকই বলা হয়। কারণ চন্দ্রের সখী বা পত্নী কুমুদ তারই জন্য রাতে ফুটে থাকে, সে বিদায় হলে বুজে যায় অর্থাৎ সূর্য উঠলে। ঘটনা শুধু এই যে এ-ফুলটি হল কুমুদ বা শাপলা বা শালুক বা নিম্ফ্যিয়া বা ওয়াটার লিলি– পদ্ম বা নেলুম্বিয়াম বা লোটাস নয়। চাতকের ঊর্ধ্বমুখে বৃষ্টিজল পানের মতো কবিপ্রসিদ্ধিই তো আছে, সূর্যোদয়ে পদ্মের প্রকাশ আর চন্দ্রোদয়ে কুমুদের প্রকাশ। মানে চাঁদ ওঠে রাতে, কুমুদও ফোটে রাতে। এই সূত্রেই চাঁদ আর কুমুদের মধ্যে সখ্যসম্পর্ক কল্পিত। এবং এই সুবাদেই, চাঁদ হয়ে যায় কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব, কুমুদনায়ক, কুমুদসুহৃৎ আরো কত কী। সবই ঠিক আছে। যে-শব্দার্থটি পশ্চিমবঙ্গের শব্দকোষগুলোতে ভুল আছে সেটিকে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান শুদ্ধ করে দিয়েছে এই মর্মে যে কুমুদ ফুলটি হল শাপলা ফুল, পদ্মফুল নয়। ওখানকার অভিধানসমূহে কুমুদ-শব্দটির অর্থ ভুল করে পদ্ম দেওয়া হলেও কুমুদফুলের প্রদত্ত উদাহরণগুলো রাতে ফোটার শাপলা ফুলেরই। দিনে ফোটার পদ্মফুলের নয়। যেমন, 'চাঁদে দেখি সোহাগে শালুক ফোটে জলে' (কাব্য নির্ণয়), 'খেলিছে কৌমুদী হাসাইয়া কুমুদেরে' (মধুসূদন দত্ত), 'কুমুদিনী আমুদিনী হিমাংশুমিলনে' (মদনমোহন তর্কালংকার), 'কুমুদী মুদিত হত শশী যেত নিজ স্থান' (গোপাল উড়ে)।

বেলাল চৌধুরী

ঘটনাদৃষ্টে মনে হবে পদ্মের উভয়লৌকিক প্রভাবে ওই সব শব্দসংকলক শাপলাকে আলগা করতে পারেননি।

আবদুশ শাকুর

ঠিক। তাই কোন্‌টা শাপলা আর কোন্‌টা শালুক তা-ও ভালো করে চিনতে পারেননি। এই চেনার ভুলের সূত্রেই বোঝার ভুলের বিদ্রূপাত্মক প্রবচন প্রচলিত হয়েছে 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'। আমার মতে প্রবচনটির লাগসই পাঠ হবে 'শালুক চিনেছেন কোষকার ঠাকুর'।

বেলাল চৌধুরী

শুনতেও তেমন খারাপ শোনাচ্ছে না।

আবদুশ শাকুর

ভালো না-শোনালেও আমি কিন্তু সিরিয়াসলিই বলছি। কয়েকজন উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রী এবং উদ্যানবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনাও করেছি আমি। তাঁদের সর্বসম্মত মত হল : আমাদের জাতীয় ফুলটির জনপ্রিয় নাম শাপলা, পোশাকি নাম কুমুদ অথবা শালুক, তার কন্দসহ নাল বা ডাঁটার জনপ্রিয় নাম শালুক, আর বৈজ্ঞানিক নাম রাইজোম অথবা গ্রন্থিকা ।

বেলাল চৌধুরী

তা হলে সারকথা কী দাঁড়াল মামা ?

আবদুশ শাকুর

সারকথা দাঁড়াল : কুমুদ শুধুই শাপলা, পদ্ম নয়। শালুকও শুধুই শাপলা, পদ্ম নয়। তবে পদ্মের শুধু মূলকে শালুকও বলে। কুমুদ আর শালুক ছাড়া শাপলার সমার্থক শব্দ আমি আর পাই না। পদ্মের সমার্থক শব্দ পাই বহু– কমল, উৎপল, সরোজ, পঙ্কজ, নলিন, শতদল, রাজীব, কোকনদ, কুবলয়, মৃণাল, পুষ্কর, অরবিন্দ, ইন্দীবর ইত্যাদি। কিন্তু এই দীর্ঘ তালিকাটিতেও কুমুদ কিংবা শালুকের কোনো স্থান নেই। কারণ এ-দুটি শব্দের কোনোটিই পদ্মের সমার্থক শব্দ নয়। শুধু শাপলারই সমার্থক শব্দ এরা। শেষকথা : শাপলা-শালুক-কুমুদ-পদ্ম-শব্দাদির নির্ভুল বিবরণ পেয়েছি আমি একমাত্র বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানটির ২০০০ সালের পরিমার্জিত সংস্করণটিতে।

বেলাল চৌধুরী
এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে একটি প্রবচনও তো প্রচলিত আছে যে, 'প্রত্যেক ডুবে শালুক মেলে না'।

আবদুশ শাকুর
জি মামা, আমাদের নোয়াখেলে ভাষায় বলে 'হইত্য ডুবে শালুক মিলতো ন'। এবং কে না জানে যে ডুব দিতে হয় ডাঁটাসহ মূলের জন্যে, জলের উপরের ফুলের জন্যে নয়।

বেলাল চৌধুরী
থাক মামা কোষের কথা। আমি ফুলটা সম্পর্কেই একটু জানতে চাই। শাপলা কি পুরোপুরি দেশজ ফুল ?

আবদুশ শাকুর
শাপলার কেবল হাল্কা নীলচে-সাদা 'নিম্ফিয়া স্টেলেটা' আর আমাদের জাতীয় ফুল সাদা 'নিম্ফিয়া ন্যুচেলি' এই দুটি প্রজাতিই আদি এবং দেশজ। বাকি ডেন্টেটা, রুব্রা, সুপার্বা, কেপেনসিস প্রভৃতি সবই বিশ্বের বিভিন্ন উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে আনীত এবং প্রবর্তিত। যাকে বলে introduced।

বেলাল চৌধুরী
এত সব আপনি জানলেন কী সূত্রে মামা ?

আবদুশ শাকুর
ওই যে, জাতীয় দায়ে। যাতে কেউ আন্তরিক আগ্রহে জাতীয় ফুলটি সম্পর্কে একটু বেশি কিছু জানতে চাইলেই আমার দশা সেই পাকিস্তানি আর ইন্ডিয়ানটির মতো করুণ না হয়।

বেলাল চৌধুরী
দায় তো মামা আমারও ছিল। কিন্তু বিষয়টা তেমন করে মনেই পড়েনি। যদিও এমুহূর্তে অত্যন্ত জরুরিই মনে হচ্ছে।

আবদুশ শাকুর
বাড়তি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্সের ছাত্র থাকতে ম্যাথ্স-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-জুঅলজির যোগফলের চেয়েও বেশি প্রীতি আমার নিবদ্ধ ছিল একমাত্র বটানির প্রতিই।

বেলাল চৌধুরী

আপনি আবার শাপলাপ্রসঙ্গটা ছাড়বেন না মামা। এ মুহূর্তে আমার জাতীয় বোধ তুঙ্গে, একেবারে তারসপ্তকেরও অন্তে। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল হিসেবে এই জলজ ফুলটির নির্বাচন কি সঠিক হয়েছে মনে করেন আপনি ?

আবদুশ শাকুর

করি। বাংলাদেশ বলতে গ্রামবাংলা বুঝতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এবং প্রায় সংবৎসর খানাখন্দ, নালাডোবা, খালবিল, ঝিলপুকুর, হাজামজা দিঘি ইত্যাদির অগভীর জলাধারে শাপলা ফুল আপনা-আপনি ফুটে নানা রঙের শোভার সৃষ্টি করে। এছাড়া জলজ উদ্ভিদটি গ্রামবাংলার অভাবীজনের জন্যে নানাবিধ খাদ্যের জোগান দেয় বিনা পরিচর্যায় এবং বিনা খর্চায়। এই সব বিচারবিবেচনা করেই শাপলাকে এদেশের জাতীয় ফুলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি একান্তই সেকুলার। ভারতীয় জাতীয় ফুল পদ্মের মতো কোনো সনাতন ধর্ম অথবা পৌরাণিক পটভূমির যোগ নেই শাপলার সঙ্গে। উপমহাদেশের তৃতীয় দেশ পাকিস্তানের জাতীয় ফুলটি 'জ্যাসমিনাম সামবাক' ওরফে বেলী হওয়াতে, মানে জলজ না-হওয়াতে, ওটি সহজেই উদ্যানপুষ্প হিসেবে শুষ্ক দেশটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। লক্ষণীয় যে দুই প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও ভারতের দুটি জাতীয় ফুল শুধু জলজই নয়– একই পরিবারের দুটি বোন। কিছু তুলনামূলক তথ্য দেব কী ?

বেলাল চৌধুরী

অবশ্যি। যত খুশি বোনাস দিন। কবে যে আবার জাতীয় ফুলের প্রসঙ্গ উঠবে এবং যথাস্থানে, কে জানে।

আবদুশ শাকুর

দুটি ফুলেরই পরিবার বা গোত্র এক : নিম্ফিয়াসি। শাপলার জিনাস কিংবা গণ হল নিম্ফিয়া, পদ্মের গণ হল নিলাম্বো (Nelumbo)। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল 'নিমফিয়া ন্যুচেলি' (Nymphaea nouchali)-প্রজাতির শাপলা। ভারতের জাতীয় ফুল 'নেলুম্বিয়াম্ স্পিসিওসাম্' (Nelumbium speciosum)-প্রজাতির পদ্ম। শাপলার জলাধারের গভীরতা দু-এক হাত, আর পদ্মের দু-তিন হাত। পদ্ম সকালে ফোটে এবং সন্ধ্যায় ঝরে। শাপলার দু-একটি বাদে সব প্রকরণই রাতে ফোটে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা পরে ফুটে এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হয় এবং এ ভাবে কয়েকদিন থাকে। পদ্ম ফোটে গরমের ছয় মাস, শাপলা প্রায় সারা বছর, তবে বর্ষা ও শরতে বেশি। আমার জানামতে শাপলার প্রজাতি-প্রকরণ বহু, পদ্মের শুধু দুটি : সাদা ও গোলাপি। আমেরিকা থেকে

আনা হল্‌দে লিউটিয়া সম্ভবত নেলুম্‌বিয়াম্‌ই নয়, নিউফার (Nuphar)। পদ্মে নীল রঙ নেই বলে ঘননীল শাপলা কেপেন্‌সিস্‌-কেই (capensis) 'নীলোৎপল' ডাকা হয়, যা ডাহা অবৈজ্ঞানিক। জলের বুকে বিছানো পাতার ওপর শাপলা ফুল বুটার মতো ফুটে থাকে। আর পদ্ম পাতাসহ জল ছেড়ে মাথা তুলে অনেকটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন কৌতূহলে অধীর অথবা আক্রমণের জন্যে অস্থির।

বেলাল চৌধুরী

ফুলের আবার আক্রমণ কী ?

আবদুশ শাকুর

বস্তুত, পদ্ম এত আগ্রাসী যে তার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে চাষিদের বেগ পেতে হয়। প্রতিপক্ষে শাপলা ফসলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। শাপলার ডাঁটা কাঁটাহীন, খুবই উপকারী সবজি। পদ্মের ডাঁটা কণ্টকময় এবং যদ্দূর জানি খাদ্য নয়। পদ্মের কোনিকেল্‌ পেডিসেল্‌ খায় বলে শুনিনি। কিন্তু শাপলার পুষ্পবৃন্তিকা খই-মোয়া-ছাতুর এক উদ্‌যাপিত ভোজোৎসব। এক কথায়, শাপলা যেখানে গ্রন্থিকা থেকে আগাগোড়া কাঁচা-সেদ্ধ-ভাজা খাদ্যের সমাহার সেখানে গ্রিক উপকথায় লোটাস্‌-ঈটার অর্থাৎ পদ্মভোজীকে আলস্যপরায়ণ বা সুখতন্দ্রালস ব্যক্তি বলা হয়েছে। এ মুহূর্তে টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা লোটাস্‌-ঈটার্স নিশ্চয় মনে পড়ে যাচ্ছে মামার।

বেলাল চৌধুরী

না মামা, মন আমার এখন প্রসঙ্গান্তরে যাবে না। আমি অনুতপ্ত বলে জাতীয় ফুলের প্রসঙ্গেই নোঙর গেড়েছে সে। সুতরাং বলেই যান।

আবদুশ শাকুর

এই নিম্নভূমির দেশের মিঠে পানিতে, খালেবিলে-ঝিলে-জলায়, এক কথায় যাবতীয় জলময় স্থানে, আপনাদের ভাষায় অনূপে, অগভীর জলজ শাপলা ফুটে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। তবে স্বাধীনতার পরে জাতীয় পুষ্পরূপে স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে জলজ ফুলের এই পুঞ্জটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময়েরই ব্যাপার যে উপমহাদেশ ভাগেরও বহু পূর্বেই শাপলা অতি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল দেশের শ্রেষ্ঠতম উদ্ভিদ্‌ উদ্যান বল্‌ধায়। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বাগানটি রচনার কালপর্বেই উদ্ভিদ্‌প্রেমী জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী এই উদ্যানে ১৫০টি শাপলা-পদ্মের যথোপযোগী জলাধার নির্মাণ করে তৎকালে প্রাপ্তব্য সকল প্রকারের শাপলারই চাষ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে মুদ্রিত বলধা-গার্ডেনের ব্রোশুরে সাদা-লাল-নীল-গোলাপি শাপলা ফুলের মনমাতানো বাহারের

বর্ণনা পাওয়া যায়। তারপর থেকে বহুকাল ধরে অব্যবহারে পরিত্যক্ত পড়ে আছে শাপলার ডোবাগুলো। এই বাগানেই উপমহাদেশের প্রথম বিশাল আমাজন শাপলাটি Victoria Regia প্রবর্তিত হয়েছিল বর্তমানে যাকে amazonica বলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই পাকিস্তানি নির্মমতায় উদ্ভিদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে গুল্মটি পুনঃপ্রবর্তিত হয় বলধার তত্ত্বাবধায়ক ও বিশিষ্ট উদ্ভিদপ্রেমী অমৃতলাল আচার্যের মমতায় যিনি ১৯৮২ সালে গত হয়েছেন। এই 'রাজশাপলা'টি এখনো বল্‌ধা বাগানের অন্যতম প্রধান অলঙ্কার। তবে এমন চটকদার সাদা শাপলাটির বংশ বিস্তারের সুব্যবস্থা জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানেও কেন সম্ভব হয় না তা বোঝা যায় না। দুই শতাধিক একরের এই জাতীয় বাগানে উপযোগী এবং পর্যাপ্ত একটি জলাধারের অভাবে আমাজন লিলির চারা আজও সেখানে বল্‌ধা থেকেই আনতে হয় বছর বছর। এ ধরনের জাতীয় পর্যায়ের উদাসীনতা না থাকলে, জাতীয় পুষ্পটিকে এক নজর দেখার জন্য আজ যানবাহন নিয়ে অভিযানে বেরুনোর কথা ভাবতে হত না।

বেলাল চৌধুরী

বলধা গার্ডেন তো এখন সরকারি। পরিস্থিতিটি কি পজিটিভ ?

আবদুশ শাকুর

না। মহান এক উদ্ভিদপ্রেমীর মহৎ কীর্তি বলধা গার্ডেন আজ বহু অপ্রেমীর সরকারি বার্ডেন। কারণ বাগানটি সরকারের প্রাপ্তি, সরকারের সৃষ্টি নয়। সরকারি সৃষ্টি হলে অভিনব শাপলা ওই আমাজনিকাটি এত দূরের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এদেশে আসতও না। যেমন অনেক অভিনব শাপলা এত কাছের থাইল্যান্ড থেকেও এদেশে আসছে না। এলেও থাকছে না। বল্‌ধার সিবেলি-সাইকি দুটি বাগানের শাপলা-ডোবা আর পদ্মপুকুরগুলোতে বিদ্যমান আদিম ভ্যারাইটিগুলো ছাড়া কাল্টিভার অর্থাৎ আবাদীপ্রকরণগুলো ষাট-সত্তর বছর পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আহৃত। বিভিন্ন দেশের উন্নত মানের উদ্যানে, বিশেষত উষ্ণমণ্ডলীয় পরিবেশে, কৃত্রিম সঙ্করায়ণের প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে শাপলার বহু গুরুত্বপূর্ণ কাল্টিভারের উদ্ভব হয়েছে। পাশের বাড়িতে, মানে থাইল্যান্ডে, শাপলার অ্যাকোয়ারিয়ামে খয়েরি-কমলা ইত্যাদি নানারকম মনোহরণ রঙের শাপলা আমাদের অনেকেই দেখে এসেছেন। অথচ তাদের জাতীয় ফুল জলজ নয়। শুনেছি, জবা। আসলে জলজ উদ্ভিদের উন্নয়নের দিকে হালে খুব নজর পড়েছে উন্নত বিশ্বের। এক্ষেত্রে বেশি এগিয়েছে জাপান। তার থেকে প্রযুক্তি নিয়ে অনেকখানি আগে বেড়েছে থাইল্যান্ডও।

বেলাল চৌধুরী

জাপান থেকে প্রযুক্তি না-নিয়ে কিংবা থাইল্যান্ড থেকে ভ্যারাইটি আহরণ না করেও, সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপক সন্ধান চালিয়ে প্রাকৃতিক সঙ্করণজনিত দেশজ প্রকরণগুলো জোগাড় করেও এদেশে জাতীয় ফুলের জমজমাট একটা পারিবারিক আসর জমিয়ে তোলা খুব একটা আয়াসসাধ্য হত কী ?

আবদুশ শাকুর

মোটেই না। বরং সহজসাধ্যই হত। কেননা, জুলাই-অক্টোবরের ভরমরশুমে নিম্নজলাভূমির খানাখন্দের সাময়িক কিংবা মৌসুমি জলাধারেও শাপলা জন্মায় সুপ্রচুর। একারণে তখন আশপাশের হাটে শাপলার ডাঁটা বা পেটিওলের সঙ্গে দেদার 'ভ্যাট' এবং শালুক বা পেডিসেল এবং রাইজোমও বিপণিত হয়। এলাকার ঘরে ঘরে শাপলা-বীজের খই-মোয়া-ছাতু খাওয়া হয়। শাপলা-ডাঁটাকে একবার এপাশ একবার ওপাশ করে ভেঙে ভেঙে চুড়ি বানিয়ে কব্জিতে পেঁচিয়ে, হার বানিয়ে গলায় দুলিয়ে এবং ফুলটিকে লকেট হিসেবে বুকের ওপর ঝুলিয়ে গ্রামের মেয়েরা শাপলাকন্যা সাজে। দেখেছেন না মামা ?

বেলাল চৌধুরী

দেখেছি। বিশেষত হাইস্কুল-জীবনে।

আবদুশ শাকুর

এই সব দেখেই তো আমি শাপলাকে বাংলার জনগণতন্ত্রী ফুল বলি। কেননা আবারও মানসপটে অবলোকন করুন : বাংলা বলতে গ্রামবাংলা আর গ্রামবাংলার ব্যাপকতম এবং প্রধানতম ফুল বলতে শাপলা। তবে মিঠেপানির উদ্যান-পুকুরে সম্পন্ন লোকেরা যে-শাপলা লাগায়, সে প্রায়শই লালশাপলা। এ যেহেতু অন্যান্য শাপলার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে না, সেহেতু এটুকু চাষকার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতি-প্রকারের স্বাভাবিক সাঙ্কর্য প্রত্যাশিত নয়। বড় জোর মিউটেশন কিংবা পরিব্যক্তির প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির খেয়ালি প্রকরণ দু-একটা পাওয়া যেতে পারে কালেভদ্রে, যাকে বলে স্পোর্ট। তবে এই 'রেড ওয়াটার লিলি' কিংবা লালশাপলার ফুল ডিসেন্ট্রিতে, স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকারী। এর গ্রন্থিকাণ্ডের গুঁড়ি অর্শ, আমাশয় ও ডিসপেপসিয়াতে ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। স্টেলেটা এবং আমাদের জাতীয় ফুল ন্যুচেলি– এ দুটি দেশজ প্রজাতির ফুল ব্যবহৃত হয় 'কার্ডিয়াক টনিক' হিসেবে। শাপলাফুলে গন্ধসুধা খুব বেশি না থাকলেও, একেবারে কমও নেই।

বেলাল চৌধুরী

জনজীবনের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা জাতীয়ফুলটির লালনপালনে জাতীয় পর্যায়ের এই অমনোযোগিতাটা কি জাতীয় উদাসীনতা ? না কি নাগরিক উন্নাসিকতা? গ্রাম্য পুষ্প জ্ঞানে ?

আবদুশ শাকুর

কোনোটাই না। আসল কথা জাতিগতভাবেই আমরা পুষ্পমনস্ক নই। জাতীয় ফুল হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষিত পুষ্প হিসেবে শাপলা একা নয়, তার সঙ্গী আছে। এমন খবরে কোনো সান্তনা থাকলে, তেমন খবর বিশেষজ্ঞদের কেতাবেই পাবেন। ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত লিখেছেন : পদ্ম ও শালুকের ভাগ্যে জাতীয় পুষ্পের সম্মান জুটলেও উপযুক্ত কোনো সমাদর জোটেনি। ফুলদুটি দুই দেশেই অবহেলিত। ফুলবাগানে এদের বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। পদ্মের তো পুজোতে বহুল ব্যবহার। তবু নগরের অসংখ্য মণ্ডপে পদ্ম আসে খালবিল, খানাখন্দ আর মজাপুকুর থেকে। ফুলগুলো আসে ফুটন্ত কুঁড়ি অবস্থায়। সেগুলোকে জোর করে ফুটিয়ে দিতে হয় হাত দিয়ে।

বেলাল চৌধুরী

আপনি বলছিলেন, পাশ্চাত্যের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পরিশ্রমের ফলে শালুকের বহু ধরনের প্রজাতি এখন পাওয়া সম্ভব। কেবল উদ্যোগী হয়ে আনালেই হয়। এ সুবিধা পদ্মের বেলায়ও আছে না?

আবদুশ শাকুর

বোধ হয় না। পাশ্চাত্যে তো নয়ই, প্রাচ্যেও আমার জানামতে উন্নয়নমূলক কাজ প্রচুর হয়েছে শাপলার ওপর, পদ্মের ওপর তত হয়নি সম্ভবত। সে যাক। জলজ ফুলের বাগানপুষ্প হিসেবে প্রসার লাভ না-করার এক মজাদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধদেব আর দাশগুপ্ত। জলজপুষ্প নাকি মশকসখা। বাংলা-ভারতের জাতীয় ফুলের চাষ মানে এক অর্থে মশারও চাষ। তবে লেখকদ্বয় সান্ত্বনাও দান করেছেন যে ফুলবাগানে ছোট কৃত্রিম জলাধারে এর দু'চারটি করে ফুলগাছ লাগালে অসুবিধাটা খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না। তাছাড়া পুষ্পবিজ্ঞানী তরুণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বৈজ্ঞানিক প্রথায় ফুল চাষ' বইটিতে লিখেছেন যে জলাধারটিতে কিছু মাছের পোনা ছেড়ে দিলে ওরা মশার ডিম খেয়ে মশককুলকে অঙ্কুরেই বধ করে ফেলবে। আর কাছে পেয়ে আমরা নিরাপদেই জলজপুষ্পের শোভা উপভোগ করতে পারব। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয়ফুলের প্রতি নাগরিকদের আকর্ষণও বাড়তে থাকবে।

বেলাল চৌধুরী

মশার ব্যাপারে এঁদের বক্তব্য কথার কথা হলে, আমার বক্তব্য অভিজ্ঞতার কথা। শাপলা-পদ্মের চাষ ছাড়াই ঢাকার ঘরে ঘরে মশার কেমন উচ্চফলনশীল চাষ হচ্ছে, সেটা নগরবাসীর ভোগান্তি এবং নগরপালের স্বীকারোক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

আবদুশ শাকুর

আমি তো বরং শুনেছি যে জলজ উদ্ভিদ্ হিসেবে ছিদ্রবহুল, নরম, এবং সিক্ত টিশুবিশিষ্ট হবার কারণে, দূষক কার্বন-সাল্ফার ইত্যাদি শোষণের মাধ্যমে শাপলা অতিশুষ্কতা তাড়িয়ে এবং অক্সিজেন বাড়িয়ে পরিবেশকে শুদ্ধস্নিগ্ধ করে।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে এমন একটি উদ্ভিদ জনপ্রিয় হয়ে সকলের আশেপাশে থাকলেই তো ভালো হত। কিন্তু আশেপাশে রাখার জন্য হাতের কাছে পাবারই-বা উপায় কী ? আর দশটা ফুলের বীজ-চারার জোগান যেমন যে-কোনো নার্সারিতে গেলেই পাওয়া যায়, তেমন সহজ জোগান পাওয়া শাপলার বেলায়ও কি সম্ভব ?

আবদুশ শাকুর

রাজধানীর দু'চারটি নার্সারি থেকে জিজ্ঞাসাবাদে জেনেছিলাম যে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কৃত্রিম ডোবাতে ফুটে-থাকা শাপলা ফুলটির প্রতি সকল বয়েসের লোকের সোৎসাহ মনোযোগ দেখে তাঁরা মাটির চাড়িতে সাজিয়ে শাপলার জোগান রেখেছিলেন। কিন্তু চাহিদার সৃষ্টি হয়নি বলে বিপণনপ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে এর প্রধান কারণ হল : এ এক ভজকট এস্টাবলিশমেন্ট। দাদি-নানীর হামানদিস্তার মতো হ্যান্ডিও নয়। বেজায় বড় বরং বেয়াড়াই। কোথায় রাখবে নগরবাসী এ চাড়ি ?

বেলাল চৌধুরী

তা-ও তো বটে। ছোট্ট ধনীর তো এটি বিষয়ই নয়। মেজো ধনীর মধ্যেও ফ্ল্যাটবাসীর এ-বস্তু রাখার জায়গা নেই। রাখতে পারেন কেবল বড় ধনীগণ, যাঁরা লনবাগানদার কিংবা ছাদবাগানদার।

আবদুশ শাকুর

আসলে তাঁদের মধ্যেও যাঁরা বাঘা ধনবান, কেবল তাঁরাই পারেন বিবিধ ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে শাপলারও মেলা বসাতে। কেননা, ঝাড়ে-গুচ্ছে না-ফুটে একা-দোকা হেথা-হোথা ফুটে-থাকা শাপলাফুল তেমন আকর্ষক উদ্যান সৃষ্টি করবে না। কিন্তু ওই

বাঘারাও তো ডুববেন আর ভাসবেন কেবল সুইমিংপুলেই। শাপলা ফুলের দু-এক হাত গভীর নকল ডোবাতে তো কোনোটাই করতে পারবেন না তাঁরা।

বেলাল চৌধুরী

কথায় কথায় যে-উপসংহারে আমরা পৌঁছালাম, সেখানে তো আছে কেবল প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ জাতীয় পুষ্পটিকে সহজদৃষ্ট এবং সহজলভ্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনই একমাত্র ভরসা। তাও প্রাইভেট সেক্টরে, সুইমিংপুল ছেড়ে শাপলার জন্য কোনো অসরকারি বসতি কেউ কোনো দিন গড়বে না? হোক না ওটা জাতীয় ফুল।

আবদুশ শাকুর

আসলেই সরকারি বাগান, পার্ক, নয়ানজুলি, লেক, ইত্যাদিতে শাপলাচাষে সরকারি সংস্থার সাগ্রহ প্রয়াস ছাড়া উপেক্ষিতই থেকে যাবে আমাদের জনগুরুত্বসম্পন্ন জাতীয় ফুলটি।

বেলাল চৌধুরী

এ-ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় দাবিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ওপর। তাঁদের 'নগরায়ণ' অভিযাত্রায় অন্যতম সহযাত্রী হতে পারে শাপলা।

আবদুশ শাকুর

হাঁ। পথিপার্শ্বে সৃষ্ট অগভীর জলপ্রণালীতে, শাপলার নেতৃত্বে, উপযোগী জলজ উদ্ভিদকুলের বসতি গড়ে তোলা যায়। তবে সমগ্র জাতির দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মহানগরমুখী রাজপথের ধারে ধারে নয়ানজুলি সৃষ্টি করে তাতে সম্ভাব্য সকল রকমের শাপলাফুলের সমাবেশ ঘটিয়ে স্থায়ী একটি জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থাই করে ফেলতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বেলাল চৌধুরী

হাঁ। এটা ভালো বলেছেন মামা। জাতির পক্ষে শাপলাই স্বাগত জানাক না দেশি-বিদেশি সকল অভ্যাগতকে।

আবদুশ শাকুর

জাতীয় সংসদভবনে পুষ্পসজ্জার সাংবাৎসরিক দায়িত্ব পালন করে থাকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্বারিকালচার বিভাগ। সংসদ-হ্রদের উপযোগী একটি সুনির্বাচিত অংশে শাপলা চাষ করে তাঁরা জাতীয় সংসদের চত্বরেই জাতীয় ফুলটির শ্রেষ্ঠতম সমাবেশটা ঘটাতে পারেন।

বেলাল চৌধুরী
আমিও বলতে চাইছিলাম যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসেই কেবল ঘুচতে পারে জাতীয় ফুলটিকে জাতীয় উপলক্ষে উপস্থাপন করতে না-পারার দুঃখটি।

আবদুশ শাকুর
কিন্তু এসব প্রয়াসের ভিত্তিটিই তো জাতীয়জীবনে অনুপস্থিত।

বেলাল চৌধুরী
ভিত্তিটি কী ?

আবদুশ শাকুর
সেটি আমি বার বার বলেছি। জাতীয় পুষ্পমনস্কতা। যার একান্ত অভাবের কথা শাপলার কথা উঠে পড়ার আগেও একবার বলেছিলাম।

বেলাল চৌধুরী
কী বলেছিলেন যেন মামা ?

আবদুশ শাকুর
বলেছিলাম ইংরেজ-ওলন্দাজদের মতো জাতীয় পুষ্পমনস্কতা না থাকলে মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তি-বুদ্ধিবৃত্তি উভয় বৃত্তিকেই জয়-করা রহস্যময়ী গোলাপসুন্দরীর পেছনে ব্যয়বহুল এবং শ্রমঘন ছোটাছুটিতে আগ্রহী হবে কেন কেউ। ফুল একটা হলেই হল– যথা রজনীগন্ধা।

বেলাল চৌধুরী
হাঁ মামা, গোলাপের স্থলে রজনীগন্ধার ব্যাপক এবং বর্ধিষ্ণু চল দেখছি অনেকদিন ধরে। এর বাস্তবিক কারণটা কী হতে পারে ?

আবদুশ শাকুর
ওটা শাপলার মতো জনগণতান্ত্রিক না-হলেও গণতন্ত্রী ফুল বটে। অথচ তুলনায় চাষ করা যায় অনেক সহজে। রজনীগন্ধা পাওয়াও যায় গোলাপের চেয়ে অনেক সস্তায় এবং ফুলটিকে বেশি সময় ব্যবহার করা যায়। একটি স্টিক থেকে একশটি স্টিকও ব্যবহার হয় উপলক্ষভেদে। বিয়ের গেট-গাড়ি সাজাতে কম খরচে হাজারটিও কেনা যায়। সে যাক। ওটিও তো রোজই, টিউবরোজ। তবে রোজের মতো কাটা-ফুল নয়। গোলাপের মতো কাট্-ফ্লাওয়ার হল গ্ল্যাডিওলাস, যার অপর নাম সোর্ড-লিলি। আসলে কাট-

ফ্লাওয়ার গ্ল্যাডিওলাসই স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে কাট-ফ্লাওয়ার গোলাপের, তবে সীমিত অর্থে। যেহেতু গোলাপের সিংহাসনটি থাকে মানুষের মনোরাজ্যে এবং সেটি অবিজেয়। প্রতি বছর চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি পক্ষীদের সঙ্গীনির্বাচন দিবসে, মানে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনে, ভালোবাসার স্বাক্ষরস্বরূপ প্রিয়জনকে দেবার জন্য রেকর্ড-সেল্ হয় লালগোলাপই, লালচে গ্ল্যাডিওলাস নয়।

বেলাল চৌধুরী
গ্ল্যাডিওলাস লাল হয় না ?

আবদুশ শাকুর
না। হলেও তলোয়ার তো আর ভ্যালেন্টাইন হয় না। দিনটির উপহারকেও-যে ভ্যালেন্টাইন বলে। তরবারির আকৃতি না-হলে কি ওটির জনপ্রিয় নাম সোর্ডলিলি হত ? আসলে এদেশে এখনো পর্যন্ত মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ প্রকারের গ্ল্যাডিওলাসই দেখা যাচ্ছে।

বেলাল চৌধুরী
চল্লিশটি প্রজাতিকেও 'মাত্র' বলছেন মামা ?

আবদুশ শাকুর
প্রজাতি নয় মামা, ভ্যারাইটি। প্রজাতি হল স্পিশিসের প্রতিশব্দ। ভ্যারাইটির প্রতিশব্দ হল প্রকার। এই ভুলটি অনেক বিশেষজ্ঞের পুস্তকেও দ্রষ্টব্য। চল্লিশটিকে মাত্র না-বলে কী বলব। গোলাপের পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ভ্যারাইটির মধ্যে আমার সরকারি বাংলার লনে আর ছাদে আমি নিজেই লালন করেছি সাড়ে তিন শত প্রকার গোলাপের সাড়ে সাত শত বুশ বা ঝোপ। আর রঙের বৈচিত্র্য ? সে তো অবর্ণনীয়। তুলনায় গ্ল্যাডিওলাস হয় সাধারণত মিক্সড কালার অথবা কালারব্লেন্ড।

বেলাল চৌধুরী
তাহলে রমণীয় গোলাপের প্রক্সিটুকুই-বা দিচ্ছে কী করে এই পুরুষালী ফুলটি ?

আবদুশ শাকুর
ওটা দিয়ে বুকে বা বাস্কেট বানানো সোজা, ঘর সাজানোয় সুবিধা। আসল কথা টেকসই। জলে একটা স্টিক সপ্তাহব্যাপী রাখা চলে অনায়াসে। তুলনায় গোলাপ অতিশয় নরম নাজুক স্পর্শকাতর। যার অনেক ভ্যারাইটিকে তো ক্ষণস্থায়ীও বলা যায়।

বেলাল চৌধুরী
তাহলে চিরবিদায়ী হয়ে যাবে নাকি কবিকথিত পুষ্পরানী আমাদের এই শহর থেকে ?

আবদুশ শাকুর
উপায় কী মামা। মাটি হারিয়ে রোদ-পিয়াসী ফুলটি আশ্রয় নিয়েছিল দোতলা বাড়ির ছাদে এবং তেতলা বাড়ির চাতালে। কিন্তু গোলাপের এই রেফুজি কলোনিগুলোও গুঁড়িয়ে দিয়ে লোকে যখন বহুতল ভবন গড়েই চলল, গোলাপ তখন আক্ষরিক অর্থেই শৃঙ্খলিত হয়ে গেল। নিরালোক প্রাণ কণ্ঠাগত হলে বেরিয়ে চলে এল এক চিলতে বারান্দায়। সেটাও গৃহভৃত্য শিশুশ্রমিকদের কিংবা হোম-মেকার নারীকর্মীদের শোবার ঘরটি হয়ে গেলে গোলাপকে সরে যেতে হবে বারান্দাবহির্ভূত উপযোগী কোনো কার্নিশে-সানশেডে, তা-ও যদি দক্ষিণে মেলে।

বেলাল চৌধুরী
দক্ষিণে কেন ?

আবদুশ শাকুর
গোলাপ শৈত্যপ্রিয় এবং রোদপিপাসু। তাই উত্তরায়ণের সূর্যে কোনো কাজ নেই তার। আমার সময় সময় মনে হয় যে বাস্তুকলাঘটিত এই ফ্যাক্টরটিই গোলাপবিশ্বে মিনিয়েচার-রোজের ক্ষেত্রে মার্কিন মুল্লুককে অগ্রবর্তী করেছে। তাদের হাজার-খুপরির কন্ডোমিনিয়ামগুলোতে হয়তো-বা পলিয়েন্থার বাড়টুকুকেও বেহিসেবি মনে হয়। এ কারণেই-যদি বর্তমানে তাদের ফেভরিট হয় মিনিয়েচার, তাহলে ভবিষ্যতে তো তাদের হবিপ্লান্ট হবে মাইক্রোরোজ।

বেলাল চৌধুরী
রোজের আবার মাইক্রো কী ?

আবদুশ শাকুর
ওই যে 'সি'-নামের মিনিয়েচার শ্রেণীর একটা গোলাপ আছে না, যার গাছের উচ্চতা চার ইঞ্চির মতো, আর ফুলের কুঁড়ির আয়তন গমের সমান। এবার আন্দাজ করুন। আমি নিজে মাইক্রোরোজের জোগাড়ে নামিনি। ধারণাটাই আমাকে টানে না এমন অকিঞ্চিৎকর একটি গোলাপের প্রতি। স্প্যানিশে 'সি'-মানে নাকি 'হাঁ'। ভাবখানা এই যে হাঁ এটি গোলাপই।

বেলাল চৌধুরী
কিন্তু মামা, অ্যামেচারের হাত থেকে পেশাদারের হাতে গিয়ে গোলাপ মার খেয়েছে– এ কথাটা বাকি বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মেলাব কী করে ?

আবদুশ শাকুর
মেলানো যাবে না। উন্নত বিশ্বের হালহকিকতই বিপরীত।

বেলাল চৌধুরী
তাহলে সেই হদিসটিই জানা যাক।

আবদুশ শাকুর
ইউরোপেও অনেক কাল গোলাপের রেকর্ডে খামতি ছিল। ভ্যারাইটিগুলো ছিল অজ্ঞাতকুলশীল। কোনো উদ্যানপালক নয়, গবাদিপশুপালক হেনরি বেনিট-নামক জনৈক ইংরেজ প্রথম কুলপরিচিতিসহ কয়েক প্রকার হাইব্রিড-টী গোলাপ বিপণন করেন ১৮৭৮ সালে। যেমন ধরুন একালের 'ডাবল ডিলাইট' ভ্যারাইটিটি বিপণিত হল তার মাতাপিতার নামোল্লেখপূর্বক। মাতা, মানে সিড-প্যারেন্ট, 'গ্র্যানাডা'-নামক গোলাপটি এবং পিতা, মানে পোলেন-প্যারেন্ট, 'গার্ডেন পার্টি'-নামক গোলাপটি। তার পরে লিখিত থাকবে বা কথিত হবে নবজাতক গোলাপের প্রকারটির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গুণাবলি। ব্যস কুলপরিচয় উক্ত হবার ঐতিহাসিক এই ঘটনাটার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশে শুরু হয়ে গেল বাণিজ্যিক গোলাপ প্রজনন। এবং নতুন নতুন গোলাপ সংকরায়ণের একটা দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল প্রজননবিজ্ঞানী, নার্সারিমেন এমনকি পুষ্পশ্রমিকদের মধ্যে। গোলাপ ব্যবসা জমে উঠল আন্তর্জাতিকভাবে। সেই সুবাদে আমরা গোলাপপ্রেমীরা পেতে থাকলাম অভিনব যত রঙবেরঙের গোলাপ। হাজারে হাজার বরং বেগায়রে-শুমার।

বেলাল চৌধুরী
ঘটনাটার এত কী তাৎপর্য, তা তো বোঝা গেল না।

আবদুশ শাকুর
বর্ণিত অগ্রগতিটির তাৎক্ষণিক তাৎপর্য হল, অন্যান্য ফুলের মতো অজ্ঞাতকুলশীল আর রইল না কুলীন পুষ্প গোলাপ। আর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তো প্রমাণিত হয়েছে বহুমুখী। যেমন গোলাপই হয়ে উঠল একমাত্র ফুল যার পেডিগ্রি কিংবা কুলজি সংরক্ষণীয় এবং প্রয়োজনে সংগৃহীতব্য। উপস্থিত উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৩ সালে প্রজনিত গাঢ় লাল রঙের মখ্‌মলে পাপড়ির বিরল গুণসম্পন্ন বহু দশকের জনপ্রিয় 'জোসেফিন

ব্রুস'-নামক গোলাপটিকে মনে পড়ছে। এর মাতার নাম 'ম্যাজ হুইপ' আর পিতার নাম 'ক্রিমসন গ্লোরি'। অসাধারণ এই গোলাপটির বংশতালিকা আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতেই আছে অষ্টম প্রজন্ম পশ্চাৎ পর্যন্ত। জোসেফিন ব্রুসের অষ্টম প্রজন্মের পেছনের দাদির নাম 'লেডি ব্যাটারসি' (১৯০১) এবং তাঁর স্বামীর নাম 'লিবার্টি' (১৯০০)। শুধু এই কুলপঞ্জির ব্যাপারটিই তো আমার কাছে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগে। অথচ আমাদের এখানে ব্যাপারটা সেদিকে গেলই না বলা চলে।

বেলাল চৌধুরী

কেন গেল না মামা ?

আবদুশ শাকুর

কারণ ওদেরটা তখনই ছিল পরিণত ক্যাপিট্যালিস্টিক সোসাইটি। উইথ অল ইটস মেরিট্স অ্যান্ড ডিমেরিটস, উইথ বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ কোয়ালিটিজ। পজিটিভ দুটি বড় কোয়ালিটি হল প্রতিযোগিতা আর উদ্ভাবন। এই ইতিধর্মী দিক দুটি আমাদের প্রিক্যাপিলিস্টিক সোসাইটিতে নেই।

বেলাল চৌধুরী

সেজন্যেই কি এদেশে সংকরায়ণের প্রচেষ্টা হয়নি ?

আবদুশ শাকুর

হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নয়। প্রথম সফল সংকরণও করেন সেই রেঞ্জ-অফিসার গোলাম সাত্তার চৌধুরী, ১৯৭৫ সনে। তাঁর স্ত্রীর নামের সেই 'ফাতেমা সাত্তার' গোলাপটিকে বিশিষ্টও বলতে হয়। কারণ ব্রিটিশ পরিভাষায় এটি একটি ইন-বিটুইন-রোজ– না হাইব্রিড-টী, না ফ্লোরিবান্ডা। যেমন 'কুইন এলিজাবেথ', এ জাতের গোলাপকে আমেরিকায় বলত গ্র্যান্ডিফ্লোরা এখন অবশ্য সব দেশে ওটাই বলে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্স-এর সুবেদার-নায়েক মীর হামিদুর রহমানও মোটামুটি মানের একটি হাইব্রিড-টী সংকরায়ণ করে নাম রাখেন স্ত্রীর নামে 'রাহেলা হামিদ'। চমকপ্রদ একটি গোলাপ পান বটানিক্যাল গার্ডেনের বটানিস্ট মোহাম্মদ সামছুল হক ১৯৮৪ সালে এবং নাম রাখেন এদেশের মহত্তম গণনেতার নামে 'মাওলানা ভাসানী'। জনৈক তরুণ রোজারিয়ান মির্জা শোয়েব বেশ কয়েকটি সঙ্কর গোলাপ তৈরি করেছেন এবং বটানিস্ট সামছুল হকের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবারপরিজনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নাম রেখেছেন জাতীয় তাৎপর্যের স্মারকস্বরূপ 'বায়ান্ন' 'একুশে' 'সূর্যোদয়' ইত্যাদি। তবে তাঁর সংকরায়িত শ্রেষ্ঠ গোলাপটি হল কমলা রঙের ফ্লোরিবান্ডা 'হেমন্ত'।

বেলাল চৌধুরী

বাংলাদেশে সংকরায়িত গোলাপগুলোর মধ্যে কার প্রজনিত কোন্ গোলাপটিকে আপনি শ্রেষ্ঠতম বলবেন ?

আবদুশ শাকুর

নিঃসন্দেহে 'মাওলানা ভাসানী'-নামক গোলাপটিকে। এর সংকরায়ক বিশিষ্ট এই নতুন গোলাপটি পান 'ব্ল্যাক ভেলভেট' আর 'তাজমহল'-নামক দুটি গোলাপের মিলন ঘটিয়ে। মাতা-পিতা উভয়েরই গভীর সুরভির উত্তরাধিকারী এই গোলাপটিকে সৌরভের রাজাই বলা যায়। গাঢ় গোলাপি রঙের প্রচুর পাপড়ি সংবলিত প্রচুরপ্রজ বড় ঝোপের গুল্মটির কাছে গেলেই সনাতন গোলাপের নিবিড় গন্ধ বাতাসবাহিত হয়ে এসে তৃপ্ত করে। গোলাপটিকে সেই এলোমেলো ক্লাসিক 'বসরাই'-এর সুযোগ্য স্মারক বলা চলে। আমার প্রিয় নেতা মাওলানার মতোই ঢিলেঢালা অগোছালো এই গোলাপটির পাঁচ-সাতটা গুল্ম আমি বাগানময় বিক্ষিপ্ত রাখতাম যাতে গোটা বাগানটাই সুরভিত বোধ হয়।

বেলাল চৌধুরী

গোলাপ নিয়ে এইটুকু চর্চাও কি আর হচ্ছে এখন ?

আবদুশ শাকুর

না। গোলাপ নিয়ে আনন্দ আমাদের ব্যাহত হতে থাকে নব্বইয়ের দশক থেকেই। গোলাপচর্চার অভিযান প্রায় থেমেই যায় দশকটির মাঝামাঝি নাগাদ। তার সব চেয়ে বড় কারণ তো আগেই বলেছি। উৎপাদনহীন একটি দেশের ঘাতক ক্যান্সারস্বরূপ আবাসিক ইমারতের অনিয়ন্ত্রিত
বংশবিস্তার ।

বেলাল চৌধুরী

আপনার 'গোলাপ বিসংবাদ' পড়ে মনে হয় গোলাপকে আপনি কেবল বিত্তবানের বিলাসিতার সামগ্রী ভাবেন না।

আবদুশ শাকুর

না। গোলাপ তো সুন্দরেরই প্রতীক। এবং সে হিসাবে তা কেবল কতিপয়ের বিলাসিতার উপকরণমাত্র নয়, সমুদয়ের প্রয়োজনীয়তার অবলম্বনও বটে। কিন্তু কতিপয় অধিপতি সমুদয় অধিকৃতের জন্য কল্যাণ আর সুন্দরের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজনের সৃষ্টি করেছে পরোক্ষে এবং প্রচ্ছন্ন বিধান দিয়েছে যে তাদের কল্যাণের

প্রয়োজন এতই অপরিহার্য যে সুন্দরের প্রয়োজন পরিহার্যই। তারপরে বেচারাদের কল্যাণ-ওরফে-ভোগ্য-ওরফে-গোলালু অর্জনের অশেষ ফ্যাসাদে বেঁধে ফেলে পরোক্ষে বলে দিয়েছে যে ফ্যাসাদটি চুকে গেলে তবেই তাদের সুন্দর ওরফে-উপভোগ্য-ওরফে-গোলাপের প্রতি হাত বাড়ানোর সময় আসবে। অথচ সত্যটি হল একই সঙ্গে কল্যাণের ও সুন্দরের, ভোগ্যের ও উপভোগ্যের, গোলালুর ও গোলাপের প্রয়োজনটি মানবমাত্রেরই অপরিহার্য। সুতরাং তার সংগ্রাম এবং আরাম দুটোই জড়িত যুগপৎ দুটোরই সঙ্গে। একটার পরে একটার সঙ্গে নয়।

বেলাল চৌধুরী

আচ্ছা মামা, আপনাকে তো কোনো অর্থেই পেশাদার রোজারিয়ান বলা যাবে না?

আবদুশ শাকুর

না। আমি গোলাপের একজন অ্যামেচারমাত্র। তাই গোলাপ বিষয়ে আমার কাজের কথার বদলে কেবল বাজে কথা। আসলে আমার কাজের জগতের বিপরীতেই বিরাজ করে গোলাপের রূপের ভুবন। গোলাপ আমার পেশা নয়, নেশা। ভোকেশন নয়, অ্যাভোকেশন। অন্য কথায় গোলাপ আমার হবি।

বেলাল চৌধুরী

নিত্যব্যবহৃত এই হবি-শব্দটির সংজ্ঞা কিংবা ব্যাখ্যা দিতে হলে আপনি কী বলবেন ?

আবদুশ শাকুর

হবি সংজ্ঞামতেই 'মোর ইন্টিলেকচুয়াল দ্যান ফ্যাক্‌চুয়াল'। ব্রিজখেলা-দাবাখেলা হবি হয়, কিন্তু তিনতাস বা লুডু খেলা হবি নয়। আরো যথাযথ উপমা বয়ন করেছেন এক্সপার্ট-সিরিজের বিশ্ববরেণ্য পুষ্পলেখক ডক্টর ডেভ্ হেসায়ন। তিনি বলেছেন : পর্বতারোহণ করা, নৌচালনা করা 'হবি', কিন্তু এস্কেলেটরে পাহাড়ে ওঠা অথবা ফেরিতে নদী পার হওয়া হবি নয়। হবি হতে হলে বিষয়টিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মতো জটিল-কঠিন হতে হবে। সেজন্যে টিউবরোজের মতো একটি বিশিষ্ট পুষ্পও রোজের মতো হবিপ্লান্ট হতে পারে না কেবল তাকে ঘিরে সূক্ষ্মজটিলতা এবং লার্নেড লিটারেচার পর্যাপ্ত নয় বলে। লিটারেচার ছাড়াও হবিপ্লান্ট হবার প্রার্থীদের জন্য আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে থাকতে হবে উদ্ভিদটির অশেষ সম্ভাবনা, নিত্যনূতন কাল্টিভারের লাগাতার বিস্ফোরণ, উদ্ভিদটিকে নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমিতি, ফ্যানক্লাব, সাড়ম্বর প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এবং অ্যানুয়্যাল চেকলিস্ট গাইডবুক বিশেষজ্ঞবিরচিত বইপুস্তক ডিকশনারি এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদির অগণন পাবলিকেশন। অন্যান্য অবদানের সঙ্গে এই

বুদ্ধিজীবিতার তৃষ্ণাটুকু নিবারণের অশেষ ক্ষমতা থাকার কারণেই সারা বিশ্বের একনম্বর হবিপ্লান্ট গোলাপ। আমারও।

বেলাল চৌধুরী

দু'নম্বর হবিপ্লান্টও নির্ধারিত আছে নাকি বিশ্বের ?

আবদুশ শাকুর

আছে। ক্রিসেনথিমাম মানে চন্দ্রমল্লিকা। তিন নম্বরও নির্ধারিত, পুষ্পরাজ ডালিয়া। তবে এই ত্রিরত্নের পরবর্তী মেধাতালিকাটি কিন্তু তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, যেহেতু সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণ সর্বসম্মত নন। হবিপ্লান্ট হিসাবে ফিউশিয়া, লিলি, পিলারগোনিয়াম, সুইট-পি, গ্ল্যাডিওলাস, আইরিস, ডায়ানথাস, কার্নেশান ইত্যাদি ফ্লাওয়ার-এক্সপার্ট হেসায়নের নির্বাচন এবং এই ক্রমানুসারেই। আরেকজন বিশেষজ্ঞের মেধাতালিকা অথবা তালিকার অনুক্রম ভিন্ন হতে পারে যেহেতু নির্বাচনটি কিছুটা ব্যক্তিরুচিভিত্তিক বলেই কৃত্রিম। তবে এতৎসত্ত্বেও ওই বিগ-থ্রির ব্যাপারে কোনো পুষ্পপণ্ডিতেরই দ্বিমতের অবকাশ নেই।

বেলাল চৌধুরী

এ যে দেখি রীতিমতো আন্তর্জাতিক চাকরি পাবার মতো সুকঠিন ব্যাপারস্যাপার !

আবদুশ শাকুর

সাধারণ চাকরি নয় মামা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফত যথাযোগ্যতা প্রমাণসাপেক্ষে সৌন্দর্য ও মেধার বলে অর্জিতব্য চাকরি। একান্ত স্বতন্ত্র ক্যাডারের এই কাভিনান্টেড পোস্টে। প্রতিযোগিতাও-যে কত কট্টর, সে তো ফিউশিয়া-নামক অত্যুজ্জ্বল প্রার্থীটিও হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে। হবিপ্লান্ট হিসেবে স্বীকৃতির মৌন আবেদনখানি বেচারির অদ্যাবধি পেন্ডিং রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞগণও অলস বসে নেই, বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিপক্ষে, সুপারস্টার হবার প্রতিভা থাকলে স্বয়ং পালকপিতার প্রতিকূলতার তোয়াক্কা না-করেও-যে ওই অতিবিশিষ্ট পদটি নিজগুণেই ছিনিয়ে নেওয়া যায় এবং তা কেবলমাত্র গুটিকতক বিচারকের কলম থেকে নয়, লক্ষকোটি ভক্ষকের কবল থেকেই– তার প্রমাণ হল দশপয়সার মাপ থেকে ডিনারডিশ সাইজের রকমারি ডালিসমৃদ্ধ জমকালো মরশুমি পুষ্প ডালিয়া। নিজের নামটির জন্যেই ঋণী যাঁর কাছে, সেই সোয়েডিশ বটানিস্ট Anders Dahl বা আন্ড্রিয়াজ ডাহ্লই মেক্সিকান বিউটি এই ডালিয়াকে উদ্যানপুষ্পের বদলে লালনপালন করেছিলেন খাদ্যসবজি হিসেবে। কিন্তু ফুলটির বর্ধিষ্ণু বাহারে মজে গিয়ে এক পর্যায়ে জনগণ পুষ্পটিকে দেখে মনই ভরাতে লাগল, তার কন্দ খেয়ে পেট ভরানোর বদলে।

বেলাল চৌধুরী

সব্বনাশ ! ডালিয়ার কন্দ খাওয়া যায়? কথাটা চাউর হয়ে গেলে তো ফুলটির?

আবদুশ শাকুর

বিপদ হয়ে যাবে? তাই না ?

বেলাল চৌধুরী

যাবেই তো । এই লক্ষকোটি অন্নহীনের দেশে । কিন্তু আসলেই ডালিয়ার কন্দ কি ভালো খাদ্য?

আবদুশ শাকুর

সুখাদ্য বলেই ডালিয়ার কদর ছিল প্রথমে কন্দেরই জন্য । প্রকৃতপক্ষে শাপলা-কচু থেকে টিউলিপ-ডালিয়া পর্যন্ত বেশির ভাগ কন্দ সুখাদ্য বলেই তো শুনেছি । সে যাক । প্রতিভার বরপুত্র পুষ্পরাজ ডালিয়ার বিপরীত প্রান্তে প্রতিভাহীনাদের ট্র্যাজিডিটাও দেখুন । আমাদের চালের লাউ-কুমড়ো ফুল, অঙ্গনের কচুঘেঁচু ফুল, প্রাঙ্গণের সর্ষেফুলের মতো মাঝারি মেধাবিরা মানুষের খাদ্যই রয়ে গেল আবহমান কাল থেকে । মন জয় করে খেকোদের পেট থেকে নিজের মুক্তিটুকু অর্জন করে নিতে পারল না আজও । জানি না, হাভাতের দেশে না-জন্মে কোনো অন্নপূর্ণা দেশে জন্মালে পারত কি না । সম্ভবত পারত না । ন্যাস্টার্শিয়ামের কথাই ধরুন না । এর রঙচঙে ফুলগুলো আপনার বাতায়ন-বাক্স, বাগানবেড আলোকিত করে ফেলে । তবু জাতের সংখ্যা সীমিত এবং চাষের পদ্ধতি সহজ বলে ফুলটি হবিপ্লান্ট হতে পারে না । যেহেতু সে উদ্যানপালকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে না, তাই তার ডিভোশনও পায় না । আসলে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আত্মনিবেদন আদায় করে নিতে না পারা পর্যন্ত কোনো ক্রিয়াই হবি হবার মর্যাদা পায় না । যে-কারণে সে-মর্যাদাটা পায় মাউন্টেনট্রেকিং, সি-সার্ফিং ইত্যাদি । উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই ।

বেলাল চৌধুরী

আপনার লেখায় আধুনিক গোলাপকে আপনি চরম শোষক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে উল্লেখ করে তাকে তুলনা করেছেন একই রকম শোষক শ্রেণীর নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তথা মনুষ্যবিশেষের সঙ্গে । পরোক্ষে এর অর্থ কি এ-ও দাঁড়ায় নাকি যে বেশি ঐশ্বর্যশালী হতে হলে বেশি শোষক হতেই হয় ।

আবদুশ শাকুর

জি। বাড়াবাড়ি ঐশ্বর্যশালী হতে হলে চরম শোষকই হতে হয়। এবং সেজন্যেই লেখাটিতে আমি ব্যাখ্যা সহকারেই মত প্রকাশ করেছি যে আমার কাম্য চরম ঐশ্বর্য নয়, চরম থেকে কম। প্রাণী চাপা দিতে হয় তেমন গতি চরম হলেও দুর্গতিই, সদ্গতি নয়। তাই আমি চাই ম্যাক্সিম্যাল নয়, অপ্টিম্যাল। কেননা অপ্টিম্যালে ম্যাক্সিম্যালের অবাঞ্ছিত ভেজালটা থাকে না।

বেলাল চৌধুরী

গোলাপ নিয়ে এদেশের আশির দশকের মাতামাতিকে আপনি কি সত্যিকার অর্থে গোলাপচর্চা মনে করেন ?

আবদুশ শাকুর

আপনার সন্দেহ সমূলক। গোলাপচর্চা-কথাটা একটা কথার কথাই। বস্তুত যা হয়েছে তাকে ঠিক চর্চা বলা যায় না। কিছু চারা হয়েছে, গাছ লাগানো হয়েছে, ফুল ফোটানো হয়েছে, মন ভোলানো হয়েছে। যাঁরা কিছুকাল গোলাপের আশেপাশে থেকেছেন, সমিতি-প্রদর্শনী করেছেন, তাঁরাও বড়জোর গোলাপের প্রতি অন্যমনস্ক কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণই করেছেন। ধরা যাক, আশপাশের মানুষদের তাঁরা গোলাপমনস্ক করে তুলেছেন। ব্যস ওই পর্যন্তই। এখনও এখানে কোনো প্রয়োজনীয় লিটারেচার সৃষ্টি হচ্ছে না, উপকরণ তৈরি হচ্ছে না, উপাদান জোগানো হচ্ছে না। গোলাপবিষয়ে দক্ষ পরামর্শের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি প্রজাতি-প্রকার নিরূপণের মতো প্রাথমিক এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রটিতেও যে বিশৃঙ্খলা এবং দায়িত্বহীনতা বিরাজমান তা সত্যি শোকাবহ।

বেলাল চৌধুরী

যেমন?

আবদুশ শাকুর

উদাহরণ? দিচ্ছি। আশির দশকের মাঝামাঝি আমাদের ন্যাশনাল বটানিক্ গার্ডেনের ডিরেক্টারের কার্যালয়ের গাড়িবারান্দা সংলগ্ন জনপ্রিয় একটি মডার্ন শ্রাবরোজের ফুলে ফুলে ছেয়ে-যাওয়া একটা ঝোপের পাশে নামফলক লাগানো দেখলাম 'হাজারী গোলাপ'। এ-নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে পরিচালক বললেন : হাজার হাজার ফুল ফোটে, সেজন্য। শুনে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলাম। গোলাপটির নাম 'অ্যাঞ্জেলিনা'। সমধিক পরিচিতা মডার্ন শ্রাবরোজ 'ব্যালেরিনা'র বোন এটি। পণ্ডিতম্মন্য ছিলেন না বলেই পরিচালক মহোদয় নামটি শুধরেছিলেন।

বেলাল চৌধুরী

এমন উৎকট হাউলার! তা-ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান-কৃত ? রাইফেল্‌সের বাগানেও দেখেছেন নাকি এরকম কিছু ?

আবদুশ শাকুর

দেখেছি। Grand' me`re Jenny (গ্রঁ মের জেনি)-র নামফলক 'পীস'। 'ক্রিশ্চান ডিয়র' গোলাপটির নামফলক 'মিস্টার লিংকন' তো প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। নানান জায়গায় আরো দেখেছি 'টাটা সেন্টিনারি'র নামফলক 'হ্যারি উইটক্রফ্‌ট'। 'শকিং ব্লু'-র নামফলক 'অ্যাঞ্জেল ফেস'। বাইকালার গোলাপ 'ওসিরিয়া'র নামফলক বাইকালার গোলাপ 'পিকাডিলি'। এমনি আরো অনেকই।

বেলাল চৌধুরী

ভুল দেখিয়ে দিলে কি ভুলকর্তারা শোধরাতেন ?

আবদুশ শাকুর

এ একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন। সময়টিতে গোলাপপ্রেম এত জেনুইন ছিল যে কারো কোনো পণ্ডিতম্মন্যতা ছিল না। জানার আগ্রহ ছিল ব্যাপক এবং আন্তরিক। সকলেই শোধরাতেন এবং কেউ কেউ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একটা চারাও উপহার দিতেন আমাকে, মানে সংশোধককে। যাক। গোলাপচর্চা সম্পর্কে বলতে চাইছিলাম যে গোলাপ এমনি একটি লোকেশন-স্পেসিফিক ফুল যার সম্বন্ধে দূরদেশি নির্দেশনা-ব্যবস্থাপনা খুব বেশি কাজে আসে না। মাটিপানি-আলোবাতাসের ভিন্নতার কারণে, এই উপমহাদেশেরই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গবেষণাও আমাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গোলাপকে বেশি দূর নিয়ে যাবে না। বাংলাদেশের পরিবেশে গোলাপসংক্রান্ত অনেক গবেষণা আমাদের নিজেদেরকেই করে নিতে হবে। অথচ আজও পর্যন্ত এদেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কি পেশাদার চারিত্র্যের, বলতে গেলে, কিছুরই কিছুই হয়নি।

বেলাল চৌধুরী

কিছুরই কিছুই না হলে এত সুন্দর সুন্দর হাজার হাজার গোলাপের রূপেরঙে আলোকিত ঢাকা-গাজীপুর-সাভারের এতগুলো বিরাট বিশাল গোলাপোদ্যানকে আপনি কী বলবেন ?

আবদুশ শাকুর

এগুলোকে গোলাপোদ্যান না বলে গোলাপারণ্য বলাই ভালো। উদ্যানপালন-যে একটি বিশিষ্ট শিল্প তার কোনো প্রতিফলন, কিংবা উদ্যানপরিকল্পনার কোনো ছাপই প্রাপ্তব্য নয় এসবের কোথাও। ফলে আমাদের না আছে অষ্টাদশ শতকের ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনিঙের কোনো অনুকরণ, না আছে উনিশ শতকীয় 'জোসেফিনো' গার্ডেনিঙের কোনো অনুসরণ। আমাদের কোনো গোলাপবাগানে কোনো মৌলিক কাঠামো নেই। নেই কোনো রকম পরিকল্পনা বা নীলনকশা। জাত, গোত্র, রঙ ইত্যাদিভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত বিচার, বিবেচনা, বুনট বিন্যাস– কিছুরই তোয়াক্কা করা হয়নি কোনো একটা উদ্যানরচনায়। গ্রাউন্ডকাভার, আন্ডারপ্লান্ট, হেজিং অর্থাৎ ক্ষেত্রাবরণী, অন্তর্গুল্ম, ঝোপবেষ্টনী ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা তো এসব বাগানের আলোচনায় অবান্তর। এদেশে আজ পর্যন্ত গোলাপের একটা ট্রায়াল গ্রাউন্ড আরম্ভ হল না। ভারতের প্রথম ফুলের ট্রায়াল গ্রাউন্ড শুরু হয়েছে গোলাপেরই, করেছে রোজ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া ১৯৮৬ সালে। দিল্লীর চাণক্যপুরীতে ন্যাশনাল রোজ গার্ডেনের পার্শ্ববর্তী জমিতে এটি অবস্থিত। তারও আগে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে ভারতের প্রথম গোলাপের ডাকটিকেট, স্বদেশে প্রজনিত 'মৃণালিনী' আর 'সুগন্ধা'-নামক দুটি শ্রেষ্ঠ গোলাপের চিত্র সংবলিত।

বেলাল চৌধুরী

ভালো কথা। ভারতে কেমন অগ্রসর গোলাপচর্চা ?

আবদুশ শাকুর

সেদেশে পুষ্পরানীর অগ্রগতি এমন যে পুজোর অনুষঙ্গ না-থাকলে পদ্মের বদলে ইতিমধ্যেই হয়তো ভারত তার জাতীয় ফুল গোলাপকেই করে ফেলত। যেমন যুক্তরাষ্ট্র গোলাপকে জাতীয় ফুল করেছে মাত্র কিছুকাল আগেই। তার আগে সেদেশে ফুলটির মর্যাদা ছিল রাজ্য পর্যায়ের, রাষ্ট্রীয় নয়। ইংরেজদের এত আগে করা কাজটি মার্কিনীদের এত পরে করতেও জাতীয় অহমে বাধেনি, এমনি সম্মোহনশক্তি গোলাপের। সে যাক। এদেশের পিলখানায়, সালনায়, সখীপুরে, সাভারে যত বড় বড় গোলাপবাগান আছে তার তুলনায় আবশ্যিক পেশাদার জোগান বলতে কিছুই নেই।

বেলাল চৌধুরী

বিশাল গোলাপবাগানের মালিক আমাদের ন্যাশনাল বটানিক্যাল গার্ডেনের? মামা যেন বটানিক্ গার্ডেন বললেন ?

আবদুশ শাকুর

হাঁ। অফিশ্যাল নাম ইংরেজিতে National Botanic Garden, Mirpur। ইংল্যান্ডে যেমন The Royal Botanic Gardens। বটানিক্যাল গার্ডেন অনানুষ্ঠানিক বা জনপ্রিয় নাম। বাংলায় যেমন জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান। পুরোটাই জনপ্রিয় নাম।

বেলাল চৌধুরী

যা বলছিলাম। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে তো থাকার কথা পর্যাপ্ত পেশাদার জোগান ।

আবদুশ শাকুর

না মামা, বিলকুল নেই। পেশাদার এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটিতে আছে কেবল গোলাপের চারা বিক্রি করা। তা-ও প্রাইভেট নার্সারিগুলোর রেটেই। তা ছাড়া ওটাকে বেড়ানোর পার্ক পর্যন্ত ভাবা যায়। বটানিক্যাল গার্ডেন বলতে আমার বাধে।

বেলাল চৌধুরী

কেন মামা ?

আবদুশ শাকুর

সাধারণ বিনোদনমূলক পার্কের দৃষ্টি থাকে কেবলমাত্র ল্যান্ডস্কেপ এফেক্টের দিকে। প্রতিপক্ষে বটানিক্যাল গার্ডেনের ভিত্তিই থাকে সংগৃহীত উদ্ভিদের প্রজাতি-প্রকারের পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক এবং প্রাকৃতিক সম্পর্কের ওপর। দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুই প্রদর্শকের নয়, বিজ্ঞানীরও বটে। প্রদর্শন এবং বিজ্ঞান দুটি দিকই সমানে প্রয়োজনীয়। কারণ মানুষের জীবন থেকে গাছগাছালি কেবলি দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেহেতু মানুষ নিয়তই নগরের পাথরের উপরে উঠে আসছে। বন বলুন কি অরণ্য, নাগরিকদের জন্য এখন এই কৃত্রিম উদ্যানটুকুই শুধু আছে। অতএব এখানে তার উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বল্পতম চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা থাকতেই হবে।

বেলাল চৌধুরী

তা তো বটেই। বটানিক্যাল কিংবা বটানিক্ মানে উদ্ভিদতত্ত্বসংক্রান্ত। উদ্ভিদতত্ত্বই না থাকলে বটানিক্ গার্ডেন নামটা হবে কেন ?

আবদুশ শাকুর

নামটা হয়েছে পরিকল্পনা-অনুযায়ী। বাস্তবায়নানুযায়ী ওটা না বটানিক্যাল, না গার্ডেন।

বেলাল চৌধুরী

তা বাস্তবায়ন তো মামা এদেশে কোনোটাই পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না। এই বাগানটাকে আলাদা
করে দোষ দেওয়া কেন।

আবদুশ শাকুর

দোষ-গুণের কথা নয় মামা। এ যে কোনো ফরমুলাতেই পড়ে না। এটা না আধুনিক কালের, না প্রাচীনকালের বটানিক্যাল গার্ডেন।

বেলাল চৌধুরী

বটানিক্যাল গার্ডেন প্রাচীন কালেও ছিল নাকি ?

আবদুশ শাকুর

ছিল বইকি। প্রাচীন চীন থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরীয় অনেক দেশেরই সুদূর অতীত পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বটানিক্যাল গার্ডেনের সুলুকসন্ধান মেলে। তবে সেকালের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেগুলো ছিল প্রকারান্তরে ফল, সবজি আর ওষধির বাগান। এ রকমটি হলেও আমাদের বাগানটিকে অন্তত মান্ধাতার আমলের বাগান বলা যেত। ইউরোপের রেনেসাঁস-পর্বে ইতালির পাদুয়া আর পিসাতে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাগান দুটিকেই প্রথম আধুনিক উদ্ভিদোদ্যান ধরা হয়, তবে বটানিক্যাল গার্ডেন নয়। কালে কালে এগুলোর নামকরণ হয় 'ফিজিক গার্ডেন্স'। এসব বাগান সংযুক্ত ছিল ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে। তখনকার প্রধান বটানিস্ট বলতে ছিলেন মেডিসিনের প্রফেসারগণই। তাঁদের ফিজিক-গার্ডেনের কাজ ছিল আয়ুর্বেদি উদ্ভিদ লালনপালন করা এবং আয়ুর্বেদি ওষুধ তৈরি করার জন্য ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দান করা। ইউরোপে এরকম উদ্যানের সংখ্যা ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত ছিল মাত্র পাঁচটি। এই সংখ্যা আঠারো শতকের অন্তে দাঁড়ায় ষোল শতে। অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকেই যথার্থ বিজ্ঞানরূপে গড়ে ওঠে উদ্ভিদবিদ্যা এবং পরিণত হয় হায়ার অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে। এই সময় থেকেই প্রোফেশনাল বটানিস্টগণ উদ্ভিদোদ্যানের ডিরেক্টরপদে বৃত হন এবং 'ফিজিক গার্ডেন'ও রূপান্তরিত হয় 'বটানিক্ গার্ডেনে'।

বেলাল চৌধুরী

আপনিও তো উদ্ভিদতাত্ত্বিক উদ্যানের ওপর একটা অ্যাকাডেমিক লেকচারই দিয়ে দিলেন মামা।

আবদুশ শাকুর

সরি মামা। অনেক পুঞ্জিত তিক্ততার উদ্গার এসব। এই জাতীয়-উদ্ভিদোদ্যানটিতে এটা সেটা জানতে গিয়ে এত হোঁচট খেতে হত যে এক পর্যায়ে আমাকে জানতে হয়েছিল এদের কাছে নাগরিক হিসেবে আমার প্রত্যাশা বেশি হয়ে যাচ্ছে, না কি প্রত্যাশাপূরণের প্রস্তুতিই এদের কম আছে। একটুখানি অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ক করতেই জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের এই জাতীয়-উদ্ভিদোদ্যানটি আধুনিক বটানিক্যাল গার্ডেনের না অতীত রূপের সমিল, না বর্তমান রূপের। প্রথম রূপে বিশ্বময় এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল জীবন্ত উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল হওয়া। পরে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু পরিমিত করে উদ্ভিদের শোভাবর্ধক দিকটিকে নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রীয় বিবেচনায়। এভাবে উদ্ভিদোদ্যানের মূল দুটি কাজের মেলবন্ধন হয়ে যায় উদ্ভিদের দৃষ্টিনন্দনতা আর বর্গগত শৃঙ্খলা। বিশ্বময় বর্তমান বটানিক্ গার্ডেনগুলো হল এই আই-অ্যাপিল অ্যান্ড ট্যাক্সনমিক্যাল অর্ডারের মনোহরণ কম্বিনেশন। যেজন্য দারুময় তরুরাজিকেও আর্বারিটাম নাম দিয়ে একপাশে রাখা হয়। আরেকপাশে রাখা হয় হার্বেরিয়াম বা নিরুদিত উদ্ভিদশালা যাকে উদ্ভিদের 'ডিকশনারি'ও বলা হয়।

বেলাল চৌধুরী

কিন্তু মামা আমাদের গার্ডেনটা কি ওরকম সুচারুরূপে রচিত হবার মতো অত বড় সড় কিছু ?

আবদুশ শাকুর

মামা, ওহায়োর মেন্টরের বাইশ শ একর আর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের চোদ্দ শ একরের মেগাবাগান দুটিকে বাদ দিলে বাকি দুনিয়ার প্রায় সব গার্ডেনই বেশ ছোট। ফ্রান্সের লেওঁরটি তো মাত্র পনেরো একরের। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত, এবং সর্বাধিকসংখ্যক ২৫০০০ প্রজাতির প্লান্ট সংবলিত, ইউ.কে.'র রয়েল বটানিক্ 'কিউ গার্ডেন'টি যখন মাত্র দুই শ অষ্টাশি একর, তখন আমাদের দুই শ আট একরের বাগানটিকে ছোট বলা যায় না। এই আয়তনের পরিসরে, ওসব বাগানের মতো অত সমৃদ্ধ না হলেও অর্নামেন্টাল প্লান্টের দৃষ্টিতে কিংবা ন্যাচারেল রেলেশানশিপের ভিত্তিতে দর্শকদের বিশেষ তৃপ্তি বিধানের জন্য ছোট ছোট স্পেশাল গার্ডেন গড়ে তোলা যেতই। যেমন গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বনফুল, শাল, সেগুন, ইত্যাদি কিংবা জাপানি নিসর্গচিত্রকল্প উদ্যান প্রভৃতি।

বেলাল চৌধুরী

এদেশে এরকম টল-অর্ডারের সাপ্লাই পাওয়া কি সম্ভব ?

আবদুশ শাকুর

তাহলে থাকুক ওসব। শর্ট-অর্ডারের সাপ্লাইও পাচ্ছি না কেন ? এঁদের নির্বাচিত উদ্ভিদবিশ্বের দশ হাজার প্রজাতির দুই শ আট একর বাগানের মধ্যে একটিমাত্র জিনাস 'রোজা'র দু-একটি প্রজাতির দু-এক শ প্রকারের জন্য এঁরা খরচ করে ফেললেন প্রায় পাঁচ একর। অথচ রোজের ফ্যামিলি 'রোজেসি'র আর একটি জিনাসকেও গোলাপবাগানের আশেপাশে রাখলেন না উদ্ভিদবিশ্বের পারস্পরিক প্রাকৃতিক সম্পর্ক প্রদর্শন করার জন্য যা বটানিক্যাল গার্ডেনের, বলতে গেলে, প্রথম উদ্দেশ্য।

বেলাল চৌধুরী

ফর এগজাম্পল, কোন্ জিনাসটি রাখা যেত ? আপনি নিজে কী রাখতেন ?

আবদুশ শাকুর

হাইব্রিড-টী গোলাপগুলোর পাড়ায় কৃত্রিম টেরাস সৃষ্টি করে তাঁরা রাখতে পারতেন গোলাপপরিবারের কৃতী সদস্য চায়ের কিছু গুল্ম, যার বৈজ্ঞানিক নাম 'ক্যামেলিয়া সাইনেন্সিস'। রাখতে পারতেন একই পরিবারের আরেক সদস্য 'ক্যামেলিয়া' ফুলটির দু-একটি গুল্মও। গোলাপের সঙ্গে যার সূক্ষ্ম সাযুজ্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এমনি সুচিন্তিত আরো কিছু উদ্ভিদের সন্নিকর্ষও সহজেই কল্পনীয়। যেমন গোলাপপরিবার রোজেসিরই আরেক সদস্য উজ্জ্বল সোনালি-হলদে পুষ্পের বাহারে ক্ষুদ্রগুল্ম 'কেরিয়া জাপনিকা'র নয়নাভিরাম রানিং-হেজ দেওয়া যেত বটানিক্যাল গার্ডেনের গেট সংলগ্ন গোলাপবাগানটির সদর রাস্তার ধারে ধারে।

বেলাল চৌধুরী

এ-ও মনে হয় টল-অর্ডারের মধ্যেই পড়ে এদেশে।

আবদুশ শাকুর

তাহলে আরো শর্ট অর্ডারই নিন। অন্যান্য দেশের জাতীয় উদ্ভিদোদ্যানের মতো বটানিক্যাল লাইব্রেরি সার্ভিস, ল্যাব রিসার্চ আর গ্রিনহাউস ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটি সৃষ্টি করা, টেকনিক্যাল জার্নাল, পপুলার ব্রোশুর এবং বিশেষ উদ্ভিদের ওপর সহায়ক পুস্তক প্রকাশ করা। যেমন জনপ্রিয় পুষ্প গোলাপ অথবা জাতীয় ফুল শাপলা বা পথিপার্শ্বের মনোহারী শোভাবর্ধনকারী দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষ 'পলিয়্যালথিয়া পেন্ডুলা'র ওপর– যে-অর্নামেন্টাল প্লান্টটির জনপ্রিয় নাম অ্যাভিন্যু প্লান্ট।

বেলাল চৌধুরী
এ তো মামা টলেস্ট অর্ডার হয়ে গেল ।

আবদুশ শাকুর
তাহলে একেবারে শর্টেস্ট অর্ডারটিই দিচ্ছি। বটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টার হবেন সিলভিকালচারিস্ট নয়, একজন জেনারেল বটানিস্ট। সহায়ক থাকবেন একজন ট্যাক্সনমিস্ট, একজন প্লান্টপ্যাথলজিস্ট, পাঠাগারবিজ্ঞানী একজন পেশাদার লাইব্রেরিয়ান, কয়েকজন গার্ডেনার-ট্রেনার, পার্টটাইমার হলেও। কিউ, এডিনবরা, ডাবলিনের বটানিক্যাল গার্ডেনগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যানপালকগণ বিভিন্ন দেশের উদ্ভিদোদ্যানে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জানি না, দ্বিতীয় বটানিক্যাল গার্ডেনরূপে পরিকল্পিত এবং চট্টগ্রামে সৃজিতব্য 'একো পার্ক'টির জন্যও প্রয়োজনীয় পেশাদার স্টাফ ট্রেন করে নিচ্ছে কিনা আমাদের আড়াই দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ন্যাশনাল বটানিক্ গার্ডেনটি ।

বেলাল চৌধুরী
শর্টেস্ট এই অর্ডারটা সাপ্লাই করা একান্তই অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ওঠার আগে একটা সাদামাটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি একজন আমলা, কথাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী?

আবদুশ শাকুর
আমি ঠিক সঙ্গীতশিল্পী নই ।

বেলাল চৌধুরী
ইউনেস্কোর হেরিটেজ প্রোগ্রামে 'মেলডি দ্য ইনট্যান্জিবল সোল অফ মিউজিক'-শীর্ষক প্রজেক্টে পণ্ডিত ভি.বালসারার সঙ্গীতায়োজনে আপনার কণ্ঠে রেকর্ড করা বাংলা-হিন্দি-উর্দু-পূরবী-ব্রজবুলি এমনকি ফার্সি ভাষার 'ভ্যালু-অ্যাডেড রিপ্রোডাকশন অফ লং লস্ট মেলডিজ'-এর কিছু আমি আপনার বাসার রেকর্ডপ্লেয়ারেই শুনেছি। আমার প্রশ্ন হল এত সবের ভেতরে আপনার জীবনে গোলাপ এল কী করে ? এবং এমন প্রবলভাবে ?

আবদুশ শাকুর
আমিও যদি এমনি কাউকে প্রশ্ন করি : আপনি একজন যশস্বী কবি, বিখ্যাত সাংবাদিক, তার ওপর জনৈক শাঁসালো দাবাড়ুও বটেন। এত সবের ভেতরে আপনার জীবনে নারী এল কী করে ? এবং এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ? হুবহু তাঁর উত্তরটিই হবে আমার : যে রস, যে রহস্য, যে ভঙ্গিমা, যে মহিমা নিয়ে নারী আসে পুরুষের মনে হুবহু সেই অনির্বচনীয়

রূপ রস গন্ধ বর্ণের ভিয়েন নিয়েই গোলাপ এসেছে আমার জীবনে। আসলে বোধ হয় অপ্রতিরোধ্যা প্রেমাস্পদার মতোই জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে গোলাপ এসে বাসা বাঁধে বাগানবিলাসী মালাকরের মনের ভেতরে। আমার জীবন থেকে গোলাপ তো প্রায় চলেই যাচ্ছে সরকারি এই উদ্যানবাটিকা ছেড়ে বহুতলভবনের মহলবাসী হবার প্রাক্কালে। কিন্তু আমার গোলাপযুগের মালীগুলো গোলাপের এই আকালেও তাদের জীবিকার গরজে গোলাপই খুঁজে চলেছে। গোলাপের এই দুর্দিনে গোলাপ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা দুষ্কর জেনেও গোলাপচর্যা ছেড়ে তারা অন্য কোনো ফুলের চর্চায় আগ্রহী নয়।

বেলাল চৌধুরী

এ কি আভিজাত্যের জিদ ?

আবদুশ শাকুর

না। ভালোবাসার জ্বালা। এ কারণেই, এদের আমি মালী বলতে চাই না। মালী সাধারণত বারোয়ারি। তিনি সকল ফুলেরই পরিচারক, একমাত্র গোলাপফুলের নন। গোলাপ যিনি ফোটান, তাঁকে রোজারিয়ান বলুন, আপত্তি নেই। যেহেতু বিদেশি শব্দ এভাবেই আসে এবং স্বদেশী শব্দসম্ভারও এভাবেই বাড়ে। গোলাপলালক বলুন, আমার সুরে লাগবে। কিন্তু গোলাপপালক বলবেন, তো আমি অসুখী বোধ করব। উদ্যানের রচয়িতা না হয়ে 'পালক' হওয়া আর নারীর মিতা না হয়ে 'পতি' হওয়া একই কথা। ওটা অধিপতি-মানসিকতা।

বেলাল চৌধুরী

মনে হচ্ছে গোলাপসুন্দরী কথায় কথায় মামার মনে কেবল নারীর চিত্রকল্প-রূপকল্পই জোগায়।

আবদুশ শাকুর

কী করব মামা, শাকুর তো আর ঠাকুর নয় যাঁর নারীপ্রেম-ঈশ্বরপ্রেম-প্রকৃতিপ্রেম সবই একাকার। কবিকে এসব বলা ক্লিশে। তবু বলব গোলাপ চিরায়ত প্রেমিকের শাশ্বত প্রেমাস্পদা। গোলাপসুন্দরী কি চিরন্তনী নায়িকা-লক্ষণা নয় ? নায়িকার চিত্রকল্প বরং রূপকল্পটি একবার স্মরণ করুন। তাঁর তাবৎ লীলা, মহিমা, সংবেদিতা, বিচিত্রমর্মিতা, নিত্যনবতা, রঙ্গপ্রিয়তা, রহস্যপ্রবণতা, নাজুকতা, লাজুকতা, বর্ণাঢ্যতা, আদিখ্যেতা সবই এই গোলাপেতেও লভ্য। এমনকি নায়িকার চতুর ছলনা, মধুর যাতনা। কী আর বলব, পরজীবিতা পর্যন্ত গোলাপের সুরভির ছলনা, কণ্টকের যাতনা এবং পরশাখী জীবনধারণার সঙ্গে তুল্য। এ-অধ্যায়ে আমার উপসংহারটা আশা করি কবিও মানবেন

যে এতসব নারীসুলভ রূপগুণ একই অঙ্গে ধারণ করেও গোলাপ কিন্তু নারীর চেয়ে ঢের নিরাপদ ।

বেলাল চৌধুরী

তার মানে গোলাপ আপনার প্রিয় নায়িকা এবং নিরাপদ পরকীয়াও ।

আবদুশ শাকুর

না মামা, শুধু তা নয় । গোলাপের সঙ্গে আমার সম্পর্কের একান্ত ব্যক্তিগত একটি দিকও আছে । পরিপার্শ্বের অন্তঃসারশূন্য তৎপরতার ক্লান্তিকর হল্লা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের ভিতরে বসবাস করি বলে আপন ভুবনটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উপকরণ হিসেবে গোলাপকেই আমার আদর্শ মনে হয়েছে ।

বেলাল চৌধুরী

একটা মোটা দাগের প্রশ্নকে পেছনে ঠেলে এসেছি এতক্ষণ ।

আবদুশ শাকুর

কেন ? প্রশ্ন মাত্রই বধ্য । মোটা প্রশ্নটিকেও বধ করে ফেলুন ।

বেলাল চৌধুরী

এতমুখী ব্যস্ততার মধ্যে গোলাপের মতো একটি নাজুক ফুলে এমন প্রয়োগমুখী সাফল্য আপনার অর্জন হল কোন্ ম্যাজিকে ?

আবদুশ শাকুর

কোনো ম্যাজিকে নয়, স্রেফ বাতিকে আর জিদে । আপনার তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানার কথা যে বাতিক হল সেই রোগ, যে-রোগ নিজের সমাজ থেকে আপনাকে খারিজ করে নেয় । কারো স্বাভাবিক কাজকর্ম বাতিল করে তাকে দিয়ে জড়িয়ে-পড়া বিষয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়িয়ে নেয় । কাউকে দিয়ে রাতের তিনটা পর্যন্ত লেখার কাজের মতো মাঠের কাজও করিয়ে নেয় । এক্সটেন্ডেড প্লাগরোল আর নাইটশিফটের শ্রমিকের সহায়তায় । এঁদের সকলের নিয়তিই হয়ে গিয়েছিল আমার একের নিয়তি ।

বেলাল চৌধুরী

তা এটা তো ঠিকই যে অ্যাচিভমেন্টকে বাতিকের জেরও ধরা যায় । কিন্তু জিদের ব্যাপারটা কী?

আবদুশ শাকুর

জিদটা ছিল বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত জ্ঞানের বিরুদ্ধে যে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে এগোতে পারবেন না। চারাগুলো ফেরৎ দিন। এ বছর বেড বানান। আগামী বছর বাগান করুন। আমি বলি, অর্থশাস্ত্রে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অন্যতম অনুমোদিত থিওরি। তাঁরা বলেন, গোলাপশাস্ত্রে ওসব অচল। জানতে চাই যে এ শাস্ত্রে ব্যতিক্রম কি একেবারেই সম্ভব নয় ? সর্বসম্মত জবাব : না, যেহেতু ফুলটির নাম গোলাপ। তাই আমি এখন বলতে পারি যে হেভিওয়েট বিশেষজ্ঞের ওপরও অন্ধবিশ্বাসী না হয়ে নিজের বিচারবুদ্ধি এবং কর্মশক্তির ওপরই বিশ্বাসটা বেশি রাখা ভালো।

বেলাল চৌধুরী

এ তো জেনারেল কথা। ওঁরা যে স্পেশাল কথা বললেন? গোলাপ ব্যতিক্রমধর্মী।

আবদুশ শাকুর

স্পেশালিস্টমহল তো কোনো বিষয়েই একমত হতে পারেন না। গোলাপচর্চার পরম প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে আত্মবিশ্বাসের এই চূড়ান্ত স্থানটি নির্দেশ করেছেন সন্ন্যাসীপ্রায় নিরাবেগ গোলাপশাস্ত্রী লেনার্ড হলিস যাঁর গোলাপবিষয়ক কেতাবে গোলাপের একটি ছবি পর্যন্ত নেই। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই স্বয়ম্ভরতা বাংলাদেশের মতো অর্ধসিদ্ধ-অর্ধশিক্ষিত অধ্যুষিত একটি শাস্ত্রীবিরল দেশে একেবারেই বিকল্পবিহীন। আমার নিজের গোলাপমূর্খতাকে মাপকাঠি ধরেই বলছি : এদেশে এখনো সত্যিকার অর্থে কোনো গোলাপপণ্ডিতের দেখা পাইনি। প্রমাণ পাইনি সত্যিকার গোলাপচর্চারও। যে-গোলাপতরঙ্গ দশককাল রাজধানীকে ঘিরে অনুভূত হয়েছে, সে হচ্ছে মোটের ওপর ফ্যাশনের। ঘৃণ্য ফ্যাশনের বরেণ্য কালচারে উত্তীর্ণ হওয়া সময়সাপেক্ষও বটে।

বেলাল চৌধুরী

ফ্যাশন আর কালচারের সুবিদিত পার্থক্যটা গোলাপের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় কী ভাবে ?

আবদুশ শাকুর

উদাহরণই দিচ্ছি। জনৈকা অত্যাধুনিকা মহিলা আমার বাগানে এসেই দেখতে চাইলেন অত্যাধুনিক একটি মিনিয়েচার গোলাপ 'মার্গো কস্টার'। ওটা তখন লন্‌গার্ডেনে ছিল না বিধায় কষ্ট কবুল করে ছাদে উঠে মিনিয়েচারটা তাঁকে পট্‌গার্ডেনে দেখালাম। দেখে তিনি সুখোচ্ছ্বাসও প্রকাশ করলেন। মানে, বোঝালেন যে এই লেটেস্ট অ্যারাইভ্যালটি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল আছেন। এবার অত্যাধুনিকা ভূমিতলে নেমে এসে দুঃখ

প্রকাশ করলেন যে আমার বাগানে 'বস্‌রাই'-র মতো বিখ্যাত একটি 'আধুনিক গোলাপ' দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম যে আধুনিক গোলাপের এই বাগানটিকে ভেজালমুক্ত রাখার জন্যই অনাধুনিক ওই পুরাতন বাগানগোলাপটিকে আমি ছাদের কোণে নিঃসঙ্গ করে রেখেছি। রেখেছিও শুধু মনমাতানো গন্ধ সেবনের জন্য। এই মহিলা এ শহরে গোলাপের সদ্যাগত ফ্যাশনটির শিকারমাত্র। অর্থাৎ জনৈকা ট্রেন্ডি লেডি হিসেবে লেটেস্ট ফ্যাশনস্বরূপ গোলাপবিষয়েও হালফিল থাকার স্বর্গীয় দায়িত্বটি বর্তেছে তাঁর সম্পন্ন স্কন্ধে। প্রতিপক্ষে, জনৈক ভদ্রলোক হাসপাতালে রোগশয্যাগত তাঁর বিষণ্ন বন্ধুটির জন্য উপযোগী একটি সাদাগোলাপ চাইলে, আমি তাঁকে হাতের কাছের 'ভার্গো'টি দেখালাম অন্যমনে। তিনি বললেন আমি চাচ্ছিলাম শুভ্র সৌন্দর্যের প্রতীক হ্যান্ডসাম অ্যান্ড হোলসাম 'জন.এফ.কেনেডি' গোলাপটি। আমার মনে হয় ওটিই আমার বন্ধুকে প্রসন্ন করে তুলবে হয়তো সুস্থও, যেমন আমাকে করে তোলে। অতঃপর ছাদে উঠে পটগার্ডেনে সঠিক বয়সী একটি জন.এফ.কেনেডি পেয়ে গিয়ে আমরা দুজনেই সমানে বর্তে গেলাম। কারণ ওটা আমারও প্রিয়তম শুভ্রগোলাপ। এবার আপেক্ষিক মন্তব্যটা আপনিই করুন।

বেলাল চৌধুরী

ওটাও আপনিই করুন।

আবদুশ শাকুর

ওই মননহীনা মহিলা পাগলিনীর মতো গোলাপ-ফ্যাশনের আঠালো কাদামাটিতে অধীরে কেবল গড়াগড়ি খাচ্ছেন। যেহেতু তাঁর কেবলি ভয় হয় চলতি ফ্যাশনের এই দায়সারা পলেস্তারাটি না জানি খসেই পড়ে। আর এই মননশীল ভদ্রলোক গোলাপ কালচারের নির্মল আকাশে সুধীরে বিচরণ করছেন কেননা তাঁর কিছুই খসে পড়ার ভয় নেই। যেহেতু সুকর্ষণহেতু গোলাপ তাঁর মনের জমিনেই প্রস্ফুটিত বলে গোলাপ-সংস্কৃতি তাঁর আত্মারই আত্মীয়।

বেলাল চৌধুরী

যাবার আগে অলস কৌতূহলবশতই জেনে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার চোখে সুন্দরতম গোলাপ কোন্‌টি?

আবদুশ শাকুর

এ কি বিব্রতকর প্রশ্ন। আচ্ছা আপনি নিজেও কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন মামা এ জগতের মনোহারী নারীমহলে আপনার চোখে সুন্দরতম ললনা সত্যি কেবল একজনা ? সুতরাং উত্তরটি আমি কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নিয়েই দিতে

পারি। ধরুন রঙের জন্যে, বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি রোজব্রিডার মেইয়ঁ-ঘরানার সৃষ্টি 'লেডি-এক্স' : ধূমল বেগনি রঙের সুষম সুন্দর সুঠাম গঠনের হাইব্রিড-টী গোলাপটি।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে আর কোন্ কোন্ বিবেচনায় ওই লেডি সুন্দরতমা নন ?

আবদুশ শাকুর

প্রথমত অবয়বই তো নয় রমণীসুলভ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তিনি বিরাট বিশাল। দ্বিতীয়ত, তিনি ললিতা নন– পুরুষসুলভ রোমশ, মানে কণ্টকময় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তৃতীয়ত, এ কেমন রমণী, যিনি সুরভিহীনা কিংবা সুরভিদীনা? অথচ একই রঙের আসরে রয়েছেন আরেকজন– অঙ্গ যাঁর রমণীসুলভ মসৃণ, মানে কণ্টকবিহীন। আবার ঘ্রাণও তাঁর প্রাণ কাড়ে দারুণ। তবে পুষ্পটি গঠনসৌকর্যে দুঃস্থ। অথচ এই 'ব্লু-মুন' কোনো লেডিই নন যেখানে গোলাপের অঙ্গনে লেডির, বলতে গেলে, ছড়াছড়ি। লেডি এলগিন, লেডি কার্জন, লেডি সিটন, লেডি সোনিয়া, লেডি সিলভিয়া, লেডি হিলিংডন থেকে লেডি ওয়াটারলো পর্যন্ত, এমনকি একেবারে খাস করে 'মাই লেডি' বলেও অভিহিত হয়েছেন একজন। কি জানেন মামা, বঙ্গীয় রমণীকুলের বর্ণের সগোত্র বলেই হয়তো, লেডি-এক্স গোলাপটির রঙ আমার এতই প্রিয় যে সময় সময় স্বপ্ন দেখি মোক্ষম সঙ্করণটির সুবাদে ব্লু-মুনের ফুলটি বাদে বাকি গুণগুলো সব ওই রমণীটিতে বর্তিয়ে দিয়ে আমি তাঁর রূপান্তরণ ঘটিয়ে ফেলেছি আমার সুন্দরতম গোলাপটিতে এবং তাতে অজানিতের প্রতীক ওই এক্স-টি নিয়ে পুষ্পটি হয়ে উঠেছে তিলোত্তমা নায়িকাবিশেষ : আমার চির অচেনা নাম-না-জানা বেগনি বঙ্গীয়া লেডি-এক্স।

বেলাল চৌধুরী

আপনি বঙ্গীয়া বলাতেই আমার মনে পড়ল : বেঙ্গলরোজ-নামে একটা গোলাপের কথা শুনতে পাই। ওই নামকরণটা হল কীভাবে ?

আবদুশ শাকুর

সেটা হয়েছে বঙ্গদেশ ওরফে বেঙ্গলের নামানুসারে। এদেশের স্থানীয় গোলাপের সেই প্রজাতিটি ছিল ভূমণ্ডলের সবচেয়ে উষ্ণমণ্ডলীয় এবং ছিল বিশেষত ইস্ট বেঙ্গলের নিম্ন জলাভূমি ও নদীনালার ধারে। এমনকি কেবল 'গোলাপ ফল' মানে গোলাপের গোটা কিংবা হিপ্‌স (প্রজন্ম পরম্পরা রক্ষা করার প্রাকৃতিক তাগিদে) পানির ওপরে তুলে রেখে নিজে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও বাঁচত, ঋজু বলিষ্ঠ অর্ধ-লতানে এই গুল্মগোলাপটি, যেখানে আধুনিক গোলাপ জলবন্দী শিকড় নিয়ে দু'দিনও বাঁচে না। গোলাপের স্বাভাবিক আবাস উত্তর গোলার্ধের টেম্পারেট জোন অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। উষ্ণমণ্ডলীয় জোলো-

প্রতিবেশ-সহনশীলতার বিচারে একক এই ওয়াইল্ড রোজটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল গোলাপবিশারদগণের। তাঁরা উষ্ণমণ্ডলীয় পরিবেশ-সহ আধুনিক গোলাপের জুৎসই ভ্যারাইটি প্রজনন-প্রয়াসের উৎক্ষেপণমঞ্চই ভেবেছিলেন এই প্রজাতিটিকে। বিখ্যাত গোলাপবিশারদ ই. এফ. অ্যালেন একটা প্রোগ্রামও হাতে নেন ১৯৭৭ সালে। কিন্তু পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্যের অভাবে ট্রপিক্যাল এই indigenous species টির বদলে introduced species কিংবা আগন্তুক প্রজাতি নিয়েই কাজ করে যেতে হল গোলাপগবেষকদের।

বেলাল চৌধুরী

বেঙ্গল-রোজ নাকি জংলি গোলাপ ?

আবদুশ শাকুর

রোজা ক্লিনোফিলা-নামক জংলি গোলাপটিকেও ভুল করে কেউ কেউ বেঙ্গলরোজ ভাবেন বলে শুনেছি। অথেনটিক 'বেঙ্গল রোজ'-নামক গোলাপটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গোলাপজগতের সবচেয়ে প্রামাণ্য আন্তর্জাতিক চেকলিস্ট 'দি অ্যামেরিকান রোজ সোসাইটি' কতৃক প্রকাশিত 'মডার্ন রোজ'-নামক গোলাপকোষটিতে। এ ছাড়াও মূলনাম হিসাবে বেঙ্গল-নামের গোলাপ আছে যেমন Bengal Ordinaire (অর্দিনের) বা Pallida (পালি- দা), Bengal Gramoisi (গ্রামোয়াযি) বা Sanguinea (স্যাঙ্গুইনেয়া)। তবে যে-গোলাপটি বহির্জগতে বেঙ্গলকে বেশি স্মরণ করায় সেটির নাম Bengali (বেঙ্গলি)। গোলাপটির প্যারেন্টেজ বা কুলপরিচয়ে লেখা আছে এর পিতা Dacapo (দাকাপো)-নামক গোলাপ আর মাতা একটি সিডলিং কিংবা বীজ। ১৯৬৬ সালে এটি সৃষ্টি করেছেন জার্মানির বিশ্ববিখ্যাত রোজ-ব্রিডার W. Kordes (ডব্লিও. কর্ডেস) যিনি আমার অন্যতম প্রিয়তম গোলাপ Kordes Perfecta-নামক হাইব্রিড-টী'র সংকরায়ক। 'বেঙ্গলি' গোলাপটিকে আমি দেখেওছি জার্মানির পাডেরবর্নে আমার ভাগ্নীর বাড়িতে, ১৯৭৯ সনে। ফুলটির পাপড়িতে অপূর্ব সুন্দর সোনালি পটে কমলার আভা। মাঝারি আকৃতির ফ্লোরিবান্ডা এ-গোলাপটির বাড়তি উপহার মন্দমধুর সুরভি। নার্সারিমেন এবং রোজ-এক্সপার্টগণ 'বেঙ্গলি'কে তখন পেশাদারি ভাষায় promising bedder বলতেন। পরের খবর আমি জানি না।

বেলাল চৌধুরী

উঠি মামা। দেখি গোলাপি দিনটির রাতে গোলাপি কিছু লিখতে পারি কিনা।

আবদুশ শাকুর

রোমের গোলাপশহীদদের স্মরণে একটা এপিটাফই রচিত হোক না বসন্তবিদায়ের এই স্মৃতিকাতর রাতটিতে। গোলাপি দিবসটির স্মৃতিস্বরূপ আপনাকে আমি আপনার নজর-কাড়া 'আরিয়ানা' গোলাপটিই দিতে চাই। আর দিতে চাই আমার প্রিয় একটি গোলাপ 'কিং'স্ র‍্যান্সম'। গোলাপ দুটি বাগান থেকে আপনি নিজের হাতে কেটে নিলে আনন্দটা পুরোপুরি পাবেন আমি সেকেটার দিচ্ছি।

বেলাল চৌধুরী

কিন্তু মামা কাঁটার ঘা খাব না তো ! গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে?/ ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে ॥

আবদুশ শাকুর

বস্তুত গোলাপের কাঁটার ঘা কেবল বেকুবেই খায়। মধুপে তো নয়ই, হুঁশের কোনো মানুষেও নয়।

বেলাল চৌধুরী

আমিও কতখানি হুঁশের কে জানে, বেকুব যদি না-ও হই।

আবদুশ শাকুর

তাহলে আমার বাক্য-দুটির নেপথ্য কাণ্ড-দুটিও বলতেই হচ্ছে বেকুবের আর বেহুঁশের। প্রথমে স্মরণ করি বেকুবটিকে। রমণীটি রূপসীও ছিলেন খুবই। বনানীর এক সম্পন্ন গৃহবধূ। প্রায়ই আসতেন। ঘটনাটার পর আর আসেননি।

বেলাল চৌধুরী

তাহলে তো দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

আবদুশ শাকুর

হাঁ। ভারি অ্যামব্যারাসিং ছিল ব্যাপারটা। সিনথেটিক মিশ্রিত সিল্কের পাতলা পতপতে এক পিচ্ছিল শাড়ি পরে এসেছিলেন সেদিন। পতাকার মতো উড়ন্ত আঁচলটি ছিল অনবরত পড়ন্ত। ও দৃশ্যটি দেখেই আমি প্রমাদ গুণেছিলাম।

বেলাল চৌধুরী

কেন ? ওটা তো অনেক আধুনিকার রেওয়াজি ক্রিয়া। বলতে পারেন পারফর্মিং আর্ট।

আবদুশ শাকুর

সে-আর্ট তো আমিও উপভোগ করি। কিন্তু শিল্পটি প্রদর্শনের মঞ্চ গোলাপবাগান নয়। অথচ বাগানেই ঢুকে যাচ্ছিলেন তিনি হনহন করে। ভদ্র মুদ্রায় বিরত রাখতে চাইলাম। বিরক্ত হয়ে বললেন : আমি কি নতুন ঢুকছি আপনার বাগানে ? বললাম : ঢুকেছেন সালোয়ার-কামিজ পরে, আজ যে শাড়ি পরে। রেগে গিয়ে বললেন : শাড়ি পরে কি কেউ বটানিক্যাল-রাইফেলসের গোলাপবাগানে যায় না ? বললাম : ওগুলো তো অনেক স্পেশাস বাগান। আসলে কনজেস্টেড গোলাপবাগানে শাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি পরে ঢোকা নিষিদ্ধ বলে জনৈক বিশেষজ্ঞ তাঁর কেতাবে লিখেই দিয়েছেন। ক্ষেপে গিয়ে বললেন : আপনিও আপনার বাগানে লিখেই দিতেন ? বললাম : কেতাবে লেখা এক কথা, বাগানে লেখা আরেক। তাছাড়া বাগানে তো বলা-ই যায়। বললেন : আমি ঘুরে ঘুরে বারবার না-দেখে গোলাপ নির্বাচন করতে পারব না। আজকের অকেশানটি ভেরি স্পেশাল। ওই যে শেষ সারির ওই গোলাপটা কী ? বললাম : ওটার নাম ডোরা। ফ্যান্টাস্টিক! উপলক্ষটি তো ওরই। বলেই ছুটে চললেন গোলাপবিলাসিনী গোলাপটির দিকে। ব্যাস। ঘটে গেল সর্বনাশ।

বেলাল চৌধুরী

কী সর্বনাশ!

আবদুশ শাকুর

বান্ধবীরা প্রায় তাঁকে বিবস্ত্রই করে ফেলল।

বেলাল চৌধুরী

মামা আপনার গল্প কেবল হাত-পা ছড়াতেই থাকে?

আবদুশ শাকুর

গল্প নয় মামা, সত্য। প্রথমে 'মারিয়া ক্যালাসে'র কাঁটায় আটকে গেল তাঁর আঁচল। ওটা ছাড়াতে ঘুরে দাঁড়াতেই আরেক পাশের শাড়িতে বিঁধে গেল 'এভেঞ্জেলিন ব্রুসে'র কাঁটা, তাঁর অজান্তে। প্রথম কাঁটাটা ছাড়িয়ে ফিরতেই বিঁধল সে-গাছেরই দ্বিতীয় কাঁটা, তাও তাঁর অজান্তেই। নিজেকে ফ্রি ভেবে এগিয়ে যেতেই 'লেডি এলগিনে'র কণ্টকে ওতপ্রোত মহিলার টরসো-ই হয়ে গেল শাড়ি-ফ্রি।

বেলাল চৌধুরী

মানে ?

আবদুশ শাকুর

মানে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণের ধরন আর কি। এখানে সুভদ্রার শুধু দেহকাণ্ডের বস্ত্রহরণ। স্কন্ধ থেকে নিতম্ব পর্যন্ত নগ্ন মহিলাকে মরিয়া-হওয়া থেকে বিরত রাখতে না-পারলে এর পর তো বেচারির পুরো শাড়িটাই গাছে গাছে মেলে যাবে। অতএব বিরক্তি ভুলে শাসনের সুরে বললাম : যত নড়বেন, তত ফাঁসবেন। একদম স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন আমি ছাড়িয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত। তার পরও হাঁটবেন আমার সামনে সামনে এবং পুতুলটি হয়ে।

বেলাল চৌধুরী

আমার কাছেও প্রমাদটা এখন প্রাঞ্জল। আসলেও আপনার বাগানটা কিন্তু ঘনসন্নিবদ্ধই। তবে ঘিঞ্জি বলা যাবে না কেবল পরিকল্পনা আর নকশার মুন্সিয়ানার গুণে।

আবদুশ শাকুর

কী করব মামা। বাগান সসীম, ভ্যারাইটি অসীম।

বেলাল চৌধুরী

সাধ আর সাধ্যকে মেলানোর সেই শাশ্বত সমস্যা আর কি। এবার বেহুঁশের কেচ্ছাটা বলুন। শুনে যাই।

আবদুশ শাকুর

বেহুঁশটা আমি নিজে। বাগানে কাজ করতে করতে পাজামার পা ফেঁসে যাওয়া, পাঞ্জাবির হাতা আটকে যাওয়া, কোণা ছিঁড়ে যাওয়া, পকেট ছাড়াতে হাতে কাঁটা খাওয়া ইত্যাদি দেখে এক পর্যায়ে আমার সাহিত্যসচিব তথা কনিষ্ঠ পুত্র গোলাপসচিবের চাকরিটিও চাইল। দিলাম। তদ্দণ্ডেই জয়েন করে বলল : জিন্স কিনুন। বললাম : ভালোই বলেছ। আমি কর্মীর উর্দি বানালাম চুড়িদার পাজামা আর বোতামদার হাতার পাঞ্জাবি। ওসব দেখে গোলাপসচিব পাজামাটি অনুমোদন করে ফতোয়া দিল : পাঞ্জাবির বদলে হবে ফতোয়া। তার পর থেকে এসবই হয়ে গেল আমার গার্ডেনিং আউটফিট। চুড়িদার পাজামা, কাফদার পাঞ্জাবি আর তসরের ফতোয়া।

বেলাল চৌধুরী

তবে গোলাপের কাঁটা কিন্তু মারাত্মক মামা।

আবদুশ শাকুর

মারাত্মক হলেও মেকি। কারণ, শাখায় থাকলেও ওটা শাখাকণ্টক নয়, পত্রকণ্টকমাত্র অর্থাৎ থর্ন নয়, স্পাইন্। পত্রকণ্টকের অপসারণে কাণ্ডের ত্বকছেদনেরও প্রয়োজন পড়ে না। কেননা, উপরিগত উপবৃদ্ধি হিসেবে ওটি এতই সুবিচ্ছেদ্য যে সামান্য পার্শ্বচাপেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু নিখাদ বিয়োগচিহ্নটুকু, কোনো ক্ষতচিহ্নও নয়। এভাবে কাট্ ফ্লাওয়ারের তালিকায় সমগ্র জগতের এক নম্বর হবার পথের এই ভৌত কণ্টকটুকুও সহজেই দূরীভূত হয়ে যায় গোলাপের। প্রতিপক্ষে কাঁটার বাহারি অবদানটির বহর মাপা যায় গোলাপবেত্তাদের সময়-বিশেষে উচ্চারিত 'সকণ্টক সপ্রাণতা'-জাতীয় কণ্টকপ্রশস্তি দ্বারা। শাখা-কাঁটা-পাতা আর গঠন-বরণ-ধরনের সুসংগত ডবল তেহাইয়ে একটা বিরাট বৈসাদৃশ্য যে কী অপরূপ এক সুষম সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে তা বোঝা যাবে পুষ্পবতী একটা 'কিং'স র‍্যানসম্' গোলাপগুল্মের পাশে দাঁড়িয়ে ডালের দিকে তাকালে। আমার তো মহৎ কবি গালিবের দশাই দাঁড়ায়। বোহ্ আয়েঁ ঘর-মেঁ হমারে, খুদা কি কুদরৎ হ্যয় / কভী হম উন্-কো কভী অপনে ঘর-কো দেখতে হ্যেঁ /। মানে অভিভবের ঘোরে কভী হম গুল্-কো, কভী উসকে কাঁটে-কো দেখতে হ্যেঁ।

বেলাল চৌধুরী

এমন মহান একটা গোলাপের নামটা কি তেমন মানানসই হল ? কিং'স র‍্যান্সম ?

আবদুশ শাকুর

না। নামটা একটু ReoRs বইকি। মহার্ঘ-অর্থে 'ওয়ার্থ আ কিং'স র‍্যানসম' প্রবচনটি থেকে নেওয়া। অবশ্য মহার্ঘ-অর্থেও 'প্রেশাস' নামটা নিশ্চয় উচ্চতর মানের হত, ১৯৬১ সালে জন্মানো এ গোলাপটার। 'প্রেশাস প্লাটিনাম'-নামক গোলাপটির জন্ম তো কিং'স র‍্যান্সমের অনেক পরে, ১৯৭৪ সালে। আসলে এ-নামকরণে হলুদশ্রেষ্ঠ গোলাপটির ব্রিডারের অনিয়ন্ত্রিত আবেগের কিংবা অহমেরই প্রকাশ ঘটেছে। চলুন বাগানে। কাট্-ফ্লাওয়ার দুটি কাটুন।

বেলাল চৌধুরী

চলুন। কিন্তু আপনার বাগানেও মনে হচ্ছে গোলাপের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্তই। গোলাপপ্রেমে ভাটার টান আপনারও পড়েছে নাকি মামা ?

আবদুশ শাকুর

মরাকটালটা গোলাপপ্রেমের নয়, চাকরিরই। রিটায়ারমেন্ট কাছিয়ে এসেছে। এদিকে বাগানের মাটি হয়ে পড়েছে রোজারিয়ানরা যাকে বলে রোজ-সিক্।

বেলাল চৌধুরী

রোজ-সিক ? ওটা তো হয়ে থাকি আমরা। গোলাপের প্রেমে কাতর। মাটি হতে পারে গোলাপি আতর ধরনের কিছু, গোলাপের সুরভির সান্নিধ্যহেতু। কার-না একটা কবিতা পড়েছিলাম।

আবদুশ শাকুর

শেখ সাদীর। 'গুলিস্তানে'র অন্যতম গদ্য গল্পের অন্তে যোজিত অনন্য একটা পদ্য পাদটীকা : গিলে খুস্‌বুয়ে দার হাম্মাম রোজে / রাসিদ আয দাস্তে মাহবুবে বদাস্তাম / বদো গুফতাম কে মিশকি য়া আবীরী / '

বেলাল চৌধুরী

এসব তো আমার কাছে গালাগালি মামা–

আবদুশ শাকুর

না মামা, অত খারাপ না। যোবানে ফার্সি খায়লে দোশওয়ার আস্ত্, ওয়া লে শিরীন আস্ত্। ফার্সি ভাষাটি বেশ কঠিন হলেও ভারী মিষ্টি। সাদী বলছেন : বন্ধুর হাত থেকে একদিন এক টুকরো সুগন্ধ মাটি আমার হাতে এলে আমি তাকে শুধালাম : তুমি কি সুগন্ধ মিশ্‌ক ? না কি আম্বর ? জবাবে সে বলল : আমি সামান্য মৃত্তিকামাত্র। তবে আমার ওপরে সুগন্ধ একটি ফুল ঝরে পড়েছিল বলে তারই সাময়িক সান্নিধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সুরভিত।

বেলাল চৌধুরী

আমার কথাও তো তাই। ঝরা-গোলাপের কিংবা ঝরা-পাপড়ির সান্নিধ্যে গোলাপবাগানের মাটি রোজ-সেন্টেড হতে পারে, রোজ-সিক হবে কেন।

আবদুশ শাকুর

মাটি রোগাতুর হয় গোলাপের শোষণে। খাদনে গোলাপসুন্দরী সাক্ষাত রাক্ষসী। মানবসুন্দরীও তাই কি না জানি না। তবে আমার দুই নায়িকা সুচিত্রা কি মধুবালা সাংঘাতিক খাদিকা ভাবতেই ভারি অসুন্দর লাগে আমার। লাগলেও এটা পরীক্ষিত সত্য যে রোজ-বেড কয়েকটি মৌসুমের বেশি এত সুন্দরীর সান্নিধ্য সইতে পারে না। দশ বছরের মধ্যেই বেডের মাটি সম্পূর্ণ বদলিয়ে না দিলে কোয়ালিটি গোলাপ পাওয়া যায় না। আবার কোয়ালিটি ভিটিমাটি এত দূর থেকে আনতে হয় যে ক্যারিং-কস্ট

কবুল করা বড়ই কষ্টকর। তাছাড়া মাটি বদলিয়েই আমি অবসরে চলে যাব। পরের সচিবসাহেব এসেই সেই মাটিতে গোলালু ফলাবেন। তা-ও বা আমার কেমন লাগবে।

বেলাল চৌধুরী

তাই বুঝি চলতি সিজনে বাগান আর করতেই চাইছিলেন না। আমাদের অফিসের একজন একদিন গিয়ে বলল যে গোলাপগাছ সব আপনি নিজ হাতে একেবারে গোড়া থেকেই কেটে ফেলছিলেন?'

আবদুশ শাকুর

ও, ওটা ছিল চলতি মৌসুমের প্রুনিং। বাৎসরিক গোলাপছাঁটাই।

বেলাল চৌধুরী

গোলাপেও ছাঁটাই ? ওটা তো অফিস-আদালতেও হয় না, হয় কেবল কারখানাতেই।

আবদুশ শাকুর

সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে ছাঁটাইয়ের ওপরেই নির্ভর করে শ্রেষ্ঠতম মানের গোলাপ পাওয়া। বস্তুত প্রুনিং দিয়েই গোলাপবর্ষ শুরু হয় অক্টোবর মাসে। বলা যায় ইসলামিক ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস মহররম যেমন শোকের মাস, রোজ-ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস অক্টোবরও তেমনি শোকের মাস। মাসটির প্রথম ভাগেই, মানে বর্ষা শেষ হলেই, গোলাপগুল্মের পুরাতন ডালগুলো একেবারে গোড়ার গিঁট ঘেঁষে কেটে ফেলে দিতে হয় একরকম নির্মমভাবেই। যাতে গাছগুলোর মজবুত নতুন শাখাগুলো ডিসেম্বর-জানুয়ারির দিকে বেস্ট কোয়ালিটি ফুল দিতে পারে। অথচ মানববাগানে দেখুন, আমার মতো হদ্দ পুরাতনরাও টাইম্‌লি প্রুনিঙের শিকার হই না বলে জীবনের গুণগত মান হারিয়েও বেহুদা বেঁচে থাকি সমাজের তথা জাতির বোঝাটি হয়ে।

বেলাল চৌধুরী

হক কথা মামা। আমরাও সময়মতো ছাঁটাই হয়ে গেলেই ভালো হত।

আবদুশ শাকুর

হত না? সন্তানসন্ততি পর্যন্ত ভারমুক্ত হত, বিপদমুক্ত হত। আমাকে এক পাণ্ডা বলেছে হাওড়ার বটানিক্যাল গার্ডেনের আড়াই শ বছরের পুরাতন বটবৃক্ষটির জরাব্যাধিগ্রস্ত মূলকাণ্ডটি ১৯২৫ সালেই ছাঁটাই করে ফেলা হয়েছিল। সেজন্যেই তার প্রায় হাজার তিনেক ঝুরি তাদের কারো প্রবৃদ্ধ পিতার, কারো পিতামহের, কারো প্রপিতামহের বার্ধক্যজনিত রোগজীবাণু থেকে মুক্ত থেকে সুস্থ জীবন যাপন করে যাচ্ছে আজও।

বেলাল চৌধুরী
ভালো। তবে ছাঁটাই হওয়ার মতো রোগব্যাধি থেকে আপনি এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত আছেন। এমনি আরো অনেকদিন সুস্থ থাকুন মামা।

আবদুশ শাকুর
আপনিও ভালো থাকুন মামা।

*মামা-ভাগ্নে শব্দবন্ধটি এই অনিত্য জীবনে নিত্যরসের বলেই স্বতঃসিদ্ধ। তাই সম্পর্কটির শিকড় সন্ধানে সময় নষ্ট করিনি আমরা।

প্র তি ক্রি য়া

ভু ট্টো কা মা ল

.....

সাহিত্যাঙ্গনে অসুস্থ রাজনীতির হাওয়া

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সাম্প্রতিককালে একটা অসুস্থ রাজনীতির হাওয়া বইছে। এই রাজনীতি শুরু করেছে একটি পরিবার। তারা দুই ভাই, দুইজনই কবি হিসেবে আত্মবিকৃত, মৃত। দুইজনই ভারতীয় লেখকদের বাংলাদেশী এজেন্ট। যেহেতু তারা দুইজনই কবি হিসেবে ব্যর্থ তাই কবিতার জায়গাটাই তাদের দুষ্ট খেলার অন্যতম লক্ষ্যস্থল। তারা বাংলাদেশী কবিতায় স্বজনপ্রীতির ও যাদের তারা পছন্দ করেন না তাদের ব্যর্থ করে দেবার ভয়াবহ রাজনীতিতে মেতেছেন। তারা ক্রমাগত রক্তাক্ত করছেন আত্মোৎসর্গিত কবিদের। এক ভাই ইতোমধ্যে তার প্রমাণ রেখেছেন আরেক দেশের কবি রণজিৎ দাশের কাঁধে বন্দুক রেখে তাদের যৌথ সম্পাদনাকৃত 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামের সংকলনটির মাধ্যমে। এই একই জিনিসের অন্য

পিঠে আরেক ভাই কবিদের রক্তাক্ত করে চলেছেন বেকুব চঞ্চল আশরাফের কাঁধে বন্দুক রেখে। সেদিন হয়ত খুব বেশি দূরে নয় রক্তাক্ত আত্মাগুলোর আঘাতে এরা নিজেরাই রক্তাক্ত হওয়া শুরু করবেন। অবশ্য বদ মানুষের রক্ত নাকি শাদা হয়, টিকটিকির রক্তের সাথে এই রক্তের মিল রয়েছে। টিকটিকির মতোই নাকি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরও এই ধরনের মানুষের নাশ হয় না! নাশ হয় না মানে হুশ হয় না।

দুই টাকা মূল্যের দৈনিক পত্রিকা আমাদের সময়ের বিশ টাকা মূল্যের সাময়িকী 'নতুনধারা' ছয় নম্বর সংখ্যার পাতা উল্টাতেই একটা সম্পাদকীয় চোখে পড়ল 'সম্পাদক দায়ী নন'। এই শিরোনামের সমর্থনে বানোয়াট মনগড়া বিবৃতিটা পড়ে আশ্চর্য হইনি, বিস্মিত হইনি, শিহরণও জাগেনি কেননা ইতোমধ্যে আশ্চর্য, বিস্মিত ও শিহরিত হবার ক্ষমতা মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি। সাহিত্য নিয়ে এতরকম কারচুপি, কূটরাজনীতি আর ভণ্ডামি দেখেছি যে, মনে হয় অনুভূতিই ভোঁতা হয়ে গেছে। 'নতুনধারা' উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ না হবার পেছনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিবৃতিতে ঢালাওভাবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক লিটলম্যাগের লেখক ও নবীন লেখকদের উদ্দেশে যে বিষোদগার করেছেন তা তুলে ধরছি 'প্রতিমাসে একটা ভালো উপন্যাস, তিন চারটি ভালো গল্প, দশ বারটি কবিতা সত্যই লেখা হচ্ছে না'। পাঠক লক্ষ করুন এই বক্তব্যের পরিমাপটা কিন্তু 'নতুনধারা' পত্রিকার নিজস্ব একক। তারা তাদের পরিমাপ মতো লেখা পাচ্ছে না বলে লেখকদের উদ্দেশে বিষোদগার করছেন, যেন প্রতি মাসে ফরিদ কবিরকে প্রেরণ করার নিমিত্তে এই পরিমাণ ভালো লেখার দায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক, লিটলম্যাগের লেখক ও নবীন লেখকদের। তারা কী করে ভাবছে এরকম একটা ছা-পোষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উন্নাসিক, ভাঁড়ামোপূর্ণ ফ্যান্টাসি পত্রিকায় মৌলিক লেখকরা লেখা দেবে? তাদের স্পর্ধা স্তম্ভিত হবার মতো! আরেকটা উদ্ধৃতি 'অবশ্য শুদ্ধভাবে গদ্য লিখতে পারেন এমন লেখকের সংখ্যাও হাতে গোনা'। প্রথমত তারা সবার কাছে লেখা চাইছেন, লেখকরা লেখা দিচ্ছেন না বলে তাদের গালি দিচ্ছেন– তোরা লিখতে জানিস না, তোদের গদ্য হয় না ইত্যাদি বলে।

এখন দয়া করে বাংলাদেশী সাহিত্যের শুদ্ধভাষার কারিগর ফরিদ কবির ও তার সহযোগী ভাষার আলোকবর্তিকারা বলবেন, কী সেই পরিমাপক যা দিয়ে ভাষার শুদ্ধি পরিমাপ করা যায়? আপনাদের আবিষ্কৃত বা রচিত কোন কোন রচনায় বা ব্যাকরণে সেই শুদ্ধির দিকনির্দেশনা আছে যা বাংলাদেশের হাতে গোনা দু-এক জন বাদে আপামর প্রতিষ্ঠিত, লিটলম্যাগ ও নবীন লেখকরা পেতে পারেন! বাংলাদেশের পাঠকবৃন্দ দয়া করে হাসবেন না। ফরিদ কবির কখন কবিতা লিখেছিল আর সেগুলো কোথায় ছাপা হয়েছিল অথবা তার বই কোন যাদুঘরে পাওয়া যায়, মনে হয় সেটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। দয়া করে কেউ হদিস দিন– এই মহার্ঘ ভাষা শুদ্ধিময় লেখাগুলোর জন্য গোটা জাতি অপেক্ষারত। আর তার সহকারী, সলিমুল্লাহ খানের লেখা বিকৃতিকারী, সাধুচলিত দোষ থেকে শুরু করে ভাষা যতরকমের দোষে দুষ্ট হতে

পারে তার লেখার মধ্যে সবই পাওয়া যায়। অথচ এরকম আমিত্বসর্বস্ব প্রাণী নতুনধারার প্রায় প্রত্যেকটা সংখ্যায় তার লেখা, সবার উপরে তার লেখা ছাপানো, লিটলম্যাগের আলোচনা করা অথবা সে যাদের পছন্দ করে তাদের লেখায় ভরপুর, যদিও এই বয়সেও ইনি সম্পাদক-এর সহ...। এরকম কৃত্রিম, আরোপিত, জবরদস্তিমূলক বিরক্তিকর গদ্য বা পদ্যপদবাচ্য কে দেখেছে ইতোপূর্বে?

যে কজন শুদ্ধ গদ্য লিখিয়েদের জন্য তারা এ পত্রিকাটি বাজারজাত করছে যথাক্রমে তাদের নাম সলিমুল্লাহ খান, ব্রাত্য রাইসু ও চঞ্চল আশরাফ প্রভৃতি। ঘুরে ফিরে প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় এদের লেখা এসেছে। জীবনানন্দ দাশ তার এক কবিতায় বলেছেন 'এ শতাব্দীর লেখা, সংকলিত জিনিসের ভীড় শুধু'। জীবনানন্দ জিনিস শব্দটি এখানে আবর্জনা অর্থেই ব্যবহার করেছেন বোধ করি।

সলিমুল্লাহ খান মৌলিক লেখা না লিখে শুধু অমুক বলেছেন, তমুক বলেছেন বলে বাজার মাত করার তালে আছেন। মাঝে মাঝে তার লেখা দেখে মনে হয় তিনি কতটা বইয়ের নাম জানেন তা দেখানোই যেন লেখার উদ্দেশ্য। তার লেখা 'বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থার চালচিত্র' অনেকের মতেই অপাঠ্য বই। অথচ ওনার পড়া-শুনার ব্যাপ্তি যা ঠাহর করি তা মৌলিক লেখা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এই দরিদ্র দেশের খেয়ে-পড়ে এত জঞ্জালের মধ্যে আরও জঞ্জাল উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এবং সময় থাকতে সাধু ভাষা পরিহার করা উচিত। বরং ভাঁড়ামোর পরিবর্তে নতুন যুক্তি, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদি তার যদি থাকে সেই শক্তি প্রদর্শন করি উচিত। চিন্তা ও দর্শনের দৈন্যতা থেকেই মূলত ভাঁড়ামোর উৎপত্তি হয়। এটা মানুষের মধ্যে দেখা দেয় দ্রুত ও অতি বিখ্যাত হওয়ার প্রলোভন থেকে। হুমায়ুন আজাদ একজন বড় লেখক হওয়া সত্বেও তাঁকে এই রোগে ধরেছিল। এই সময়ে সাধু ভাষায় লেখা যে পশ্চাদপদতা, এটা শিশুও বোঝে! সলিমুল্লাহ খানের মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেও সাধু ভাষায় লেখার সমর্থন তিনি পাবেন না আশা করি।

ফরহাদ মজহারের লিখিত ভাষা যতই অগোছালো ও বিশৃংখল হোক না কেন তিনি আপামর জনসাধারণের পোশাকআশাক পড়ে সাধারণের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চাষবাস করছেন। অন্যদিকে জনবিচ্ছিন্ন সলিমুল্লাহ খানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সন্দেহজনক। তার ভাষাও গুরুচণ্ডালি দোষে দুষ্ট। উনিশ শতকি বাংলাভাষায় লিখে তিনি কী বোঝাতে চান খোদামালুম। উনিশ শতকের ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশে কেউ না কথা বলে, না কেউ লেখে। ভাষার কেন পরিবর্তন হয়– এটা না বুঝে ভাষা নিয়ে ভাসাভাসা চিন্তা করার ফল আর কী হতে পারে? বরং সবার থেকে আলাদা হওয়ার লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখে দেখতে পারেন!

"পোশাকটা বাউলের মনটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির", এমনই বাউলসুলভ লম্বা চুল রাইসু সাহিত্যের জন্য সম্পূর্ণ আত্মাহীন একজন ভুল মানুষ হলেও অদ্ভুতভাবে

সাহিত্যের রাজনীতি করে জীবনপাত করছেন। লেখালেখির রাজনীতিক রাইসুর রান্নাঘরের ভাষায় লেখা 'আকাশে কালিদাসের লগে মেগ দেখতাছি' নামের অপাঠ্য বইটি কোন দেশের পাঠকের জন্য লেখা? তার পরিবারের লোকজনও এই বইটি উল্টে দেখেছে কিনা সন্দেহ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সমালোচক যেন এক অভিশপ্ত বস্তু। তারা এমন বিষয় নিয়ে কথা বলে যা তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। তারা বোঝে না লেখক তাদের মতো করে লিখলে তিনি আর লেখক হতেন না, হতেন তাদের মতোই ভণিতাসর্বস্ব সমালোচক'। চঞ্চল আশরাফ নামের সরল বোকা মানুষটির কাণ্ডকারখানা দেখলে এই কথাগুলো মনে পড়ে। ফুকো তার 'পাগলামির ইতিহাস' বইতে লিখেছেন অসুস্থ মানুষ কখনো সুস্থ চিন্তা করতে পারে না। আশরাফ অসুস্থ না হলে কি নব্বইয়ের কবিতা আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে ফরিদ কবিরকে টানে! ফরিদ কবির আর সাজ্জাদ শরীফের দাবার গুটি আশরাফ! এরকম আমিত্বসর্বস্ব ও যে বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কথা বলছে তার চাইতে অপমানজনক আর কী হতে পারে কবিদের! দশক নিয়ে তার অশ্লীল লেখাগুলো পড়া যায় না। তার অপাঠ্য লেখাগুলোর সমর্থনে প্রতি-প্রতিক্রিয়াগুলো পড়লে বমি আসে। তার প্রতি-প্রতিক্রিয়ার নাম হয় 'রাজনীতি, কবিতা আর আমাদের অপরিণত সংস্কৃতি'। বস্তুত এই লাইনের নাম যদি হয় 'পারিবারিক রাজনীতি, অ-কবিতা ও অপরিণত আশরাফ' তাহলে তাকে বোঝা যেত। তার এই অশ্লীল লেখাগুলো একটি হাউস নিয়ন্ত্রিত সম্পূর্ণ রাজনীতি (সাহিত্যের) প্রভাবিত। তার চিন্তাধারা অপরিণত তো বটেই প্রাণী হিসেবেও তিনি সম্পূর্ণ গোলমেলে, তা তার এই লেখাটি থেকে বোঝা যায়। তার নিজের সমর্থনে বলা অর্থহীন বাগাড়ম্বরগুলোর বর্ণনা দিয়ে বিরক্তি উদ্রেক করতে চাই না। শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে বলতে চাই সেটা তপন বাগচীর সাথে তার কথা বলার ঢং। তপন বাগচী যে চতুর্থ শ্রেণীর সমালোচক ও একজন ব্যর্থ কবিতালিখিয়ে সেকথা মেনে নিলেও একজন মানুষ হিসাবে তার সাথে

আশরাফের ব্যবহার নিন্দনীয়। আশরাফের নামের সাথে তপন বাগচী নিজের নাম বসিয়ে 'আশরাফ ও আমি একই সময়ের কবি ও সমালোচক' বলাতে আশরাফ বলছেন 'আমি শরম পাইছি'। কত বালখিল্য, শিশুসুলভ এই বাক্য। কীরকম আমিত্বসম্পন্ন প্রাণী হলে আশরাফের মতো বাক্য তৈরি করা যায়! আশরাফ আরো বলছেন 'আমি মনে করি, তপন বাগচী যদি কবি ও সমালোচক হন, তাহলে আমি কোনোটিই নই'। কীরকম বৈষম্যরোগে আক্রান্ত, সামন্ত মানসিকতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই বিবৃতি! আশরাফ তপনকে বারবার সম্বোধন করছেন তপনবাবু বা বাগচীবাবু। আশরাফকে তার আশপাশের লোকজন চঞ্চলবাবু বা আশরাফবাবু বলে কিনা জানি না। তবে সার্বিকভাবে এদেশে মানুষ 'বাবু' শব্দটি সম্প্রদায়গত অভিধা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কলকাতার ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপারটা আলাদা। যেন মুসলমান হয়ে তিনি

আশরাফ আর তপন বাগচী হিন্দু বলেই আতরাফ! আশরাফ খুব তাচ্ছিল্য করে 'বাবু' দ্বারা তপনকে যে 'হিন্দু' বলে গালি দিচ্ছেন, একথা বিশ্লেষণ করে বোঝানোর দরকার হয় না। নিজের অজান্তেই তপন বাগচীকে লেখক হিসেবে আতরাফ জ্ঞান করা আশরাফ মনোজাগতিকভাবে পাঁড়-সাম্প্রদায়িক।

কবিতাজগতে সবার প্রশ্রয় পাওয়া আশরাফ কখনোই বুঝবে না যে কবিতা অনেক রকম। তিনি কবিতা বলতে রাজনীতি ও সমাজহীন, জনমানুষশূন্য কোনো কল্পনার দ্বীপে নগ্ন নারীর সামনে নতজানু হয়ে আবৃত্তি করার আঙ্গিকসর্বস্ব যে দুর্বোধ্য লাইনকে বোঝেন, তাই একমাত্র কবিতা নয়। কবিতা সম্পর্কিত তার পাঠ ও অভিজ্ঞতা পুরনো, চর্চিত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। কবিতা সম্পর্কে নিজের এই সব গোলমেলে ধারণা তিনি চাপাতে চাইছেন অন্যদের ওপর। কপটতার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত হন আশরাফ। সোজা বাংলায় একে আমরা ভণ্ডও বলি। আশরাফের দশকওয়ারি লেখাগুলো কি ভণ্ডামি নয়? একই কবি ও কবিতা সম্পর্কে তিনি এক-এক পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিপরীতধর্মী মন্তব্যও করেন।

নব্বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'অনেক কবির ভাষাবোধই নেই এবং তারা লিখেছেন খুব বেশি; প্রতি বছরই তাদের 'কাব্যগ্রন্থ' বেরিয়েছে এবং এখনও তাতে কোনো বিরাম দেখা যায় না। আবার নব্বইয়ের বৈচিত্র্য প্রমাণ করার জন্য তিনি যাদের হাজির করছেন এদেরই অনেকের বেলায় এই একই কথাটা খাটে। আবার তিনি এদেরকেই 'স্বতঃস্ফূর্ত ও চেষ্টাহীন সুশৃংখলা' উপাধি দিচ্ছেন। তার বিশেষণেও সমস্যা আছে 'চেষ্টাহীন সুশৃংখলা' বস্তু কী? তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান সরকার আমিন, মোস্তাক আহমাদ দীন, শামীম সিদ্দিকী, পাবলো শাহি, খলিল মজিদ, বদরে মুনীর, জহির হাসান, মাতিয়ার রাফায়েল, রওশন ঝুনু, আয়শা ঝর্ণা, অলকা নন্দিতা, রুখসানা আফরিনের মতো কবিদের নাম। যে মনোবেদনা থেকে সাজ্জাদ-রণজিৎ-এর সম্পাদিত সংকলনের বিরুদ্ধে চঞ্চল লিখেছিলেন, দশক ওয়ারি আলোচনা লিখতে গিয়ে চঞ্চল সাজ্জাদ-রণজিৎ-এর মতোই কান্ড ঘটালেন। এখন প্রমাণীত যে ওই সংকলনে চঞ্চলের কবিতা থাকলে সেটা নিয়ে স্বার্থ পর চঞ্চল একটি কথাও বলতো না। যেই ভাষায় সাজ্জাদকে সে বকাবকি করেছে তার কিছুটা সময় পার না হতেই প্রথম আলোতে চঞ্চলের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ জনিত শুষ্ক বীর্যের খটখটানি ধরনের লেখা ছাপা হলো।
হায়রে অভাগা জাতির রুগ্ন সন্তান কত মূর্খ হলে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অতি পুরনো ছেঁড়া ঢোল এই সময়ে দাঁড়িয়ে ড্যাব... ড্যাব... শব্দে বাজানোর অহেতুক চেষ্টা! স্থান পেলে কত দ্রুত মিলিয়ে যায় চঞ্চলদের রাগ। সাজ্জাদ এখানে সফল, সে দেখালো কত সস্তা চঞ্চলের ওই বিষোদগার। এদের রাগ-ঘৃনা যেমন মূহুর্তে শেষ হয় এদের ভালোবাসাও অতি সহজেই পন্যের নগ্নরূপ লাভ করে। আমরা জানি চঞ্চল টাকা ছাড়া কোথাও লেখে না, তবে ফরিদ-সাজ্জাদ কয় টাকায় কয় দিনের জন্য তাকে বুকিং দিয়েছে সেটা কারও

কৌতুহলের উদ্রেক করতেই পারে। কী করছে আর কী করবে হয়তো বুঝতেই পারছে না, বেচারা!

রাজনীতির ফেরে পড়ে আশরাফ পরিণত হন হাস্যকর ভাঁড়ে। এই রাজনীতিরই প্রতিফলন দেখা যায় 'নতুনধারা' ছয় নম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় 'সম্পাদক দায়ী নন' নামের ভাঁড়ামোপূর্ণ কুৎসায়। এরাই ফতোয়া ঝাড়ে গদ্য লিখতে পারে এরকম লোক নাকি এদেশে হাতে গোনা যায়। পাঠক লক্ষ করুন, কার গলায় কে গান গায়? যে অজুহাতে বাংলাদেশের বই কলকাতায় ঢুকতে দেয়া হয় না, ফরিদ আর সাজ্জাদের কথায়, কাজে ও ভাবভঙ্গীতে কি তারই প্রতিফলন পাওয়া যায় না? এটাকেই কি বলে না হীনমন্যতা অথবা আরেক দেশের এজেন্সি নেয়া? সম্পাদকদের কাজইতো লেখক অশুদ্ধ লিখলে তা শুদ্ধ করা। না হলে তাদের কাজ কি শুধু বসে বসে বিনা কর্মে বেতন গেলা? আগে চাকরির মানসিকতা বাদ দিয়ে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিন, নিজেদের শোধরান, তারপর লেখা পাবেন। নিজেদের আজেবাজে লেখা দিয়ে পত্রিকা ভরানো থেকে বিরত থাকুন। সম্পাদকদের এই লোভ ছাড়তে হবে। পত্রিকাকে নিজেদের কবি, লেখক হবার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করলে অনবরত এই ধরনের হতাশাপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখতে হবে। আসলে ফরিদ কবির আপনি কি জানেন এদেশে কোন লেখক কোন বিষয়ে কী লিখতে পারেন? আমার ধারণা সেটিই আপনি জানেন না। কোথাও আপনার লেখা বিশেষ কোনো গদ্য কারও চোখে পড়েনি, কারণ আপনি নিজেও গদ্য লেখেন না পারেন না বলেই। কাজেই আপনার মুখে কোন কথাটি মানায় সেটা আপনার বোঝা উচিৎ। দ্বিতীয় কথা হল আপনি বা আপনার সহকারী কি ফোন করে বা সরাসরি গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের কাছে লেখা চেয়েছেন? নিশ্চয়ই চাননি। অথচ নির্লজ্জভাবে বলে থাকেন "বাংলাভাষার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত লেখককে আমরা লেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।" ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে বসে থাকা ভিক্ষুক কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর ছা-পোষা বলেই আপনার মুখে মানায় "মাসান্তে যা পাচ্ছি"– লেখক হিসেবে যে ব্যর্থ তা তো অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন, এবার সম্পাদক হিসেবেও যে চতুর্থ শ্রেণীর সেটা প্রমাণ করেই ছাড়লেন।

তারা লেখে 'আসলেই ভালো হচ্ছে না নতুনধারা, ঠিক যেমনটি আমরা চাই'। এই বাক্যটি কি শুদ্ধ? এই বাক্যে তাদের লুকানো উদ্দেশ্যটা বেরিয়ে আসে যখন এ কথার মানে দাঁড়ায় 'আসলেই ভালো হচ্ছে না নতুনধারা, ঠিক এমনটিই আমরা চাই'। মানুষকে খোঁচা দিয়ে, রক্তাক্ত করে মানুষের সমর্থন বা ভালোবাসা পাওয়া যায় না। শিক্ষা নিন মহান সম্পাদক আহসান হাবিব কিংবা মীজানুর রহমান থেকে কিংবা সাগরময় ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু থেকে। সম্পাদক হল লেখকদের নির্ভরতা, লেখকদের নেতা।

এবার দুই ভাই একে অন্যের গলায় হাত দিয়ে ঘরের বড় আয়নাটার দিকে তাকান; দেখুন কত দিনের জমে-থাকা কী কুৎসিৎ নোংরামি ভেসে উঠছে দু'টি

চেহারায়। কবি বা সম্পাদক হতে না পারলেও ধন-সম্পদের মালিক তো ঠিকই হয়েছেন! নিশ্চয়ই ট্রান্সকম আর নাঈমুল ইসলাম খান এই নোংরামির খবর রাখার সময় পায় না। আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছেন দুই হাউজে বসে আপনারা দুটি ভাই। এভাবে নিজেদের ওপর মানুষের ঘৃণা উৎপাদন করে লাভ কী? এই সব চটুল হাওয়া বইয়ে দেয়া সহজ কিন্তু মানুষের একবিন্দু ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা অর্জন করা মুসার এভারেস্টে ওঠার মতোই কঠিন কাজ।

সাহিত্যাঙ্গনের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সেই সঙ্গে পৃথিবীর সকল মানুষের ওপরও।...

১৫.০৬.২০১০

দক্ষিণ কমলাপুর, সরদার কলোনী ঢাকা।
ই-মেইল: vuttokamal<heretikariad@gmail.com, vuttokamal @ yahoo.com

আ নো য়া র হা সা ন

.....

গ্রামবাংলায় শোষণ ও বঞ্চনার ধারাপাত

পৃথিবীতে প্রথম কখন গ্রামীণ সমাজের পত্তন ঘটে এর সুনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব না থাকলেও পণ্ডিতগণ নানান তত্ত্ব প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আদিম মানুষ যখন শিকারি জীবন ছেড়ে কৃষিজীবনের সূচনা করে তখনই যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কৃষির প্রয়োজনে বস্তিবাসী মানুষই প্রথম গ্রাম গড়ে তোলে। কাজেই গ্রাম অতি প্রাচীন সংগঠন এবং কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ সমাজ পরিব্যাপ্ত হয়। পৃথিবীতে শিকারি মানুষের সমাজ অন্তত মানুষের উৎপত্তির শুরু থেকে আট-দশ লক্ষ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই ব্যাপক সময় মানবসমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। নারীর হাত ধরে কৃষিকাজের পত্তন হওয়ার সাথে সাথে শুরু হল মানবজীবনের সীমাহীন অগ্রযাত্রা।

শিকারি জীবনে আট-দশ লক্ষ বছর মানুষের যে উন্নতি হয়নি, কৃষিজীবনে এসে মাত্র দশ-বার হাজার বছরে মানুষের অগ্রগতি এর শত শত গুণ বেশি। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন থেকেই তো নগরসভ্যতার উদ্ভব। আর এই নগরসভ্যতার পত্তন হয়েছে গ্রামকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, গ্রামকে শোষণ করে। কালক্রমে নগরের সর্বগ্রাসী প্রভাব গ্রামীণ সমাজকে অধঃস্তন করে এর বিলাসব্যসনের যোগানদারে পরিণত করে। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামীণ সমাজের ইতিহাস ধারাবাহিক শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে তা গভীরভাবে সত্য। উন্নত বিশ্ব শহুরে সমাজের জীবনমান এবং গ্রামীণ সমাজের জীবনমানের পার্থক্য যেখানে দিনে দিনে প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছে, সেখানে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো। ব্যবধান এখানে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । যদিও গ্রামে আজ রাস্তাঘাট হয়েছে, বিদ্যুৎ গেছে, রেডিও টেলিভিশন গেছে, কলের লাঙ্গল, মাড়াই কল, ধান ভানার কল, কোলস্টোর ইত্যাদি গেছে, প্রায় বাড়িতেই টিউবওয়েল হয়েছে, স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে, স্কুল, কলেজ, মসজিদ-মাদ্‌রাসা হয়েছে, ল্যান্ডফোন, মোবাইল ফোন হয়েছে, হাজার হাজার এনজিও গ্রামের ভূমিহীনদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় কোটি কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ দিচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কল্যাণে গ্রামের ভূমিহীন নারীরা নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পেয়ে গেছে। তবু বাস্তবতা হল এই, গ্রামের যে মানুষটি শিক্ষিত হন, সচেতন হন কিংবা প্রগতিশীল হন, তিনি আর গ্রামে থাকতে চান না, প্রাণপাত করে শহরে পাড়ি জমান। কিংবা চাকরি শেষে আর গ্রামে ফিরে যেতে চান না। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এই প্রবণতা যে শুধু পেশাগত কারণে তা নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবন-জীবিকার প্রশ্নেও গ্রাম ছাড়ছে মানুষ। মোট কথা বাংলাদেশের কোনো গ্রামেই আধুনিক মানুষের চাহিদার উপযোগী কোনো পরিবেশ আমরা এখনও তৈরি করে দিতে পারিনি। গ্রামবাসী আর নগরবাসীর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান ছাড়াও গ্রামগুলোতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান এখনও চরমে। কিন্তু বিস্ময়বোধ হলেও সত্য এই, বাংলার আদিম কৌম সমাজে সাম্য ছিল। বিভাজন যা ছিল তা পেশাগত। গোষ্ঠী ও পরিবার ছিল কৌম সমাজ গঠনের প্রধান আশ্রয়। যাদের জীবনোপায় ছিল শিকার, কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, মাঝি-মালা, সাপুড়ে, বেদের মতো শ্রমলগ্ন মানুষ নিয়ে গড়ে উঠত সে সমাজ। গ্রামে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আলাদা আলাদা পাড়ায় বসবাস করত। এই ব্যবস্থা এখনও গ্রামগুলোতে পরিলক্ষিত হয় যেমন- জেলেপাড়া, বারইপাড়া, কামারপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদি। সেই সমাজের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সমাজের সবাই কোনো না কোনো উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত। এই কারণেই গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অবশ্য তাদের জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ, সরল। 'লবণ এবং লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় বা দু'চারটি সৌখিন দ্রব্য ছাড়া' বড় মানের কেনাকাটার খুব একটা প্রয়োজন পড়ত না। ফলে শহর বা নগরের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে ছিল নিতান্ত সামান্য। তাদের নিজেদের উপার্জিত

পণ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা স্থানীয় হাট-বাজারে মিটে যেত। ফলে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থায় মানুষজন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

শোষণ বঞ্চনা শুরু হয়েছে মূলত বহিরাগতদের দখল-জবরদখলের পর থেকে। বহিরাগতরা পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদি বাংলার সেই উৎপাদনশীল স্ট্রাকচারের ওপরে এসে বসে যায় পরগাছা শোষক লতার মতো অনায়াসস্বত্বভোগী হিসেবে। অনায়াস স্বত্বভোগী হিসেবে প্রথম আসে আর্যভাষী জনগণ। এর আগে উত্তর ভারতে এরা বসতি স্থাপন করে নিয়েছিল। এদের পেশা তখনো শিকার ও পশুপালন। প্রথমে উত্তর ভারত থেকে এদের কিছু মানুষ বাংলা মুল-ুকে আসা শুরু করে সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে। এই ধারা একাদশ-দ্বাদশ শতকে এসে সেন রাজাদের বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। প্রাচীন বাংলায় তখন সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্ম হয়। বিজয়ী এবং বিজেতা এই দুই অসম শক্তির মধ্যে ক্রমে নানা শ্রেণী-উপশ্রেণী তৈরি হয়। বর্ণবাদী প্রথার মধ্য দিয়ে শ্রেণীশোষণ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়। নগরের সংক্ষিপ্ত পরিসর পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে তা বিশাল গ্রামীণ স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলেও এর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে। প্রশাসনিক ক্ষমতা-সংলগ্ন বহিরাগত মুসলমানগণ ইসলামি ভাবচেতনার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ঐ নিবর্তনমূলক ধারণাকেই বহাল রাখে। এরা মুসলমান বটে, কিন্তু ইসলামের কোনো লোক নয়। ইসলামের মহানুভবতা প্রচার এদের লক্ষ্যও ছিল না। এরা শাসক। শাসন-শোষণের প্রতি এদের ছিল কড়া নজর। পক্ষান্তরে মুসলিম রাজশক্তির বাইরে বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজে ব্যাপকভাবে ইসলামি ভাবধারা সম্প্রসারিত হয়েছিল সুফি সাধকদের মাধ্যমে। সুফি সাধকরা ছিল মূলত উদার ধর্মমতানুসারী। এদের প্রধান গুণ ছিল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হবে সমতার ভিত্তিতে। মানুষের মর্যাদার সমতা- তার পেশা যাই হোক। আর ইসলামের মূল স্পিরিটও তাই। প্রাচীন গ্রামবাংলার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সুফি-সাধকদের এই সাম্যের চেতনাকে সর্বান্ত করণে লুফে নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, শাসকবর্গ কর্তৃক স্বধর্মের হয়েও প্রত্যাশিত মর্যাদা এরা কখনও পায়নি। ক্ষমতা-সংলগ্ন বহিরাগত মুসলমানগণ ভারতীয় বর্ণধর্মের প্রভাবে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীধর্মের আবর্তে পড়ে স্বধর্মী মুসলমানদের মাঝে ব্যবধান তৈরি করে নিয়েছিল। ফলে আর্যদের মতোই আগন্তুক ভিন্নভাষী শাসক মুসলমানগণ উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশুদ্ধ রক্তের বাহক হিসেবে নিজেরা 'আশরাফ' (উচ্চবর্ণ) বা 'শরীফ' (ভদ্র) বলে ঘোষণা করে এবং এদেশীয় বাংলাভাষী ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ যারা মূলত শ্রমজীবী ও অন্তজ শ্রেণী থেকে আগত তারা 'আতরাফ' (নিম্নবর্ণ) বলে চিহ্নিত হয়। আশরাফ ও আতরাফদের মধ্যে আহার-বিহার ও উঠা-বসায় বাছ বিচার আরোপিত হয়। বিয়ের ব্যাপারেও ঘোর আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগ এই ব্যাপক সময় গ্রামবাংলার জনগণ রাজশক্তির কোনো আনুকূল্য তো পায়ইনি বরং নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে। শাসকদের ভরণ-পোষণ ও তাদের বিলাস-ব্যসনের

যোগানদারী করাই তাদের একমাত্র কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অপরপক্ষে গ্রামবাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের প্রতি ঐসব শাসকবৃন্দের তেমন কোনো উদ্যোগই ছিল না। বরং ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্তও দেখা গেছে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি বিনামূল্যে পত্তন দিয়ে চাষবাসের উপযোগী করতে কৃষকদেরকে জমিদারদের পক্ষ থেকে উৎসাহী করা হত কেবল বার্ষিক রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য।

বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের চিত্র ভিন্ন রকম। কোম্পানির শাসনের শুরুতেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর স্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না। বরং যা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির সীমাহীন শোষণের নির্মম ফল। পরবর্তীকালে বাংলার কৃষক বিদ্রোহ তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের করুণ চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। সারা বাংলায় তখন বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের অনুমান করতে কষ্ট হয় না, গ্রামবাংলার শান্তিপ্রিয় কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহি হয় কখন। এইসব বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ আশীর্বাদপুষ্ট সামন্তদের সীমাহীন শোষণ। নানা প্রকার খাজনা ট্যাক্সের মাধ্যমে তারা এই শোষণ প্রক্রিয়া চালাত। প্রথম আদায় হত তহুরী। বছরের শেষে হিসাব নিকাশের সময় যে অর্থ আদায় করা হত তাকেই বলা হত তহুরী। তহশিলদারের কেরানির জন্য অতিরিক্ত মহুরিয়ানা আদায় করা হত। দাখিলা ইত্যাদি লেখার জন্য কাচারিতে এক বা একাধিক মহুরি কাজ করত। তাছাড়া জমিদারবাড়ির বিবাহ, পার্বণী ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রজাকে খরচ যোগাতে হত। প্রজারা নির্দ্বিধায় এসব খাতে অর্থ আদায় দিত। স্কুলের উন্নতির জন্য বা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাদের নিকট হতে জোরপূর্বক তহশিলদার দ্বারা চাঁদা আদায় করা হত। জমিদার বা তার পরিবারের লোকে তীর্থভ্রমণ করতে গেলে সে ব্যয় চাষিদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। প্রতিবছর কাচারিতে পূন্যাহ খরচা আদায় করা হত। পূজার খরচার জন্য দিতে হতো 'পূজাই'।

গ্রামের সার্বজনীন ব্যয় বরাদ্দ খরচ ও নানাবিধ গ্রামখরচ চাষিদের নিকট থেকে আদায় করা হত। জমিদারদের দেনা পরিশোধের জন্যও কোনো কোনো সময় প্রজাদের সাহায্য নেয়া হত। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে ভ্যাট দেওয়ার খরচা ও জমিদারবাড়ির ভোজ খরচা আদায় করা হত। জমিদারদের জামাই পোষার খরচাও দিতে হত গরিব প্রজাকে। বাগ-বাগিচা প্রস্তুত, কোঠাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে জমিদারদের আদেশপত্র নিতে অর্থ দিতে হত। তাছাড়া জমিদারের খাতায় নাম তুলতে খারিজ দাখিল নামক কর দিতে হত। নজরানা ও আরও নানা প্রকার রাজস্ব দিয়ে কৃষককুল সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত'। উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ যে শুধু হিন্দু জমিদারদের বেলায় খাটে তা নয়। যে সমস্ত অঞ্চলে জমিদার ছিলেন মুসলমান তাদের বেলাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। চরিত্রগত দিক থেকে হিন্দু মুসলমান জমিদারের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলনা। আবদোস সোবহানের (১৮৮৯) মতো কট্টর হিন্দুবিদ্বেষী লেখকও মুসলমান

জমিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, 'এরা কবুতর উড়িয়ে, মোরগ বাজি করে, সতরঞ্জ খেলে বা স্রেফ ঘুমিয়ে দিন কাটান। মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে মুসলমান মহিলাগণ এই আবর্জনাগুলোকে প্রসব না করিলে, সমাজের আধোপতনের আশঙ্কা কম হইত'। যদিও ব্রিটিশ যুগ বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজবাস্তবতার ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউ ঊনবিংশ শতকে বাংলার উচ্চতর সমাজে বিপুল পরিমাণে আলোড়ন তুলেছিল তবু একথা সত্য যে, ইংরেজ তার ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাংলাদেশে সুষ্ঠু সমাজ বিকাশে সহায়তা করেনি। ফলে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামবাংলায়-স্থিতাবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দেশে কায়েম হয় পাকিস্তান নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। সেই পাকিস্তানি আমলের চব্বিশ্য বছর শাসনকাল ইসলামি প্রক্রিয়াকরণের মধ্যদিয়েই চলে গেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া এতটাই অন্তঃসারশূন্য ছিল যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী মনোভাবেই এর প্রমাণ প্রস্ফুটিত হয়। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হল এর মূল কথা, এদেশীয় হিন্দুদের বিপরীতে আমরা মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই আলাদা এক জাতি। কিন্তু সমস্যা হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে। মুসলমান মুসলমানের ভাই ঠিক আছে কিন্তু ক্ষমতা আমাদের এই ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শোষণ প্রক্রিয়া পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে এদেশে যে সমস্ত জমিদার, তালুকদার, জোতদার, মহাজন নামক তাঁবেদার শ্রেণী তৈরি করেছিল, ১৯৪৭ সালের পটপরিবর্তনের পর পাকিস্তানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঐ শোষক শ্রেণীর হাতেই থেকে যায়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। 'এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে একমাত্র একটি ক্ষেত্রে এবং সে ক্ষেত্রটি হল পূর্ববাংলার সামাজিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষকদের সম্প্রদায়গত চরিত্র পরিবর্তন'। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে এই কুচক্রী শোষক শ্রেণীটি ছিল অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের। পাকিস্তান উদ্ভবের ফলে সেই একই স্থান দখল করেছে সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ের। এই মুসলিম নব্য শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর প্রভাব পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভোটের রাজনীতির জন্যই নতুন রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীকে গ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হত। জনমত গঠনে ধর্মই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই এই মাঠ তাদের দখলে ছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতাও কার্যকর ছিল তাদের পক্ষে। ফলে '৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করে মাত্র। এতে করে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজে দু'টি পরস্পর বিপরীতমুখী ফল তৈরি হয়।

প্রথমত গ্রামবাংলার জনসাধারণের আত্মসচেতনতার জাগরণ। ১৭৫৭ সালের পটপরিবর্তনের সময় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের খবর পূর্ব বাংলার কৃষকদের কাছে পৌঁছতে ছয় মাস লেগেছিল, সেখানে ১৯৪৭ সালে

পটপরিবর্তনের খবর পূর্ববাংলার মানুষ সাথে সাথেই জেনে নিয়েছিল। এমনকি আগে থেকেই তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রস্তুতিও ছিল। শুধু তাই না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের পর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের সম্প্রসারণ এবং ক্রমে মৌলবাদী চেতনার দিকে অগ্রসর। স্বাধীনতার তিনযুগ পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ জঙ্গিবাদীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা সবাই জানি ঐসব জঙ্গিরা গ্রামবাংলার কৃষক পরিবার থেকে এসেছে। আজ এদেরকে আমরা বিভ্রান্ত বলছি। ইসলামের নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড - এই বলে, নেতা-নেত্রী, ইমাম-মোয়াজ্জিন, আলেম-উলামা, শিক্ষক-ছাত্র, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ এদেরকে ধিক্কার দিয়েছে। তা বিভিন্ন মিডিয়াতেও ব্যাপক প্রচারও পেয়েছে। কিন্তু এই বিভ্রান্ত ইসলাম বা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বীজ তো বপন করা হয় বৃটিশ যুগে যা পরিপুষ্টি পায় মুসলিম পাকিস্তানে। ব্রিটিশ বাংলায় ক্ষমতালোভী এবং অর্থলোভী হিন্দু সম্প্রদায়ের সীমাহীন শোষণ, শাসন এবং ঘৃণার বিপরীতে মুসলমান প্রজাসাধারণের মধ্যে যে হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক বিষের জন্ম নেয়, এ খবর ব্রিটিশ রাজশক্তির অনবিদিত ছিল না। ফলে কংগ্রেসের সরকারবিরোধী নানান আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ শক্তি ঐ বিষবাষ্পকে সুযোগমতো কাজে লাগাতে ভুল করেনি। সাতচল্লিশেও না। যে জন্য '৪৭-এর স্বাধীনতা, রক্তপাতহীন হলেও নিষ্কণ্টক ছিল না। এর মর্মমূলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত ছিল। ফলে '৪৭ বাঙালি মুসলমানের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিল তা অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়।

মুসলিম পাকিস্তানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বপ্ন বাংলার জনমনে যখন তিরোহিত হয় তখনই শুরু হয় পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই মূলত আন্দোলন দানা বাঁধে। এই গণ-আন্দোলনে গ্রামবাংলার সর্বস্তরের মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কৃষক, শ্রমিক, জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং বাংলাদেশের সরকার স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার তাগিদে প্রতিদিন অত্যন্ত সমৃদ্ধ বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে ফেরেন। 'এই বক্তৃতা বিবৃতিগুলোর মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, যানবাহন, গৃহসংস্থান ইত্যাদি সব কিছুকেই 'গণমুখী' করে তোলার জন্য দাবি উত্থাপন ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই সমস্ত আখ্যান, দাবি ও প্রতিশ্রুতির মূলকথা হল এই যে, অতীতে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। শুধু তাই নয় অতীতের সমস্ত ব্যবস্থাই বস্তুতপক্ষে চালিত হয়েছে জনগণের শত্রুদের স্বার্থে। এই অবস্থার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে এখন উপরোক্ত সব কিছুকেই জনগণের স্বার্থে পরিচালিত

করতে হবে এবং সকল কর্মসূচিকে হতে হবে 'গণমুখী'। সেজন্যই প্রয়োজন, 'গণমুখী শিক্ষা' 'গণমুখী সংস্কৃতি' 'গণমুখী চিকিৎসা'।

এখন প্রশ্ন হল এই গণমুখী শব্দটির সর্বাত্মক বাস্তবায়ন কি সর্বস্তরে হয়েছে? এই 'গণমুখী' শব্দটির অর্থগত এবং চেতনাগত উভয় সমর্থনই জনসংখ্যার বিচার বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর শতকরা পঁচাশি ভাগ পড়ার কথা ছিল। তা কি হয়েছে? বরং উল্টোটাই প্রত্যক্ষ করি। কৃষকের ন্যায্য দাবী এক বস্তা সারের জন্য কিংবা বিদ্যুতের জন্য স্বাধীন দেশের সরকারি বাহিনীর নির্মম গুলিতে কৃষকের বুকের পাঁজর ঝাঁঝরা হয়েছে। এই স্বাধীন দেশের সরকার কয়লা উত্তোলনের নামে বিদেশি বেনিয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে বাস্তুহারা করতে দ্বিধা করে না। এখনো পর্যন্ত কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে না। তাদের জীবনমান এখনো সেই ঔপনিবেশিক কাঠামোর আদলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো নাজুক অবস্থায় চালিত হচ্ছে। গৃহসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব মৌলিক বিষয়গুলো সহজলভ্য তো নয়ই, বরং দিনে দিনে গ্রামীণ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আমাদের সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য থেকে ভাবচেতনা গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আর এই উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল স্বয়ং রাষ্ট্র কর্তৃক। যেমন– বাংলার শোষণহীন আদিম কৌম সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে স্পিরিট যুগে যুগে নষ্ট হয়েছে এর পুনরুদ্ধার জরুরি ছিল। উচিত ছিল দালাল-ফরিয়া মধ্যস্বত্বভোগীদের তোষামোদি বাদ দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের সামনের সারিতে টেনে আনা। শ্রমের জীবন মাত্রই যে সম্মানের এ বিষয়টাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর ধর্মের বিকৃত ব্যবহার বাদ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সচেতন করা উচিত ছিল এই বলে যে, শ্রম যত ক্ষুদ্রই হোক তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করাই নবীজির শ্রেষ্ঠতম সুন্নত। বৃহত্তম গ্রামীণসমাজে বিভিন্ন পেশার এবং ধর্মের মানুষ যে এখনো পাশাপাশি থেকে পরস্পর সৌহার্দ্যমূলক সহাবস্থান করে একটা অসাম্প্রদায়িক আবহ তৈরি করে নিয়েছে তা ঐ কৌম সমাজেরই উত্তরাধিকার বহন করে। যা সুফি-সাধকদের প্রচারিত ধর্মমতের মাধ্যমে আমাদের মাঝে এখনও টিকে আছে। আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক যা কিছু আছে তা বাইরে থেকে আরোপিত। শোষণ এবং শাসনের প্রয়োজনে। ভাষার প্রশ্নে বাঙালির যে আপোষহীন মনোভাব দেখা গেছে, তাও কৌম মানসিকতারই ফল। পণ্ডিতদের মতে, যদিও বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির মতোই শঙ্কর এবং এর বয়স দলিল মতে এক হাজার বছরের বেশি নয়। কিন্তু এই ভাষার এবং বাঙালি জাতির মৌলিক উপাদান এসেছে কৌম সমাজ থেকেই। যত শক্তিমানগণই বাইরে থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে এসেছেন না কেন, নিজেদের পরিচয় বেমালুম ভুলে গিয়ে বাঙালি হয়ে উঠেছেন অবলীলায়।

চর্যাপদ আমাদের এমন এক প্রামাণিক দলিল, যা বাঙালি জাতির এক হাজার বছর পূর্বের সুলিখিত অভিজ্ঞানপত্র হিসেবে পরিগণিত। এর কবিরা ছিলেন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য।

যারা সমসাময়িক বিরুদ্ধ পরিবেশে থেকেও বুকের রক্তে আগলে রেখেছেন নিজের জাতীয় পরিচয়কে। আমরা যে বাঙালি এর প্রধান পরিচয় ভাষাগত। যুগে যুগে ঐ ভাষিক পরিচয় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। ভাষাকে নিয়ে পাকিস্তান আমলে যা হয়েছে, মধ্যযুগেও কোনো অংশে কম হয়নি। এর প্রমাণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জ্বলন্ত হয়ে আছে।

১৯৫২ সালে একটা জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিল। এই যে নিজ ভাষার প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ এই চেতনাও প্রাচীন বাংলার সেই গোষ্ঠীচেতনারই উত্তরাধিকার বহন করে। মনে রাখতে হবে বাঙালির ভাষিক চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা দুটোই আমাদের নিজস্ব, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং শক্তি। এর সাথে যুক্ত হবে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা। সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি বিদ্রোহি জাতি বলে পরিচিত। এই বিদ্রোহি চেতনা তার স্বাধীনতার চেতনা থেকে উৎসারিত। স্বার্থমগ্ন শোষকদের ভয়ঙ্কর চাতুর্য সময় সময় আমাদের আঘাত করেছে, কুক্ষিগত করেছে, বিপর্যস্ত করেছে, কিন্তু কখনও পরাজিত করতে পারেনি। এই স্বার্থমগ্ন গোষ্ঠী বিরাট সমাজের বিপরীতে একেবারেই মুষ্টিমেয়। সমাজে এদের ধর্মীয় পরিচয় হয়তো একটা আছে। কিন্তু এটা এদের আসল পরিচয় নয়। প্রকৃত অর্থে এরা নিজেরা ধর্ম মানে না, ধর্ম ব্যবহার করে মাত্র। এদের পরিচয় একটাই এরা শোষক এবং নিবর্তনকারী। সমাজে এদের উপস্থিতি এবং চরিত্র সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত দেখি। পরিবর্তন যা হয়েছে তা সম্প্রদায়গত, চরিত্রগত নয়। যুগে যুগে স্বার্থমগ্ন শ্রেণীর শোষণের নিট ফল হল এই যে, গ্রাম বাংলার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকেছে। এ থেকে যেন কোনো দিন মুক্তি নেই এদের। এখন সময় সকল বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে আসার।

সহায়ক গ্রন্থ

মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, আব্দুল হালিম, নূরুননাহার বেগম। মে, ১৯৯৮, ঢাকা।
আদিম সমাজ, লুইস হেনরি মর্গান, অনুবাদ বুলবন ওসমান। ফেব্রুয়ারি, ২০০০, ঢাকা।
মানব সমাজ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন। নভেম্বর, ১৯৭৩, ঢাকা।
বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়। আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা।
বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম। জানুয়ারি ১৯৯৬, ঢাকা।
বাংলা মঙ্গল কাব্যে শ্রমজীবী মানুষ, গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বাংলা ভাষা, বাঙালী সংস্কৃতি, মাযহারুল ইসলাম। ফেব্রুয়ারি ২০০০, ঢাকা।
উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, মুনতাসীর মানুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা।
রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।
যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বদরুদ্দীন উমর।
বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ, খোন্দকার শওকত হোসেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ঢাকা।